বিপ্লবের পথে

পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত

কলিকাতা
১৩৬৪

ভূমিকা

সেটা ছিলো পথ তৈরীর যুগ। যারা পথ তৈরী করতে এলো তারা অবিশ্বাস, উপেক্ষা, বিরোধিতা, দেশবাসীর উদাসীনতা, সব তুচ্ছ করে স্বাধীনতার শিখরে পৌছবার জন্যে পথ রচনা করতে লেগে গেলো। বড়ো কঠিন ছিলো সেই সাধনা। প্রবল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই কোনো অবস্থাতেই সহজ নয়, আর দেশের তখনকার অবস্থাতে সেটির বাস্তব সার্থকতা সম্বন্ধে খুব অল্প লোকেরই বিশ্বাস ছিলো। এমন অবস্থায় যারা এগিয়ে এলো তারা দুঃসাধ্যব্রতী নিষ্কাম আদর্শবাদী। তাদের অন্তরের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও মানব-প্রেমের অনির্বাণ দীপ-শিখা জ্বালিয়ে দিয়েছেন রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ ও আরো বহু মননশীল সাধকেরা।

আত্ম-অবিশ্বাসী জাতিকে তাদের মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনা ও পরম আত্মিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলবার জন্যে শতাব্দীব্যাপী সাধনা করে গিয়েছিলেন এই অনন্যসাধারণ পুরুষেরা। জাতির ও ব্যক্তির জীবনের এমন কোনো সমস্যা ছিলো না যার উপরে তাঁদের প্রদীপ্ত মনের আলো পড়ে নি, যার সমাধান তারা যোগান নি।

জাতির চিত্ত ভূমিতে যখন পাল পড়লো তখন জাতির চিত্তের বন্ধ্যাত্ব ঘুচ্‌লো আর জাতির চেতনা-দীপ্ত মন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সর্বপ্রকার মুক্তির দিকে যাত্রা সুরু করে দিলো।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার যাত্রা এই অমিতবীর্যশালী পুরুষেরাই সুরু করিয়ে দিলেন।

সেই পথ তৈরীর যুগের তৃতীয় পর্বের ছবি এঁকেছেন শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত তাঁর 'বিপ্লবের পথে' বইটিতে। এই যুগের বহু তথ্য যা

বিপ্লবের পথে

শুধু বৈপ্লবিক আন্দোলনের কর্মীদের জানা ছিলো, অজানা ছিলো দেশবাসীদের, সেগুলি গ্রন্থকার আমাদের সামনে ধরে দিয়েছেন। কিন্তু বইটি শুধু তথ্যের তালিকা নয়, আর বর্তমান কালের আত্মজীবনী লেখকদের যেটি বিশেষত্ব আত্ম-বিজ্ঞপ্তি, সেই রুচিহীন বিশেষত্বের কালিমা চিহ্নিত নয়।

পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত হাসতে জানেন ও নিজেকে বিদ্রূপ করবার তাগদ রাখেন। তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘ দিনের পরিচয়ে কারাগারের অকরুণ ধূসর অবস্থাতেও হাসির অভাব, রসের দৈন্য কখনও অনুভব করি নি তাঁর আলাপ আলোচনায়।

যার রস-জ্ঞান নেই সে মানুষ ভয়ঙ্কর, তাকে ভয় করে সাত হাত দূর থেকে চলা ভালো। পূর্ণানন্দ দাশগুপ্তের মানবতা-বোধ ও রস-জ্ঞানের পরিচয় 'বিপ্লবের পথে' বইটিতে পাবেন বলে আমার বিশ্বাস। বইয়ের সবটাই সমান বুনুনির সাক্ষী দেয় না, কিন্তু গোটা বইটাতেই বুনুনির মুন্সিয়ানার দাবী ক'জন লেখকই বা করতে পারেন! এটাও স্মরণ রাখা দরকার যে 'বিপ্লবের পথে' হচ্ছে লেখকের সর্বপ্রথম প্রয়াস সাহিত্যের ক্ষেত্রে।

১৮ই পৌষ, ১৩৬৪ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিচয়

শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্তের 'বিপ্লবের পথে' তার বিপ্লবী-জীবনের কাহিনীই শুধু নহে, বাংলার বিপ্লব-প্রয়াসের একটা বলিষ্ঠ অধ্যায়ের রোমাঞ্চকর চিত্র। যাহারা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য বিদেশী শাসন-শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন তাঁহারা তাঁহাদের কর্মপ্রয়াস ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিলে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের ও কর্মপ্রয়াসের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহ অনেকটা সহজ-সাধ্য হয়। সেদিক হইতেও এই 'বিপ্লবের পথে' গ্রন্থের মূল্য আছে। শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্তকে আমি শ্রদ্ধা করি, যেমন করি আরও বাংলার ও ভারতের বিপ্লব-কর্মীদের, যাহাদের বিপ্লবের আদর্শ-নিষ্ঠা বরাবর অম্লান রহিয়াছে। এই ধরনের বিপ্লব-নিষ্ঠ কর্মীগণ কি বাহিরে, কি কারাভ্যন্তরে, সকল সময়েই অদম্য ও অনির্বাণ সংগ্রাম-শীলতার পরিচয় দিয়াছেন। এই সংগ্রাম-নিষ্ঠ বিপ্লবী লেখকের 'বিপ্লবের পথে' পাঠ করিয়া পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন এই দুর্গম পথ-যাত্রীদের যে পাথেয় সঞ্চয় ছিল তাহা আপোষ-হীন আদর্শ-নিষ্ঠার দুশ্চর তপস্যার দ্বারাই শুধু সম্ভব হইয়াছিল।

২৮শে অগ্রহায়ণ
১৩৬৪

শ্রীনলিনী কিশোর গুহ

লেখকের কথা

আমার লেখা আত্মজীবনী নয়। আত্মজীবনী লিখবার সঙ্কল্প আমার নেই। সৈনিকের ডায়েরীর মত স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে রেখেছিলাম। কালের গতিপথে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পূর্ব্বে লেখনীতে আবদ্ধ করে রাখার ইচ্ছা হলো। তারই জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

স্বাধীনতার ইতিহাসে আমার অবদান নগণ্য—সামান্য একটি সৈনিকের মতন। সমুদ্রের বেলাভূমিতে অগুনতি বালুকণা যেমন, স্বাধীনতার বিস্তৃত ইতিহাসে আমার অবদানও তেমনি। তবুও তার মূল্য আছে—স্বাধীনতার ইতিহাস প্রযোজনায়। সভ্যতার ইতিহাসে পিছে হটার ও আগে বাড়ার নজির আছে—এভাবেই মানব সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। ভারতের সভ্যতা এগিয়ে নেবার জন্য ভারতের স্বাধীনতার প্রাঙ্গনে বহু আদর্শ-নিষ্ঠ ও মননশীল ব্যক্তিরা জন্ম নিলেন। তাঁরাই ভারতকে জাগিয়ে তুললেন। সমগ্র দেশকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করবার জন্য মন্ত্রগুরু ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দিয়ে গেলেন অমর আদর্শ, তার চিরভাস্বর লেখনিতে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গানে, গাথায়, কবিতায়, সাহিত্যে ভারতকে বেঁধে দিলেন সুনিবিড় এক ঐক্য বন্ধনে—অতীত ও বর্তমান এক হয়ে দেখা দিল। জাতির প্রস্তুতি ঘোষণা করলেন খুদীরাম ও কানাইলাল নিজেদের জীবন আহুতি দিয়ে। বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান তৈরী হলো, পি মিত্র, বিপিন পাল প্রভৃতির নেতৃত্বে। "সন্ধ্যা" "যুগান্তর" তাদের অগ্নি-গর্ভ বাণী নিয়ে ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তুললো অপূর্ব্ব প্রেরণা ও আত্মত্যাগে।

তাঁদের আদর্শ বহন করে চললো বাংলার বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানগুলো—অনুশীলন, যুগান্তর ও পরবর্ত্তী কালের বি, ভি, শ্রীসঙ্ঘ প্রভৃতি। তাঁদেরই হাতে গড়া মানুষ আমরা, বঙ্কিমের "সন্তান"। শোষিত নিপীড়িত ভারতে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে স্বাধীনতার লক্ষ্যে

পৌঁছাবার আদর্শ তখনও জন মনে আত্মপ্রকাশ করেনি। জাতির এই অর্দ্ধচেতনার যুগে স্বাধীনতার উচ্চাদর্শের দুর্গম পথ বেছে নিল, সন্তানের দল। স্বাধীনতার জয়যাত্রার ইতিহাস সূচিত হলো। গ্রেপ্তার, কারাবরণ, দীপান্তর, ফাঁসী বা গুলিতে হত্যা বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে দেখা দিল। বাংলার আন্দোলন ভারতে ছড়িয়ে পড়লো।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর ঘটনাবলীর সুযোগে ইংরেজ শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য যে ব্যাপক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল রাসবিহারী, যতীন্দ্রনাথ, নগেন দত্ত, (গিরিজা দত্ত) শচীন্দ্র সান্যাল, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য গুরুমুখ সিং, কর্ত্তার সিং, পিংলে প্রভৃতির নেতৃত্বে, তাতে প্রকাশ পেলো বিপ্লবীদের জাতীয় নেতৃত্ব করবার ক্ষমতা এবং স্বাধীনতার আদর্শের উপর তাঁদের দৃঢ়বিশ্বাস। তাঁদের এই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর একদিকে বৈপ্লবিক দলের বহুসংখ্যক নেতৃবৃন্দ ও সভ্যদের এবং অন্যদিকে সৈন্যবাহিনীর সিপাহী ও অফিসারদের গ্রেপ্তার, নির্ব্বাসন, কারাদণ্ড ও ফাঁসী বা গুলিতে হত্যাপর্ব্ব অনিবার্য্যরূপে সুরু হলো। ব্যর্থতার গ্লানি ও পরাজয়ের পরিণাম জেনে বা দেখেও বৈপ্লবিক সংগঠনগুলি স্বাধীনতার দুশ্চর তপস্যা থেকে বিরত হলো না। অদূর ভবিষ্যতে ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে শক্তির পরীক্ষায় সম্মুখীন হবার জন্য তারা আবার নতুন করে তৈরী হতে লাগল।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের রূপান্তর ঘটলো, ১৯২০ সালের পর। আবেদন, নিবেদনের পালা শেষ করে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বায়ত্ত শাসনের দাবী কংগ্রেস জানালো—পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ তখনও বহু দূরে। শাসক ইংরেজ "সূচ্যগ্র-মেদিনী"ও ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক। কংগ্রেসের স্বায়ত্ত-শাসন মূলক দাবীর সঙ্গে সহানুভূতি রেখে বিপ্লবীরা কংগ্রেসের আন্দোলনের সাথে পা মিলালো, তাকে এগিয়ে নেবার জন্য। গোপন ও অর্দ্ধগোপন বৈপ্লবিক সংগঠনগুলি সারা বাংলায়

নানাভাবে ছড়িয়ে ছিলো।—আদর্শ-নিষ্ঠ ও ত্যাগব্রতী বিপ্লবী সমাজের সহযোগিতায় ও পরিচালনে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সর্ব্বত্রই গড়ে উঠলো।

বিপ্লবীরা স্বাধীনতার আদর্শে পৌছাবার চিরাচরিত পন্থা ত্যাগ করলো না—অহিংস আন্দোলনে সহযোগিতা রেখেও বৈপ্লবিক পন্থা তারা অনুসরণ করে চললো। তাই গ্রেপ্তার, কারাবরণ, দ্বীপান্তর ও ফাঁসীর বহর কংগ্রেসের স্বায়ত্ত শাসন আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই চলতে সুরু করলো। সুদীর্ঘ কাল ধরে স্বাধীনতার পথ তৈরী করেছিলো যারা, যাদের ত্যাগ বীরত্ব ও আদর্শ-নিষ্ঠা, গণ চেতনা ও গণ-জাগরণ সম্ভব করে তুলেছিলো, তারা ছিলো। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শের অকৃত্রিম পূজারী, জাতির প্রাণশক্তি।

১৯২৯ সালে জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করলো। কিন্তু ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত অহিংস আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার দাবী রাজশক্তিকে দিয়ে তারা মানাতে সক্ষম হয়নি। বিপ্লবীরাও নির্ব্বাসন কারাদণ্ড বা জীবন আহুতি দিয়ে তাদের আদর্শে পৌছতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের দুর্ব্বলতা, সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ-হিন্দ ফৌজের আঘাত ও তার প্রতিক্রিয়া-জনিত বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ ভারতে স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করে দিলো। শ্রমিক দলের ভারতের আশা আকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতি ইংরেজের ভারত ত্যাগ প্রশ্নকে বাস্তবে পরিণত করলো। জাতীয় আন্দোলন ও সংগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের পরিণামের ফলে তা' সম্ভব হয়ে দেখা দিলো। তবু ও অবিমিশ্র আশীর্ব্বাদরূপে ভারতে স্বাধীনতা এলোনা। ভারত ভাগ হয়ে গেলো। কংগ্রেস ও মুস্লীম লীগের হাতে ক্ষমতা দিয়ে ইংরাজ রাজশক্তি ভারত ত্যাগ করলো।

ইতিহাসের অগ্রগতির মুখে অতীত কালের ঘটনা ও কার্য্যপরম্পরা এনে দিয়েছে বর্ত্তমানের স্বাধীনতা। তার স্বাধীনতার বুনানীতে, তার

রক্ষণ ও বিস্তারে, বর্ত্তমানের ন্যায় অতীতের অভিজ্ঞতাগুলির প্রয়োজন কম নয়। জাতির এই কালব্যাপী সাধনার বেদীতে নগণ্য অবদান ও ভুলে যাবার নয়। যাঁরা এই বেদী গড়ে তুলেছিলেন, সেই বেদীর পাদপীঠে আমার ভক্তি-অর্ঘ্যখানি অর্পণ করলাম।

আমার লেখায় ভুল ত্রুটি অনেক আছে। বাগ্দেবীর সাধনা ক্ষেত্র হ'তে দূরে কাটিয়েছি বহুদিন। রণক্ষেত্রের সৈনিক হিসাবে স্বতন্ত্র পাহারায় সবাইর মত নিযুক্ত ছিলাম, তাই ভাষার ভুল ত্রুটি অনেক জায়গায়ই থাকবার কথা। পাঠকের নিকট নিবেদন তারা যেন ভুলত্রুটিগুলোকে বড় করে না দেখেন।

পরিশেষে আমার বক্তব্য, আমার যে সব বন্ধুরা বইখানাকে প্রকাশ করতে সাহায্য করেছেন নানাভাবে, তাদের ঋণ আমি স্বীকার করে নিচ্ছি এবং একথা সত্যি যে তাদের সাহায্য না পেলে বইখানা প্রকাশ করতে সমর্থ হতাম না। 'বিপ্লবী বাঙালী" সাপ্তাহিক কাগজখানা আমার লেখা ছাপিয়ে রাজনৈতিক বন্ধুদের মধ্যে যে উৎসাহ সঞ্চার করেছেন তাও আমাকে লিখতে বিশেষ অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

১২ই মাঘ, ১৩৬৪
(২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫৮)

পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত

এক

ঢাকা শহর থেকে দূরে—পল্লী মায়ের শ্যামাঞ্চলে কেটেছে বাল্য ও কৈশোর। অভিজাত বংশে জন্মের অহমিকা বেশী মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি, ভাগ্য সেখানে দারিদ্র্যের সত্য কঠিন স্পর্শে গর্বকে চূর্ণ করেছে। মামাদের আশ্রয়ে থেকেই লেখাপড়া শিখি। অসীম স্নেহ তাঁদের কাছে পেয়েছি। সবচেয়ে দামী যে জিনিস পেয়েছি তাঁদের কাছ থেকে—তা করুণা নয়,—মর্য্যাদা।

গ্রামের স্কুলে পড়ি,—সমৃদ্ধ শ্রী সম্পন্ন গ্রাম। সহপাঠীদের পোষাকে পরিচ্ছদে তার ছাপ ছিল। আমার নিজের জামাকাপড় নিজেই সাবান দিয়ে কেচে নিতুম, পরিচ্ছন্নতা ও সুরুচি ব্যাহত হত না ধোপদুরস্ত পরিচ্ছদের অভাবে। বাড়ীর দৈনন্দিন হাটবাজার করতাম, গয়লা বাড়ী থেকে দুধ বয়ে নিয়ে আসতাম, আমার রোজকার কাজের তালিকায় এগুলো অপরিহার্য্য ছিল, কোনদিনই এগুলোকে অবাঞ্ছিত ছোট কাজ বলে মনে করেনি। এতে লাভ করেছিলাম একটা সহজ জীবন ধারা ও স্বাবলম্বনের অভ্যাস। তা

ছাড়া এসব কাজ করে মনে পেতুম সহজ আনন্দ। দারিদ্র্য তাই কোনদিনই তার গ্লানির বোঝার ভারে আমার জীবনকে নুইয়ে দেয়নি—দেয়নি নীচুতে নামিয়ে। পড়াশুনায় আমার আগ্রহ ও সাফল্য আমার জন্য এনেছে সহপাঠীদের সাহচর্য্য ও বন্ধুত্বের মর্য্যাদা। ভবিষ্যৎ জীবনে চলার পথের পাথেয় হিসাবে আমি দারিদ্র্যের মারফৎ পেয়েছি স্বাবলম্বন ও শ্রমের অভ্যাস।

শিক্ষার প্রতি আগ্রহের সঙ্গে প্রাণশক্তি ছিল প্রচুর আমার মধ্যে। প্রখর মনন শক্তি প্রেরণা যুগিয়েছে দেশপ্রেমের। কিশোর বয়সের ধ্যান মূর্তিতে বিরাট দেশের ছবি কতটাই আর ফুটতো! গ্রামের আমকাঁঠালের বন,—পল্লী-পথের মাঝে মাঝে বটঅশ্বত্থের ঘন ছায়া,—চোখে মায়ার কাজল বুলিয়ে দিতো। ঐ বাঁশ বনের ধারে, তালপুকুরের ওপারে আঁকাবাঁকা মেঠো পথের দুধারে চাষীদের বাড়ী—কোথাও ধোপাপাড়া, কোথাও মৎস্যজীবি ও বারুইদের রকমারী গৃহগুলি. কোথাও বা ঘন বসতি কোথাও বা বিরল বসতি—এক অগোছালো বৈচিত্র্যে গ্রামখানি ছবির মতো দেখাতো। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবার স্নেহ পরিচয়ের মাধুর্য্য অন্তরকে স্পর্শ কোরত সহজে। সবার সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগের টুকরো খবর ঐ বয়সে যতটুকু পেতাম তাতে অন্তরে কখনো জাগতো আনন্দের অনুভূতি,—কখনো বা সমবেদনায় ভেতরটা নরম হয়ে উঠত, কখনো বা প্রতিকারের জন্য প্রাণ হত চঞ্চল। গ্রামের দীঘির পারে আমাদের খেলাধুলো হুটোপাটি চলেছে, দীঘির কালো জলে মাছরাঙা এক একবার ঝাপটা দিয়ে জল ছুঁয়ে যাচ্ছে, অনতিদূরে দিগন্তব্যাপী পাটের বা ধানের ক্ষেত; হাওয়ার সাথে

অগুন্তি ঢেউয়ের ওঠানামা দেখতুম মুগ্ধ চোখে, কবির গানের কলি নিজের অলক্ষ্যে কণ্ঠলগ্ন হয়ে আছে "ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা"। সহজ ধ্যানে ভরা দৃষ্টিতে ফুটে উঠতো দেশের অস্পষ্ট ছবি। গাছপালা, স্থাবর জংগম, পাহাড় পর্বত, রকমারি পশু পক্ষী আর কতো মানুষের ভীড়। সবই যেন একান্ত আপন—একান্ত নিজস্ব।

গ্রামের পাবলিক লাইব্রেরী পরিচালনের দায়িত্ব আমার উপরে এসে পড়েছিল। সানন্দে ও সাগ্রহে সে দায়িত্ব বহন করেছি। লাইব্রেরীতে আগত গ্রন্থের ভিতর দিয়ে দেশবিদেশের জ্ঞানীগুণীজনের কর্মকীর্তির সংগে ঘটলো নিবিড় পরিচয়। তাঁদের চিন্তা ও প্রেরণা জীবনকে ভাবময় করে তুললো। নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধে" শাস্ত্রবনের তূর্য্য ধ্বনি "কাঁপাইয়া রণস্থল, কাঁপাইয়া গংগাজল"—যে ধ্বনি দিগন্তে তুলেছিল তার সুরলহরী আমার প্রাণকে দুলিয়ে দিয়ে গেছে। হেমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের গানগাঁথায় মর্মের মালঞ্চে মুকুলিত হয়েছে কতো নব নব আশার কুসুম। বংকিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' মনের গভীর গহনের নিস্তব্ধতা ভংগ করে দাবী করেছে দেশ জননীর জন্য সর্বস্বপণের সংকল্প, 'নীলদর্পণ' পড়তে পড়তে পেশীগুলো এক এক সময় নিজের অগোচরে দৃঢ় হয়ে হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেছে। এক এক সময় দেখেছি বাস্তবের কঠিন আঘাতে গ্রামের শান্ত সুনিবিড় ভাবটি আচমকা ভেংগে গেছে। গ্রামের জহিরুদ্দি আর খরুশেখ দলবল সহ পাট ও ধানের ভাগ নিয়ে লড়াইয়ে মেতেছে। লাঠি বল্লমে সজ্জিত সংগ্রামিকেরা। চকিতে থেমে গিয়ে পথ করে দিয়েছে

আমাদের স্কুলের পড়ুয়াদের। এতটা হানাহানির মধ্যেও বিবেক ও বিচার বুদ্ধি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

সেদিনের স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ শুধু বাংলার শিক্ষিত মনকেই নাড়া দেয়নি, গ্রামের চাষী মজুরের প্রাণকেও তা দোলা দিয়ে গেছে। এরাও সুর করে গাইতো, "ছিল ধান গোলাভরা —শ্বেত ইন্দুরে করলো সারা"—ক্ষুদিরামের ফাঁসীকে উপলক্ষ্য করে অশিক্ষিত চাষীর কণ্ঠেও জাগতো ভাটিয়ালী সুর "এবার বিদায় দেমা ঘুরে আসি"। এক এক সময় আনমনা হয়ে যেতাম এ গান শুনে,—কখনও বা তন্ময় হয়ে থাকতাম। মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রা বাংলার কুটিরে প্রবেশ করেছে—ঝড়ের বেগ নিয়ে; মধ্যবিত্ত সমাজের কচি কিশোর প্রাণে দিয়ে গেছে প্রলয়-দোলা, শাসকদের উদ্দেশ্যে কচি হাতের তর্জনী- অলক্ষ্যে শূন্যে উঠেছে—কণ্ঠে জেগেছে রুদ্র বীণা—"সাবধান সাবধান, আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্ত মূর্তিমান"। এক কথায় বলা যায় বাঙালী তরুণের কণ্ঠে ছিল বজ্র, চোখে বিদ্যুৎ-শিখা। স্কুলের বাঁধা রুটিনের বাইরে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্য ও বংকিমচন্দ্রের গ্রন্থরাজীর মধ্যে পেয়েছি দেশপ্রেমের প্রেরণা। বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী জীবনে জাগিয়েছে অভূতপূর্ব উন্মাদনা—পরবর্তী জীবনে দিয়েছে অভয় মন্ত্র।

Digbyর "Prosperous India (সমৃদ্ধ ভারত) পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে যেতাম প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধির বিপুল সমারোহের মধ্যে। স্বপ্ন ভেংগে গেলে দেখতাম শোষিত, সর্ববিভবে বঞ্চিত, দরিদ্র ভারতবর্ষকে। ব্যথায় যখন ম্রিয়মান হয়ে পড়তাম তখন বীর

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বজ্র কণ্ঠ কাণে আসতো—"উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত"।

সংবাদপত্র সংগ্রহ করে পাঠ করতাম। পাঠ্য পুস্তকের পরিধির বাইরে বিরাট জগতের সংগে ধীরে ধীরে হয়ে গিয়েছিল একটা নাড়ীর যোগ। প্রথম যুদ্ধের রণদামামা তখন সজোরে বাজছে। পরাধীন ভারতবর্ষ থেকেও সৈন্য সংগৃহীত হচ্ছে—ইংরেজের পক্ষে দাঁড়িয়ে ইংরেজের শত্রুর জীবন হনন করতে ও নিজের জীবন দিতে। বিপুল সংখ্যক ভারতীয় যুবক উৎসাহ ভরে যুদ্ধে চলেছে। ভাবী বিসদৃশ ঠেকতো ধর্ষিত ভারতবর্ষের এই মনোবৃত্তি। শুধু অর্থের বিনিময়ে যারা পরের জন্য প্রাণ দিচ্ছে তারা তো ভীরু নয়, প্রাণ তো দিচ্ছে? কেন নিজের দেশের শৃংখল মুক্তির জন্য এগিয়ে আসে না? ইংরেজ এ যুদ্ধে জিতলে ভারতের কি লাভ? ইংরাজের সুসময়ে কী তাদের প্রত্যাশা—কী তাদের

দুই

ছোটবেলা থেকেই পড়তে ভাল লাগতো ইতিহাস। দেশ বিদেশের ইতিহাসের পাতায় খুঁজে বেড়াতাম ভারতের কথা; ভারত আমার দেশ জননী, আমি তার সন্তান এই গৌরববোধ সামান্য ছিল না—আপন মনে সুর করে কতদিন আবৃত্তি করতাম—"দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ"। অন্য জাতির ইতিহাসের পাতায় তাদের কতো উত্থান পতনের কাহিনী পড়তাম। ভারতের অতীত ও বর্তমানের সংগে সে কাহিনী মিলিয়ে দেখতাম, কখনো বক্ষ গর্বে স্ফীত হতো কখনো বা হতো বেদনায় কাতর।

ইতিহাসের পাঠ্যবিষয়ের মধ্যেও সন্ধান করতুম দেশমাতৃকার সত্যিকার রূপ। পড়েছি ভারত ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ে অতুলনীয় সম্পদ ও সমৃদ্ধির বিবরণ,—শেষ অধ্যায়ে দেখলাম সহস্র গ্লানিতে ভরা নিঃস্ব এক ভূখণ্ড। বুঝতে কষ্ট হয়নি বিদেশী আক্রমণের বন্যার ফলে ধুয়ে গেছে এ দেশের ধবলগিরি,—এ পারের সোনার তাল মহাসাগর পেরিয়ে গিয়ে জমা হয়েছে ওপারে স্বর্ণলংকার রাজধানী লণ্ডন সহরে। ওপারে আলোর ঝর্ণাধারা—এ পারে নিরন্ধ্র অন্ধকার,—ঝিমিয়ে পড়া দেশ—ঘুমিয়ে পড়া মানুষ।

বিপ্লবের পথে

ম্যাট্রিক পাশ করে এসেছি ঢাকা শহরে। কলেজে পড়ছি। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস আমার আধজাগা অন্তরে ঘটালো নতুন চেতনার অরুণোদয়। এতকাল মনের গহনে এক ভাষাহীন, সুরহীন মূর্তিমান অন্ধ আবেগ গুমরে মরছিল। পথের দিশারী হিসাবে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস গণচেতনার স্বরূপ ও শক্তির প্রাণবন্ত প্রকাশ ছবির মত মানসচক্ষের সামনে এসে দাঁড়াল। চোখের উপরে যেন দেখলুম এক প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে উদ্ধত রাজমুকুট হলো ধূলিসাৎ। নিপীড়িত মনুষ্যত্বের ভগ্ন দেউলে রক্তের লেখায় ফুটে উঠেছে অগ্রগতির অমোঘ নির্দেশ। পরাধীন ভারতের মুক্তিপথের ইংগিতও যেন শোণিতাক্ষরে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসের পাতায় লেখা দেখলাম। Abbotএর লেখা নেপোলিয়ান বোনাপার্টের জীবন-ইতিহাসের মধ্যে পেলাম দুনিয়াজয়ী ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জ। যে সব ইংরাজ লেখক, বক্তা, স্বাধীনতার পূজারী সে দিনে মানুষের খ্যাতি ও বন্দনা লাভ করেছেন—তাঁদের লেখাগুলো শ্রদ্ধার সংগে পাঠ করতাম—আয়ত্ব করতাম। বার্ক ও ফক্সের লেখা আজও জীবন্ত হয়ে মনের প্রাকারে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। রাজার বিরুদ্ধে হ্যাপডেনের লড়াইকে একান্ত আপন করে দেখতে পেয়েছি। ভারতবাসীর সংগে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীর লড়াইয়ের সংগে একে দেখেছি অভিন্ন করে।

জাতির বুকের নিকষ কালো অন্ধকারে মাঝে মাঝে এখানে সেখানে আগুনের ফুলকী,—অগ্নিনালিকা গর্জে উঠছে—কোথাও হচ্ছে বোমা বিস্ফোরণ ;—সংবাদপত্রে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ পায়

ছন্নছাড়া বিপ্লবী দলের অসমসাহসিক কর্মকাণ্ড। একান্ত ভাবে কামনা করতাম এদের সংগে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এই বিপ্লবীরাই সেদিন ঘুমন্তপুরীকে জাগিয়ে তুলে মানুষের বুকের দরজায় ঘা মেরে গেছে। ছিল না কাকলী—ছিল না কোলাহল— ছিল না শ্লোগান ধ্বনি—জয়ধ্বনিহীন হয়ে জয়যাত্রার ইতিহাস এমনি রচিত হলো।

সেদিন কলুতা বাজারে ফেরারী বিপ্লবী ও পুলিশের সংগে হল গুলী বিনিময়, সারা শহরে আগুনের মত ছড়িয়ে গেল সেই সংবাদ; রোমাঞ্চকর এই ঘটনা চমক লাগালো দেশের বুকে। চাপা সমর্থন লোকের চোখেমুখে,— মনে হল বিধিয়েপড়া বুকের পাঁজরগুলো দপ ক'রে জ্বলে উঠলো। গুলীবিদ্ধ মরণপথযাত্রী বিপ্লবী যুবকের রক্তাপ্লুত দেহকে ঘিরে পুলিশের কি তৎপরতা! পুলিশ সাহেবের প্রশ্ন—"কে তুমি যুবক? কি পরিচয় তোমার?" আহত যুবক স্থির অচঞ্চল কণ্ঠে বলে---"আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।" শেষ নিঃশ্বাস ধীরে বাতাসে মিলে গেল—পরাজয় মানলো না, শেষ মুহূর্তেও আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা কোরল না, বিপ্লবী সাধনাকে জয়যুক্ত করেই চললো অমৃতলোকে। এর সম্বন্ধে কত কথাই শুনেছি—ভারী ভাল লাগছিল। কি অতুলনীয় চরিত্র! কি অদ্ভুত সুন্দর। পরে প্রকাশ

পেয়েছিল—এই বিদ্রোহী গৌহাটী সংগ্রামের বীর ফেরারী নলিনী বাগচী—অনুশীলন দলের কর্মী। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এসেছে বারে বারে। জাতির বুকে অনেকগুলো শূন্যের সামনে এ যেন একটা বিরাট 'এক'। জাতির কাপুরুষতাকে, নিষ্ক্রিয়তাকে ভেঙে দিয়েছে এই ভাঙার পূজারীদল। অন্তরীণে, নির্বাসনে এবং একক যাত্রী, দেশের লোকের স্বপ্নের মানুষ।

বি, এ, পড়ছি ঢাকা কলেজে। মহাযুদ্ধের সমাপ্তির সংগে সংগেই ভারতের সংগে ইংরেজের বিশ্বাসঘাতকতার নতুন অধ্যায় সুরু হোল, জালিয়ান ওয়ালা-বাগে হিন্দু-মুসলমান-শিখের তাজা খুনে ভিজে উঠলো পাঞ্জাবের ঊষর ভূমি। বিশ্ববাসী সবিস্ময়ে দেখলো— ইংরাজের সভ্যতার মুখোস খুলে গেছে।

সারা ভারত বিক্ষুব্ধ চঞ্চল।

গান্ধীজি এলেন ভারতের কংগ্রেসের আসরে, বিদ্রোহের নিশান হাতে। ভিক্ষাপাত্র হাতে যাঁরা এতকাল কংগ্রেসের আসর জমিয়েছিলেন, তাদের অনেকেই অপসৃত হলেন। ১৯২০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে হল তার রূপান্তর। শাসক ইংরেজের সংগে অসহযোগের নির্দেশ দিলেন গান্ধীজি। আবেদন-নিবেদনের পালা শেষ করে কংগ্রেস সামনে এসে দাঁড়ালো,—এবার তার সাংগ্রামিকের বেশ। গোটা দেশ তাকে অভিনন্দিত করলে,—

জাতির কণ্ঠের কলধ্বনি "মহাত্মা গান্ধী কি জয়"--সংগ্রামের জয়ধ্বনি হিসাবে দেশ বরণ করে নিলো।

গান্ধীজির প্রথম আহ্বান দেশের প্রাণবন্ত অংশ ছাত্র সমাজের প্রতি। ইংরাজের শাসন-শৃঙ্খল ভাঙার কাজে তার ডাক তরুণদের প্রতি,—শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুস্পষ্ট ভাষায় বল্লেন- "গোলামখানা"।

পরাধীনতার বেদনা দুঃসহ মনে হল। বন্ধনহীন ঝরাপাতার মতোই প্রথম দমকা হাওয়ায় উড়ে চল্লাম। কলেজের অধ্যক্ষকে একখানি চিঠি দিয়ে জানালাম--"দেশমাতৃকার আহ্বানে ছাত্রজীবনে ছেদ টেনে দিলাম"। আমার সংগে যুক্ত হয়েছিল নগেন ঘোষ নামে আমার এক ছাত্রবন্ধু। সম্ভবতঃ আমরা দুজনই প্রথম সত্যাগ্রহী। এতে "কেহ বা হাসিল, কেহ করিল ধিক্কার"। কয়েক মাস পরেই নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগের প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হল— সে প্লাবনে গোটা দেশের ছাত্র সমাজ ভেসে গেলো,- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হোল ছাত্র শূন্য।

ঢাকায় জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হলো। আমি শুধু উদ্যোক্তাই ছিলাম না— শিক্ষক হিসাবে কাজ করে যেতে লাগলাম। এর পেছনে যাঁদের দান ছিল অতুলনীয় তাদের স্মরণ না করে পারা যায় না- বিনয় দত্ত, প্রিয়কুমার গোস্বামী, শৈলেন দাশগুপ্ত (রুণু) প্রমুখ ত্যাগব্রতী কর্মী সমাজ।

বিপ্লবের পথে

অসহযোগের সংগে যুক্ত হল খিলাফৎ আন্দোলন। এই গংগাযমুনার সংগম স্থলে—ঢাকা জিলা কংগ্রেস অফিস পরিচালিত হল শংকর টোলায়,—পরিচালনের দায়িত্ব ন্যস্ত হল আমার উপর। এখান থেকেই হল আমার জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা। তৎকালীন বিপ্লবী বাংলার শক্তিধর বহু ব্যক্তির সংগে হল পরিচয়—ঘনিষ্ঠ সংযোগ,— তাঁদের ক্রিয়াকাণ্ডে স্বল্প কাল মধ্যেই আমি অপরিহার্য্য হলাম। সেদিন বাংলার অনুশীলন দলের নেতা ছিলেন শ্রীনরেন সেন। তাঁরই স্নেহধন্য হয়ে বিপ্লবীজীবনের যাত্রারম্ভ হয় আমার। ঢাকায় তখন অন্য কোন বিপ্লবী দল ছিল না। এই কংগ্রেস অফিসকে কেন্দ্র করে যাঁদের সান্নিধ্যে এসেছিলাম তাঁদের মধ্যে— কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, রমেশ আচার্য্য, আশুতোষ কাহিলী, তরণীভূষণ সোম, প্রবোধ দাশগুপ্ত, তারাপ্রসন্ন দে, সুবোধ নাগ, নলিনীকিশোর গুহ, রমেশ চৌধুরী, গোবিন্দ কর, রবীন্দ্রমোহন সেন, বীরেন চ্যাটার্জি, (বীরেনদা), ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তি (মহারাজ), মদন ভৌমিক, চারুবিকাশ দত্ত, যতীন রায় (ফেগা রায়), জিতেশ লাহিড়ী, জ্ঞান মজুমদার, সতীশ পাকড়াশী, নিশি পাইন, নলিনী ঘোষ, অমূল্য অধিকারী, ক্ষেত্র সিংহ, সতীশ সিংহ, জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঘোষ, দেবেন্দ্র বণিকা, যোগেশ চ্যাটার্জি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কংগ্রেসের আন্দোলন, আন্দোলন মাত্র, সংগ্রাম নয়—এর ফলে দেশে জাগরণ আসবে, স্বাধীনতা আসবে না,—এই সুনিশ্চিত ধারণা নিয়েই আমরা বিপ্লবীরা কংগ্রেসের আন্দোলন পরিচালনায়

অগ্রণী হয়েছিলাম। কংগ্রেসের আন্দোলনের সংগে খিলাফৎ আন্দোলন যুক্ত থাকায় মুসলমান সমাজের প্রাণবন্ত অংশের সংগে আমাদের যোগাযোগ হল। আমি ব্যক্তিগতভাবে একান্ত আন্তরিকতার সংগে খিলাফতের কর্মি সমাজের সংগে একাত্ম হয়ে গেলাম। সাম্প্রদায়িক সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে যে এগিয়ে গিয়েছি, এটা ঢাকা খিলাফৎ আন্দোলনের কর্মি ও নেতৃসমাজ উপলব্ধি করেছিলেন। তাদের কাছে আমি সেদিন অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছিলাম। মুসলমান যুবকদের কয়েকজনের সংগে আমার ভাবগত ও আদর্শগত যোগাযোগ হয়, তাদের মধ্যে আমি ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনা লক্ষ্য করে-ছিলাম। ধীরে ধীরে তাদের বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়াসই আমার ছিল। ঢাকার নবাব পরিবারের দুটি যুবক ইছাক ও সেলিমের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। খিলাফৎ আন্দোলনের মারফৎ ওরাও রাজনীতিতে আসে। এদের কয়েকজন আমার একান্ত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। আজ মনে পড়ে ঢাকার শিরাজুল ইসলামের কথা। চমৎকার প্রাণ-ধর্মের অধিকারী উদার হৃদয় যুবক, জীবনে কোন ছোট কাজ সে করতে পারে না। কারো বিরুদ্ধ কোন কার্য্যে তার অন্তর সাড়া দিতে পারে না, তার সান্নিধ্য আমার কাছে খুবই লোভনীয় ছিল।

বাহ্যতঃ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করলেও অনুশীলন

দলের গুপ্ত বিপ্লবী কার্য্যকলাপ বন্ধ হয়নি। আমি কংগ্রেসের অফিস পরিচালনা করলেও আমার কাজ ছিল বিভিন্নমুখী। বিপ্লবীদের গোপন কার্য্যকলাপের সংগে সংযোগ রক্ষা, খিলাফৎ আন্দোলনে সক্রিয় সহায়তা দান প্রভৃতি এক সংগে সবই চলত। মুসলমান কর্মিদের সংগে এত ঘনিষ্ঠতা সত্বেও আমাদের বিপ্লবী কাজে মুসলমান কৃষকদের অস্তিত্ব ছিল না কেন এই প্রশ্ন অনেকে করেছেন। অনেকে তাচ্ছিল্যভরে বলেছেন ওরা ইংরাজের সমর্থক, ওরা ভীরু। এমনি অনেক ছোট কথা বলেছেন। আমার মনে হয় আমাদের ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন মনের কাছে মুসলমান সমাজের সত্যিকার ছবি ফুটে উঠতে পারেনি। ভীরু তো তারা নয়ই। ঢাকার দুই দুইটি শোভাযাত্রায় দেখছি, বিপুল সংখ্যক মুসলমান জনতা ইংরাজের গুলীগোলা, পুলিশ মিলিটারী উপেক্ষা করে এগিয়ে এসেছে। শাসক ইংরাজ ঢাকা সহরে ত্রাসের মধ্যে বাস করেছে। অবশ্য খিলাফৎ কর্মিদের চলনে-বলনে গান্ধিজীর অহিংসার মর্য্যাদা রক্ষা হয়নি। সাহস, শক্তি, উৎসাহ, আঘাত করার প্রেরণা -বিপ্লবী চরিত্রের এইসব গুণ এদের মধ্যে প্রচুর ছিল কিন্তু আমরা কাজে লাগাতে পারিনি। এর দুটো কারণ—উদার দৃষ্টিভংগী ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে আমরা এগোতে পারিনি বলেই প্রাণবন্ত মুসলমান যুবকদের আমরা জাতীয় আন্দোলনের মাঝপথেই হারিয়েছি। মুসলমান কৃষক যারা সংখ্যায় বিপুল, তারা নির্য্যাতিত হয়েছে হিন্দু ছোট বড় জমির মালিকদের হাতে ; এদের উপর তাদের একটা বিতৃষ্ণা স্বাভাবিক ভাবেই ছিল। ইংরাজ রাষ্ট্রের অবসান

করে এই দেশের সর্বপ্রকার শোষণ আমরা বন্ধ করব, বিশেষ করে জমিদারী প্রথা লোপ করে কৃষককে তার জমির মালিক করব এবং এই জন্যই আমাদের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের প্রয়োজন—এরূপ কোন আদর্শবাদ তখন প্রচার করা হয়নি। বরং হিন্দু জমিদারের পীড়নের প্রতিবিধানের জন্য তাদের ইংরাজের দ্বারস্থ হতে হবে এই কথাটাই মুসলমান কৃষকেরা বুঝতো। এই কারণেও জাতীয় সংগ্রামে হিন্দু মুসলমানের বজ্রমুষ্টি এক সংগে উদ্যত হতে পারে নি। অজ্ঞান মুসলমানদের চেয়ে জ্ঞানপাপী হিন্দু নেতাদের দোষই এক্ষেত্রে বেশী বলে আমার মনে হয়েছে। এক কথায় নেতৃত্বের হিন্দু মানসিকতা জাতীয় সংগ্রামে মুসলমানদের সহযোগিতার পক্ষে অন্তরায় হয়েছে।

১৯২১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ হবে, এ প্রচার কংগ্রেসের; লোকের বিশ্বাস ও প্রতীক্ষা সত্যিই ছিল। কালের গতি-পথে ৩১শে ডিসেম্বর অতিক্রান্ত হল,—স্বরাজ এলো না। অহিংসার প্রাকারে আবদ্ধ সংগ্রামের জোয়ার ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে মরলো। বারদৌলীতে আইন অমান্যের চরম সংগ্রামের প্রতীক্ষা ছিল ভারতীয়

জনতার চৌরীচৌরার হিংসার বালুচরে অহিংস আন্দোলন হলো—গতিহারা-হলো স্তব্ধ।

গান্ধীজি নৈষ্ঠিক অহিংসাচারী, পররাষ্ট্রের শাসন ও শোষণ থেকে তিনি ভারতের মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন রক্তহীন বিপ্লবের পথে। কিন্তু দু'শ বছর ইংরেজের শাসনে পর্যুদস্ত ও শোষণে জর্জ্জরিত হয়ে ইংরেজ ও ইংরেজ শাসনের প্রতি জনসাধারণ যে দারুণ ঘৃণা ও বৈরীভাব পোষণ করতো, আন্দোলনের উৎসমুখে তা স্বাভাবিক ভাবেই দুর্বার হয়ে উঠেছিল। তাই সংগ্রামের সূচনায় আঘাত হানবার স্বাভাবিক প্রেরণায় তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। গান্ধীজির নীতিবাদ বা বিচক্ষণ নেতাদের সংগ্রাম কৌশল হিসাবে অহিংসাকে সর্বক্ষেত্রে মেনে চলা জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মুক্তিপাগল ভারতীয় জন সাধারণের দুর্জয় অগ্রগতি অহিংসার বদ্ধজলায় সেদিন পথ হারালো।

আমাদের দেশের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সমসাময়িক কালে রাশিয়ায় সুরু হয়েছে বিপ্লবের জয়যাত্রা-এই বিপ্লবের হোতাদের সঙ্গে ভারতের অগ্নিপূজারীদের যোগ ছিল।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নকে যাঁরা তুলে ধরেছিলেন এবং যাঁরা তার বাস্তব রূপায়নে সাহায্য করেছিলেন, তাদের মধ্যে তখন রাসবিহারী বসু, মানবেন্দ্র নাথ রায়, অবনী মুখার্জ্জি, ডাঃ ভূপেন্দ্র দত্ত, বীরেন চাটার্জ্জি, বরকত উল্লা (ভোপাল), হরদয়াল সিংহ (পাঞ্জাব) রামচন্দ্র

(পেশোয়ার) ভাই পরমানন্দ, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য— তাঁরা সবাই ছিলো আমাদের গর্ব্বের বিষয়বস্তু। অবনীমুখার্জ্জি ও নলিনী গুপ্তের রাশিয়া থেকে গোপনে ভারত আগমন আমাদের তরুণ বিপ্লবী মনে যথেষ্ঠ উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছিল।

তিন

অসহযোগ আন্দোলনের গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। জাতির বুকের ধূমায়মান বহ্নি কিন্তু গান্ধিজীর নির্দেশে নিভে যায় নি। জাতির মন বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল। বাংলার বিপ্লবী দলের কর্মী সমাজ অসহযোগের বিরতির পর স্বকীয় পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। বিপ্লবী সংস্থাগুলো সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। তরুণ বিপ্লবীদের প্রাণ-চাঞ্চল্য লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে, অধীরতাও দেখা দেয় আঘাত হানবার জন্য। অনুশীলন দলের মধ্যেও দুটি মত সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।—নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ চাইলেন ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে ইংরেজের সংগে একবার শক্তি পরীক্ষা সুরু করতে। সংগে সংগে বাংলার বিভিন্ন জেলায় ও বাংলার বাইরে বিভিন্ন কেন্দ্রে যেখানে দলের শক্তি আছে—ভিন্ন ভিন্ন প্রোগ্রামে রাজশক্তিকে আঘাত করার কথাই তখন হচ্ছিল। এতে সফল বিপ্লব হবে না, তবে একবার আগুন জ্বালাতে পারলে একে নেভাতে রাজশক্তির প্রচুর বেগ পেতে হবে। সরকারী অস্ত্রাগার দখল করা, সরকারী ব্যাংক লুঠ করা, কারাগার ভেঙে দেওয়া, যানবাহন চলাচল ব্যাহত করা,—এর অনেক গুলোই ছিল প্রোগ্রামের অন্তর্গত। অন্যমতের সমর্থকেরা বল্লেন, আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেছে। জনতাকে টেনে এনে আর বিপ্লব করা যাবে না। অসহযোগ

আন্দোলন যদি আর কিছুকালও চলত, ইংরাজকে অসহযোগের অহিংস আঘাত হানার প্রোগ্রাম নিয়েও জনতাকে সহিংস আঘাতে প্রবুদ্ধ করা যেত। কংগ্রেস নেতারা পিছিয়ে পড়লেও ওদের হাত থেকে আক্রমণোদ্যোগের নেতৃত্ব বিপ্লবী নেতারা গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু অসহযোগের আচমকা রুদ্ধগতি জনতার পশ্চাৎ-গামিতাতেই পর্য্যবসিত হয়েছে, কাজেই এ সময়ে বিপ্লবের আহ্বান সময়োচিত হবে না।

দলের মধ্যে এমনি দুইটি মতের সমর্থক লোক থাকলেও প্রস্তুতির ব্যাপারে সকলেই এক মত ছিল। এবং তারই আয়োজন পাকা চলছিল অত্যন্ত সংগোপনে।

১৯২৩ সালে দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন। "নো-চেঞ্জার ও প্রো-চেঞ্জার"এর মধ্যে শক্তির লড়াই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহেরু এঁরা ছিলেন কংগ্রেসের নতুন নীতি নির্ধারণের পক্ষে। মহাত্মার অন্তরংগ হিসাবে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের অসহযোগ নীতির পক্ষে;—সেদিন "নো-চেঞ্জার ও প্রো-চেঞ্জার"এর লড়াই কাউন্সিলে প্রবেশ করা না করাকেই কেন্দ্র করে চলেছিল।

বিপ্লবের পথে

খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার থেমে যাবার সাথে সাথে বাংলার বিপ্লবী দলের মধ্যে সহিংস আঘাতের জন্য প্রস্তুতি সুরু হয়। এর এক অংশ অবিলম্বে কর্ম সম্পাদনের জন্য অধীর হয়ে ওঠে। বাংলার দুর্ভাগ্য যে, বিপ্লবীরা কখনও একতাবদ্ধ হয়ে ইংরাজ শাসনকে আঘাত করতে পারে নি। তাই সেদিনের আঘাত প্রচেষ্টাও ছিল বিচ্ছিন্ন। কলকাতার বিপ্লবী নেতা সন্তোষ মিত্রের দলের কর্মপ্রচেষ্টা শাঁখারিটোলা ও উল্টাডাংগা পোষ্ট আফিসে ডাকাতির দ্বারা অর্থ সংগ্রহ, দলের বিশ্বাসঘাতক কর্মীর জীবনাবসান চেষ্টায় মির্জাপুরে এক দোকানে বোমা নিক্ষেপ ইত্যাদিতে প্রকাশ পায়। বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে আক্রমণ করতে গিয়ে ভুলক্রমে এক নিরপরাধ শ্বেতাংগ ব্যবসায়ীকে হত্যা করে।

কলিকাতার জন ও যানমুখর রাস্তা—অফিসের সময় ভীড়ের অন্ত নেই। যুবক গোপীনাথ দুর্ধর্ষ টেগার্টের প্রাণ হননের নেশায় বিভোর হয়ে পথে বেরিয়েছে। টেগার্টকে দু'চারদিন লক্ষ্যও করেছে। শ্বেতাংগ ব্যবসায়ী মিঃ ডে'র চেহারার সংগে টেগার্টের চেহারার সাদৃশ্যও কিছুটা হয় তো ছিল। গোপীনাথের হাতের রিভালভার মুহুর্মুহু গর্জে উঠল। যুবক অচঞ্চল লক্ষ্যে— তার রিভালভার চালিয়ে চলেছিল। শেষ টোটাটি পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করে—গোপীনাথ সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলো—কৌতুহলী জনতার সাথে পুলিশও এতক্ষণ ছিল নির্বাক দ্রষ্টা। এবার পুলিশ দল ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর।

বিচারে গোপীনাথের ফাঁসি হল। বীর যুবক হাসি মুখে ফাঁসীর মঞ্চে আত্মদান করলো। তার উদ্দেশ্যে—দেশবাসীর বন্দনা চারিদিক থেকে উৎসারিত হলো—তার দেশপ্রেমকে অভিনন্দিত করলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—কংগ্রেসের প্রাদেশিক অধিবেশনে।

এই সময় এই দিল্লী কংগ্রেসকে কেন্দ্র করেই অনুশীলন দলের নিখিল ভারতীয় বিপ্লবী নেতৃত্বের সমাবেশ হয়। বাংলার প্রত্যেক জেলায় বিপ্লবী নেতৃত্বে যাঁরা আসীন ছিলেন, তাদের উপরও নির্দেশ ছিল দিল্লীতে সমবেত হবার। অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগের ফলে দিল্লী কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ সহজেই বিপ্লবী কর্মীরা পেয়েছিল। দিল্লীতে আমাদের দলের নিখিল ভারতীয় সদস্যদের গোপন বৈঠকে ভাবী কর্মকাণ্ডের কথা আলোচিত হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবী কর্মীদের সংগে ভাবের আদানপ্রদান করার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। তা ছাড়া বাংলার বিভিন্ন জেলার দলের বিশিষ্ট কর্মীদের সংগেও আমরা অন্তরংগ ভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পেয়েছিলাম এই দিল্লী কংগ্রেস অধিবেশনকে কেন্দ্র করে।

দিল্লী কংগ্রেস থেকে ফিরবার পথে হাওড়াতে বাংলার বিপ্লবী নেতারা অনেকেই "তিন আইনের" কবলে বন্দী হন। সুভাষচন্দ্র এই বন্দীদের অন্যতম। বলা বাহুল্য, সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রচারিত হবার সংগে সংগে আমাদের দলের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে

কেউ কেউ গ্রেপ্তার এড়িয়ে আত্মগোপন করেন। পরবর্তী কালে এই ফেরারীরাই বিপ্লবী দলের কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যান।

তখনও অনুশীলন দলের নেতা নরেন সেন, প্রতুল গাঙ্গুলী, রমেশ আচার্য্য ও রবীন্দ্রমোহন সেন ফেরারী জীবন অবলম্বন করে দলের বিপ্লবী প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময় প্রধান কেন্দ্র ঢাকাতেই বোমা তৈরীর ব্যবস্থা হয়েছে। রাশিয়া প্রত্যাগত নলিনী গুপ্ত মহাশয়ের পরিচালনায় বোমার মালমশলা সংগ্রহ ও কিছু কিছু experiment চলছে। বিভিন্ন জেলা থেকে বিশ্বস্ত কর্মীদের আনাগোনা চলছে এই উপলক্ষে। তখন আমি বাহ্যতঃ কংগ্রেসের পরিচালনের দায়িত্বে যুক্ত থাকলেও ফেরারী নেতৃদ্বয়ের (নরেন সেন ও প্রতুল গাঙ্গুলী) সংগে যোগাযোগ রক্ষা— বিভিন্ন কর্মীদের সংগে তাঁদের গোপন দেখাসাক্ষাতের ব্যবস্থা করা ও অন্যদিকে বোমা প্রস্তুতির আস্তানার সাথেও সংযোগ রক্ষা করা ইত্যাদি কাজে ব্যাপৃত ছিলাম। এই সময় বীরেন চ্যাটার্জির (বীরেন দা) পরিচয় নিয়ে নোট জাল করার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ ঢাকায় এলেন। দলের প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ অপরিহার্য্য। এতকাল দলের নিষ্ঠাবান সম্পন্ন কর্মীদের অর্থে ও ডাকাতির দ্বারা লব্ধ অর্থে কাজ চলেছে। ডাকাতির পথে অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে, ডাকাতির জন্য খুন এবং সেই খুনের মামলা চালাতে গিয়ে আবার ডাকাতি করতে আমরা বাধ্য হয়েছি। এতে কাজের ক্ষতিও হয়েছে বিপুল। এ জন্যই নোট

জালের পরিকল্পনা করা হয়। এপথ কিছুটা নিরাপদ এবং ইংরাজের অর্থ ভাণ্ডারের উপর পরোক্ষ আঘাত এতে পড়তে পারতো। নোট জাল করেই টাকার ব্যবস্থা হলে কম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বৃহত্তর কর্ম সমাধা সম্ভব হয়। যাক, কাজ এগিয়ে চললো— আস্তানা তৈরী হল, শচীন চক্রবর্তী, প্রবোধ দাশগুপ্ত সব কাজ ফেলে এই কার্য্যে সক্রিয় ভাবে আত্মনিয়োগ করলো। দলের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমি এই নোট জাল ব্যাপারে গভীরতর ভাবে যুক্ত হই। এই বিষয়ে আমরা ক্রমেই সফল হচ্ছিলাম।

১৯২৪ সালের শেষের দিকে Bengal ordinance জারী হল,—যে রাত্রে ordinance জারী হল সেই রাত্রেরই শেষ দিকে বাংলার সর্বত্র খানাতল্লাস, ধরপাকড় আরম্ভ হল। পূর্বে স্বল্প সংখ্যক বিপ্লবী নেতা তিন আইনে ধৃত হয়ে রাজবন্দী-জীবন যাপন করছিলেন। এবার প্রত্যেক জেলা থেকেই বিশিষ্ট কর্মীদের গ্রেপ্তার করে রাজবন্দী করা হল। গোটা বাংলা দেশ থেকে প্রায় দুই শত বিপ্লবী কর্মীকে সেবার বিনা বিচারে আটক করা হল। আমিও সেই সময়ে ধৃত হই। আমাদের আরব্ধ বিপ্লব প্রস্তুতি অর্ডিন্যান্সের ফলে ব্যাহত হয়। ঢাকা শহরে ব্যাপক খানা-তল্লাসী হল। কিন্তু

গ্রেপ্তারের বেলায় বিশিষ্টতম ব্যক্তিদের উপর হল প্রথম আঘাত। বিনা বিচারে অবরুদ্ধ হয়ে আমরা রাজবন্দীর তালিকা দীর্ঘ করলাম।

১৯২৪ সাল।

বহ্নিমান এই বছরটি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অসহযোগের শ্বেত শিখাটি নিভে গেছে; কিন্তু জনচিত্তের ধূমায়মান বহ্নি ভারতের বিপ্লবী আধারে মাঝে মাঝে লোহিত শিখায় জ্বলে ওঠে। বাংলার বিপ্লবী তরুণের হাতের অগ্নিনালিকা এখানে সেখানে গর্জে ওঠে;—দেশের বুকের তমিস্রা ভেদ করে জ্বলে ওঠে রক্তশিখা। অর্ডিন্যান্সের মুগুরাঘাত এ আগুন নেভাতে পারে নি। অনুশীলন ও যুগান্তর দলের প্রাণবন্ত কর্মিদের মধ্যে হল যোগাযোগ। দিল্লী কংগ্রেসের পরে তিন রেগুলেশনে ও পরবর্তী অর্ডিন্যান্সের বেড়াজালে বিপ্লবী নেতা ও কর্মি সমাজের অনেকেই কারারুদ্ধ, কিন্তু গ্রেপ্তার এড়িয়ে ফেরারী জীবন যাপন করছেন এমন নেতা ও কর্মী তখনও ছিলেন। অনুশীলন দলের পক্ষ থেকে বোমা প্রস্তুতি ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের যে আয়োজন চলছিল,—নেতা ও বিপুল সংখ্যক কর্মীর গ্রেপ্তারের পরেও তা খণ্ড খণ্ড ভাবে এগোতে থাকে। আমাদের স্বপ্ন ছিল বিপ্লবী অভ্যুত্থান। কিন্তু আমাদের সহকর্মীদের কারো

কারো মনে ছিল বিপ্লবী আঘাতের আয়োজন করা। আঘাত যদি দুর্বার করে তোলা যায়, অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র রচনা করা সহজ হয়—এই বিশ্বাস ছিল অনেকের। এই শেষোক্ত মতবাদে বিশ্বাসী আমাদের দলের কিছু কর্মী বাংলা দেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে দলের কাজে ব্যাপৃত ছিল। এদের মধ্যে শচীন সান্যাল, যোগেশ চ্যাটার্জি, গোবিন্দ কর, রাজেন লাহিড়ী, চারুবিকাশ দত্ত, যতীন দাস, ঢাকার সুধীর ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিদের নাম করা যেতে পারে। এঁরা বাংলা দেশের অন্যান্য বিপ্লবী দলের কর্মিদের সংগেও যোগাযোগ স্থাপন করেন। সেদিনের যুগান্তর দলের কর্মীদের মধ্যে হরি নারায়ণ চন্দ, বীরেন ব্যানার্জি নদীয়ার অনন্তহরি মিত্র, চট্টগ্রামের সূর্য্য সেন, নগেন সেন (জুলু), বরিশালের অনন্ত চক্রবর্তী প্রমুখ শক্তিশালী কর্মীদের কথাও বলা যেতে পারে। জ্যোতিশ দা (অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ) এই সম্মিলিত বিদ্রোহী তরুণদের আঘাতের পরিকল্পনাকে সাধ্যমত সমর্থন করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বর ষড়যন্ত্র মামলা ও কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা বাংলার ও ভারতের অনুশীলন দলের ও বাংলার যুগান্তর দলের কিছু সংখ্যক কর্মী সহযোগে গঠিত দলের কার্য্যকলাপের ফলমাত্র। দক্ষিণেশ্বরে আবিষ্কৃত বোমার ধ্বংস ক্ষমতা ছিল প্রচণ্ড ইংরাজ বিশেষজ্ঞরা এক বাক্যে তা স্বীকার করেছেন. সেবারে এই বিপ্লবী প্রস্তুতির পরিসমাপ্তি ঘটে দক্ষিণেশ্বর ও কাকোরী ষড়যন্ত্র আবিষ্কারের সংগে সংগে। এই সময় আসাম ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ সমূহের বিপ্লবী প্রস্তুতি কলিকাতা ও কাশী থেকেই পরিচালিত হয়।

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলাব ব্যাপাবে বাংলা, আসাম, ব্রহ্ম দেশ এবং কাকোরী ষড়যন্ত্রে বাংলা ও ভাবতের বিভিন্ন প্রদেশেব খ্যাতনামা বিপ্লবীদের যোগাযোগ বিভিন্ন প্রামাণ্যসূত্রে আবিষ্কৃত হয়।

এর পবের অধ্যায শেষ হয় দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলায়। অনুশীলেন দলের পাঞ্জাবী কর্মী ইন্দ্র নাবাং, বীরেন ভট্টাচার্য্য ও চট্টগ্রামের সুখেন্দু দত্ত প্রমুখ কর্মিগণের বিপ্লবী কার্যা কলাপ এই ষড়যন্ত্র সূত্রে প্রকাশ পায়। যাদবপুর কলেজেব ছাত্র ইন্দ্র নারাং পাঞ্জাবী হলেও বাংলা ভাষা চমৎকাব বলতো,—ঢাকার কথ্য ভাষাও এমন সুন্দর বলতে পারত যে তাকে ঢাকার লোক বলেও অনেকে ভুল করতো। হাসি, গল্পে প্রাণখোলা তরুণ ইন্দ্র নারাং আজও আমাদের স্মৃতিতে সজাগ হয়ে রযেছে।

এই সময়ে বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীদের সংখ্যা ছিল দুই শতের কিছু বেশী। দক্ষিণেশ্বর ও কাকোরী ষড়যন্ত্রে দীর্ঘ কারা দণ্ডে দণ্ডিত বিপ্লবীদের সংখ্যাও সামান্য ছিল না।

এ ছাড়া ফাঁসীর মঞ্চে আত্মদান করেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে দক্ষিণেশ্বর ষড়যন্ত্রে দণ্ডিত ও পরে গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ভুপেন চট্টোপাধ্যায়কে আলিপুর জেলের মধ্যে হত্যা

করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত চট্টগ্রামের অনুশীলন দলের প্রমোদ চৌধুরী ও নদীয়ার যুগান্তর দলের অনন্তহরি। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় যে চার জনের ফাঁসী হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন—রাজেন লাহিড়ী, আসফাকুল্লা, রামপ্রসাদ ও রোসন সিং।

চার

১৯২৭ সালের শেষ দিকে বাংলার রাজবন্দীরা ক্রমেই কারাগার ও অন্তরীণ থেকে মুক্তি পেয়ে নিজ কর্মকেন্দ্রের দিকে ফিরে এলো। কিছুকাল জেলে বাস করার পর আমার উপর বাংলা দেশ ছেড়ে যাবার হুকুম হয়, ছিলাম কিছুকাল নৈনীতালে। দেশে ফেরার অনুমতি পেয়ে আমিও ফিরে এলাম। এই চার বছর আটকের ফলে বাংলার বিপ্লবী কর্মকেন্দ্রগুলো একের সংগে অন্যের সংযোগ-সূত্র হারিয়েছিল। ছেঁড়া তার জোড়া লাগানোর কাজ সুরু হল নতুন করে। এবার জেলখানায় কিছু সময় কর্মস্থান থেকে চিন্তা করার প্রচুর সুযোগ মিলেছে। তা ছাড়া একই জেলে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের নেতা ও কর্মীরা এক সংগে বাস করাতে পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতাও বেড়েছিল। ভবিষ্যতে জেলের বাইরে গিয়ে এক সংগে মিলেমিশে একটি প্রোগ্রামে কাজ করার প্রয়োজনীয়তাও অনেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। সেই সুযোগ এবার এল।

ছাড়া পাবার পরেই দুই বিপ্লবী দলের উপরের স্তরের নেতারা পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনা সুরু করে দিলেন। কর্মীরাও নতুন উদ্যমে গড়ে তুলছেন সংগঠন। গোড়ার দিকে সবারই মনে একটা আশা জেগেছিল—বাংলার এই দুইটি দল এক হতে পারলে

বিপ্লবী সংস্থা যেমন মজবুত হবে তেমনি ইংরাজকে আঘাত দেবার ক্ষমতাও বেড়ে যাবে। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো, মিলনের আশা ততই দূরে সরে যেতে লাগলো। প্রোগ্রামে অমিল হয় নি,—অমিল স্থানীয় কর্তৃত্ব নিয়ে। নেতৃত্বের বেলায় যেমন বাধা এসেছে তেমনি বাধা এসেছে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বা মহকুমায় দুই দলেরই সংগঠনে, পরিচালন ব্যবস্থায়। প্রাধান্যের প্রশ্নই সেখানে বড় হয়ে দেখা দিল। এক দল আর এক দলের স্থানীয় নেতার উপর নির্ভর করতে পারছিল না। এই দুই দলের মিলন প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে গেল।

উভয় দলের তলার দিকের বহু কর্মীর মধ্যে একটা ঘনায়মান অসহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হল। উপরের স্তরে যদি মিলন না ঘটে তবে একটা জোড়ালো প্রোগ্রাম নিয়ে দুই দলের বিক্ষুব্ধ কর্মীরা নতুন ভাবে সংগঠন গড়বে। ১৯২৮ সালের কোলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন পর্যন্ত উপরের স্তরের মিলনপ্রচেষ্টা চলছিল। এ পর্য্যন্ত এসেই এ উদ্যমে ছেদ পড়ল। উভয় দলের অসহিষ্ণু কর্মীরা এবার তলে তলে দলের মধ্যে ভাঙন ধরাতে লাগলেন। দুই বিপ্লবী দলের অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহী কর্মীদের অন্তর্দ্রোহের ফলে বৃহৎ সংগঠনগুলো ভেঙে পড়তে লাগলো।

সাংগঠনিক দিক দিয়ে অনুশীলন দল অধিকতর কেন্দ্রিক ও ও দলীয় নিয়মশৃংখলার অনুবর্তী ছিল। স্বর্গীয় পুলিনবিহারী দাসের

লৌহকঠিন শৃংখলার চাপ তখনও দল থেকে একেবারে মুছে যায়নি। তৎসত্ত্বেও অনুশীলন দলেও যথেষ্ট ভাঙন দেখা দিল। যুগান্তর দলের মধ্যে বিকেন্দ্রিক মনোভাব সমধিক পরিস্ফুট ছিল। কারণ এই দলটি ভিন্ন ভিন্ন দলনেতার পরিচালনাধীন দল সমূহের সমবায়ে গঠিত। ভিন্ন ভিন্ন দলনেতার নামেই দলের স্থানীয় পরিচয়। অনুশীলন দলে কিন্তু কোন দলনেতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত বা স্বীকৃত ছিল না। একজন ভাল কর্মী একটা জেলায় সাফল্যের সংগে দল গঠন ও পরিচালনা করতে পারছে তার এই যোগ্যতা তাকে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় ছুটিয়েছে। যে কর্মী এক জেলায় ভাল দল গঠন করেছে—দলের প্রয়োজনে তাকে হয় তো অন্য জেলায় গিয়ে দলের দায়িত্ব নিতে হয়েছে। সবই দলের প্রয়োজনে ও দলের নির্দেশে করা হয়েছে। অনুশীলন ও যুগান্তর দলের গঠনতান্ত্রিক পার্থক্য এমনি ছিল। এই কারণে বিদ্রোহী, অসহিষ্ণু কর্মী সমাজের প্রচেষ্টা সাফল্যের সংগে যুগান্তর দলের মধ্যেই গভীরতর ভাঙন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও পরবর্তী কালে অনুশীলন দলের শ্রেষ্ঠ কর্মীদের অন্যতম সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন, জগদীশ চ্যাটার্জী, পান্নালাল দাশগুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিরা দলের গণ্ডী কেটে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

এই সময় অনুশীলন দলের প্রধান আড্ডা ছিল ১৬৪ নং বৌ-বাজার স্ট্রিটে। শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত সেখানে থেকেই দলের যাবতীয় পরামর্শ ও পরিচালনায় সাহায্য করতেন। দলের নেতাদের

মধ্যে প্রতুল গাঙ্গুলী, রমেশ আচার্য্য, রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি প্রায়ই সেখানে যাতায়াত করতেন। কেদার বাবু রোগজীর্ণ দেহ নিয়ে যেন দলের প্রাণকেন্দ্রে বসে আছেন। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, দিনের পর দিন নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে দলের কাজ করে চলেছেন। তূলার ব্যবসা সূত্রে বহির্বাংলার সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে দলের জন্য অর্থ সংস্থান কোরেছেন এই পথে। দধিচীর অস্থিদানের জীবন্ত প্রতীক। দারুণ যক্ষারোগে শয্যামগ্ন বিশীর্ণ দেহ মানুষটি আমাদের বিপ্লবী যাত্রা পথের দিশারী—প্রেরণাদাতা; মন্ত্রগুপ্তির সিদ্ধসাধক কেদার বাবুর পরামর্শ দলের নেতৃস্থানীয়দের কাছে অপরিহার্য্য ছিল। প্রতিটি জেলার বিশিষ্ট কর্মীদের ও কোন গুরুতর সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন হলে তাঁর শয্যাপার্শ্বে তারাও উপস্থিত হতো। দলের জন্য অর্থ ও অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যাপারে কেদার বাবুর পরামর্শ ছাড়া চলতো না। সেদিনে অনুশীলন দলের বিশিস্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবান ব্যক্তির অভাব ছিল না— কিন্তু কেদার বাবু যেন অনেককেই অতিক্রম করে গিয়েছিলেন— এবং সেদিক থেকে তিনি যে কি ছিলেন তা ব্যক্ত করার ভাষা আমার নেই—আমি শুধু বলবো—এ অপূর্ব।

ঐ কংকালটিকে দেখে কেউ কি কল্পনাও করতে পারে— কত বড় শক্তির আধার ছিল এই মানুষটি! দলের প্রতিটি কর্মীর

জন্য কি অতুলনীয় দরদ—এই শুষ্কপাঁজর গুলোর তলে! অহর্নিশ ধ্যান জ্ঞান মনন—একটি আদর্শকে ঘিরে।

কিছু দিন কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ঢি, রতন ফটোগ্রাফারের পাশের বাড়ীতে আমরা থাকবার ব্যবস্থা করলাম। সেখানে ছিলাম রমেশ আচার্য্যকে নিয়ে আমরা দুইতিন জন। রান্নাবান্না সব স্বহস্তেই চলছে। পরিশ্রম একটু বেশি হলেও ব্যয় অনেক কম। কিছুটা স্বপাকের প্রেরণা এখানে। এতদ্ব্যতীত সতর্কতার খাতিরেও পরিচারক নিয়োগ চলে না। কারণ গোয়েন্দা বিভাগের দরাজ হস্তের পুরস্কার পেয়ে অনেক সময় এদের ভূমিকা হয় সংবাদ সরবরাহকারীর। এখানে প্রতুল বাবু, রবিবাবু সবাই আসতেন। বিভিন্ন জেলা থেকে দলের পরিচালকরাও আসতেন। পাশের বাড়ীতেই থাকতেন শ্রীবীরেন চ্যাটার্জী সপরিবারে, বাংলার বিপ্লবী মহলে তিনি 'বীরেনদা' নামেই সুপরিচিত। অগ্নিযুগের প্রথম দিকে বীরেনদার উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসিকতার বহু গল্প মুখে মুখে প্রচারিত আছে, তার মধ্যে আছে ইংরাজ পুলিশকর্তা মিঃ লোম্যানের হাত ভেঙে দেবার গল্পটি। বীরেনদার সাহস ও শক্তির স্বীকৃতি আমরা নত মস্তকে মেনে নিতাম। উপরটা দেখলে মনে হোত বাপ-রে কি কঠিন! কিন্তু ভেতরটা ছিল দলের ছেলেদের জন্য কোমল স্নেহে ভরা।

আমাদের বিদ্রোহী বন্ধুদেরও কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটের বাসায় আনা-

গোনা ছিল। বুঝতে পারছিলাম, তারা সম্মিলিত ভাবে একটা আঘাত হানবার পরিকল্পনা করছে। চট্টগ্রামের পাহাড় পরিদর্শনের খবরও পেলাম। এদের আগ্নেয়াস্ত্রের অভাব ছিল। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জোর চেষ্টা চলছিল। কিছুটা শক্তি সংগ্রহ করেই এরা আঘাত হানবে ঠিক করেছিল। এদের ধারণা ছিল একটা সসীম ক্ষেত্রে শক্তি কেন্দ্রীভূত করে একটা সফল আঘাত হানা। ক্ষুদ্র সফল আঘাত বৃহত্তর আঘাতের ক্ষেত্র রচনা করবে, গোটা দেশের বিপ্লবী তরুণ সমাজ প্রবুদ্ধ হবে বৃহত্তর আঘাতের ক্ষেত্র রচনায়।

বিদ্রোহী বন্ধুদের এই দৃষ্টিভংগী ধীরে ধীরে বিপ্লবীদলগুলোর তরুণ কর্মীদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। বাংলার বিপ্লবী ষড়যন্ত্র এতাবৎ কাল ষড়যন্ত্রের স্তর পেরিয়ে এসে অভ্যুত্থানের স্তরে উঠতে পারেনি। আয়োজন সম্পূর্ণ হতে না হতেই রাজশক্তির আঘাত এসে আচমকা ভেঙে দিয়েছে সব প্রস্তুতি, উদ্যোগ পর্ব অকস্মাৎ বিয়োগান্তক রূপ পরিগ্রহ করেছে—ইতিহাসের এই মর্মান্তিক অধ্যায়গুলোর উপরই তরুণ কর্মীদের দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে থাকে। যে কোন অবস্থায় একটা কঠিন আঘাত বিদেশী রাজশক্তিকে দিতে হবে—প্রবল আগ্রহ এই দিকে গতি নেয়। বিপ্লবের ঝড়ে ইংরাজের রাজপাট ধূলিসাৎ করার স্বপ্ন এবার বিদ্রোহীর দুর্জয় আঘাত হানার সসীমতার প্রাকারে যেন আবদ্ধ হতে চললো। বিপ্লবী রূপান্তরিত হতে চললো বিদ্রোহীতে—ইংরাজ সহজে বলবার সুযোগ পেলো এরা

"টেরোরিষ্ট"—সন্ত্রাস বাদীর দল। বিদ্রোহী বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের মৌলিক পার্থক্য—এই কর্ম্মসূচি রচনায়। ব্যাপকতর সংগঠন ও সুনিশ্চিত প্রস্তুতি ছাড়া দেশব্যাপী বিদ্রোহ সম্ভব নয়, এরূপ ধারণা আমরা পোষণ করতাম বলেই বিদ্রোহী বন্ধুদের প্রচেষ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অগ্রসর হবার জন্য আমরা সঙ্কল্প বদ্ধ হলাম।

ব্যাপক বিদ্রোহ প্রচেষ্টায় বৈদেশিক শক্তির সাহায্য একান্ত আবশ্যক। ঠিক হোল, ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর মধ্যস্থতায় জাপানের সাহায্য পাবার জন্য অনতিবিলম্বে একজনকে পাঠাতে হবে এবং তদনুযায়ী শ্রীরমেশচন্দ্র আচার্য্য মহাশয় আমাকে জাপানে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে নির্দ্দেশ দিলেন।

বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়া ইতিমধ্যেই সরগরম হ'তে সুরু করেছে। বিদ্রোহী বন্ধুরা তাদের বৈপ্লবিক প্রস্তুতি দ্রুত অগ্রসর করে যেতে লাগলেন। বোঝা যাচ্ছে যে শীঘ্রই তাঁরা আঘাত হানবে। কলিকাতা ও মফঃস্বলের গোয়েন্দা পুলিশ তৎপর হয়ে উঠেছে। সহস্র (১) গুপ্তচর বিপ্লবী দলের সভ্যদের ও তাদের বিভিন্ন আড্ডাগুলি জানবার জন্য নানাভাবে অনুসরণ করে চলেছে।

ইতিমধ্যে মেছুয়াবাজার এক মেস্‌বাড়ীতে হানা দিয়া পুলিশ পেলো, তাজা বোমা ও বিস্ফোরক পদার্থ। যুগান্তর ও অনুশীলন দলের বহু বিশিষ্ট নায়ক ও কর্ম্মীরা ধরা পড়ে গেলো। প্রাথমিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হোল।

বিপ্লবের পথ

১৯৩০ সাল, ৮ই এপ্রিল রাত্রিবেলা চট্টগ্রাম সহরে বিপ্লবীরা উঠালো বিদ্রোহের নিশান। অস্ত্রাগার দখল ও লুণ্ঠন করে বিদ্রোহী বন্ধুরা পেলো, অস্ত্রের রাশি। সরকারী ভবন আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল পাহাড়ে ও রাস্তায় সরকারী সৈন্যের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম। শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় আশ্রয় নিল, বন্দরে।

ভারতের সঙ্গে চট্টগ্রাম সহরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোল। ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ মধ্যরাত্রে বেতার যোগে কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের মারফত খবর পেলো, চট্টগ্রামের বিদ্রোহের এই সংবাদ। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ তারা সিদ্ধান্ত করলো রাত্রের অন্ধকারেই বিশিষ্ট ও চিহ্নিত বৈপ্লবিক পার্টির সভ্যদের গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে দিতে যেন তারা দিনের বেলায় সংবাদ পেয়ে বিদ্রোহের বিস্তারে সহায়তা করতে না পারে। ভোর হ'বার আগেই বাংলার সর্ব্বত্রই ধর পাকড় স্থরু হয়ে গেলো।

৮ই এপ্রিল পৌঁছেচি গিরীডি সহরে—ভ্রাতৃ-বধূর সঙ্কটাপন্ন পীড়ার খবর পেয়ে। পরদিন বিদ্রোহের সংবাদ সহরে পৌঁছাবার পূর্ব্বেই বিহারের ডেপুটি পুলিশ কর্ত্তা কলকাতার পুলিশের নির্দ্দেশে দলবলসহ গিরীডি সহরে এসে হাজির হলো এবং গ্রেপ্তার করে বাংলায় পাঠিয়ে দিল।

পাঁচ

বিনাবিচারে আটক বন্দী আমরা। প্রেসিডেন্সী জেল ক্রমেই ভর্তি হচ্ছে। বিভিন্ন দলের নেতা ও কর্মীদল ক্রমে ক্রমে গ্রেফতার হ'য়ে আসছেন। মেছুয়াবাজার বোমার মামলার আসামীদের মধ্যে জগদীশ চ্যাটার্জী, নির্মল দাশ প্রমুখ যে চার জনকে রাষ্ট্রদ্রোহের ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসানো গেল না, তাঁদেরও রাজবন্দী করে এখানে পাঠানো হ'ল। অনুশীলন দলের কর্মী জগদীশ চ্যাটার্জীর কাছ থেকেই খবর পাওয়া গেল, বাংলার বিপ্লবী দলগুলোর মধ্য থেকে বিদ্রোহ করে যাঁরা বেরিয়ে এসেছিলেন, মেছুয়াবাজার বোমার ষড়যন্ত্র তাঁদের সবারই মিলিত প্রচেষ্টা। প্রচেষ্টার সূচনাতেই মেছুয়াবাজারে যে বিপর্য্যয় ঘটে গেল, তাতে তাঁদের ব্যাপক ভাবে আঘাতের পরিকল্পনা বানচাল হ'য়ে গেল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়কেরা ছিলেন বিদ্রোহীদের একটী প্রধান অংশ। বাংলার অন্যান্য স্থানের বিদ্রোহীদের সাথে একই পরিকল্পনায় ব্যাপক ও গুরুতর আঘাত হানার ষড়যন্ত্রে এরাও যুক্ত ছিলেন। মেছুয়াবাজারে বিপর্য্যয় ঘটায় এবং বিদ্রোহীদের নেতৃস্থানীয় কয়েক জন ধৃত হবার ফলে ব্যাপক আঘাত অসম্ভব হ'ল। এর পরে চট্টগ্রামের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা যে

একটা বিচ্ছিন্ন প্রয়াস তাহা সহজেই বোঝা গেল। বুঝতে কষ্ট হয় না বাংলার বিভিন্ন অংশের বিদ্রোহীদের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ভাব গড়ে না ওঠায় যুগপৎ শক্ত আঘাত হানা সম্ভব হয় নি। তাছাড়া অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সংবাদ ক'লকাতায় বেতার যোগে পৌঁছবার সংগে সংগেই সারা প্রদেশময় যে ব্যাপক ধর পাকড় সুরু হয়, তাতে তাঁদের প্রস্তুতির প্রচেষ্টার উপরও কঠিন আঘাত পড়ে।

চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরে গভর্ণমেণ্ট বাংলার বিপ্লবী দলগুলোকে ভেংগে দেবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সংগে যাদের কোন সম্পর্ক থাকা মোটেই সম্ভব ছিল না, অথবা এই বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাকে যাঁরা সমর্থন করতেন না,— সরকার এই সব বিপ্লবীদেরও রেহাই দিল না। এই অবস্থায় আমাদের দলের কয়েক জন কর্মী আত্মগোপন করে দলের ও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করলেন।

অস্ত্রাগারলুণ্ঠনের পরের বছর ক'টি আগুন রাঙা। মাঝে মাঝে দেখা যায় বিদ্যুৎ ঝলক। কিন্তু ইহা আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাষ মাত্র। দেশের এ কোণে সে কোণে অগ্নি-নালিকা গর্জে ওঠে। কোথাও কোন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, কোথাও জজসাহেব, জেলের কর্তা, কোথাও পুলিশ কর্মচারী আঘাতের

লক্ষ্যস্থল হ'য়েছে। ডালহৌসী স্কোয়ারে কলকাতার দোর্দণ্ড প্রতাপ পুলিশ কমিশনার টেগার্টের উপর যে প্রচণ্ড বোমা নিক্ষিপ্ত হয় তা সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুর্ভাগ্যক্রমে টেগার্ট সাহেব বেঁচে যায়,— একজন বিপ্লবী কর্মী ঘটনা স্থলে নিহত হন এবং তরুণ বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার আহত অবস্থায় ধৃত হন! ঢাকাতে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হডসন্ ও বাংলার গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা লোম্যানের উপর যে আক্রমণ হয় তাতে লোম্যাম নিহত ও হডসন্ গুরুতর ভাবে আহত হয়। কলিকাতায় সুরক্ষিত রাইটার্স বিল্ডিংএ বিনয়, বাদল ও দীনেশ কারা বিভাগের প্রধানতম কর্তা সিমসন্‌কে তাঁর সুরক্ষিত অফিস গৃহে হত্যা করে। কিছুদিন পূর্বে প্রেসিডেন্সী জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর পুলিশ কমিশনার টেগার্ট ও হোম মেম্বার হাচিন্স প্রভৃতির পরিচালনায় যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তার প্রতিশোধের প্রেরণাই ছিল এই আক্রমণের মূলে। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের (পেডী, ডগলাস, বার্জ) উপর পর পর আক্রমণ করা হয়। এই তিন জনই বিপ্লবীর গুলীতে নিহত হয়।

বিপ্লবীরা বাংলার পশ্চিম প্রান্তে তাদের ক্ষমতার পরিচয় দেয়। চট্টগ্রাম থেকে মেদিনীপুর—বিপ্লবী বাংলার প্রাণ চাঞ্চল্য সত্যিই লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। মেদিনীপুরের রাজনৈতিক চেতনাকে চরম নিপীড়নে স্তব্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যে পেডী প্রমুখ

অত্যাচারী শাসকেরা যেমন তৎপর হয়েছিল, বাংলার বিপ্লবীর অগ্নিনালিকাও তেমনি বজ্র নির্ঘোষে গর্জে উঠেছে। কুমিল্লার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টীভেনস্ বিপ্লবী নারী শান্তি ও সুনীতির রিভালভারের গুলীতে নিহত হয়। বাংলার তদানীন্তন গভর্ণরের উদ্দেশ্যে বাংলার বীর কন্যা বীণ দাসের অগ্নিনালিকার ক্রুদ্ধ গর্জন বাংলার সেনেট হলে প্রতিধ্বনিত হয়। আলিপুরের দায়রা জজ গার্লিক বিপ্লবীর গুলীতে নিহত হয়। অত্যাচারী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট 'ডুর্নো' গুলীতে আহত হয়। তদানীন্তন শ্বেতাংগ সমাজের মুখ-পাত্র ভারত বিদ্বেষী "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার সম্পাদক ওয়াটসনও বিপ্লবীদের আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায় নি।

এই সব আক্রমণ বিচ্ছিন্ন ভাবে অনুষ্ঠিত হলেও সমগ্রভাবে এর প্রতিক্রিয়া শ্বেতাংগ সমাজের উপর সামান্য ছিল না। মেদিনী-পুরে পরবর্তী কালে এই কারণেই শ্বেতাংগ ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ সম্ভব হয় নি।

দেশ জুড়ে সুরু হয়েছে খানা তল্লাসীর চালুনী চালা। যে খানেই একটু প্রাণের স্পন্দন দেখা গেছে সেখানেই তার টুঁটি চেপে ধরা হচ্ছে। প্রেসিডেন্সী জেল ক্রমে ভরে গেল। স্থান সংকুলা-নের সমস্যা দেখা দিল। নৈশ lock up শিথিল করে সেলের বাইরে ক্যাম্প খাট দিয়ে শোয়াবার ব্যবস্থা হোল। তাতেও কুলোয় না।

নতুন বন্দী শিবির না খুলে আর উপায় রইল না সরকারের। ১৯৩৩ সালের শেষের দিকে ভুটান সীমান্তবর্তী জয়ন্তী পাহাড়ের পুরাণ বক্সা দুর্গ বন্দী শিবিরে পরিণত করা হল। শুধু স্থান সংকুলানের জন্যই এই দুর্গম স্থানের ব্যবহারের কথা সরকার ভেবেছে, তা নয়। বাংলা দেশের সংগে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে, এই সব বন্দীদের দূরে রাখার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা করা হোল।— বক্সা-দুয়ার ষ্টেশন থেকে বক্সা দুর্গের দূরত্ব সুদীর্ঘ। গভীর জংগলের মধ্য দিয়ে চড়াই উৎরাই পার্বত্য পথ। গভীর অরণ্য, হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর লীলাভূমি। শুধু পথের দুর্গমতা ও শ্বাপদ কুলের উপর নির্ভর করে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত ছিল না। অবাঞ্ছিত লোকের যাতায়াত রোধ করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি সামরিক ঘাঁটিও পথের মাঝে স্থাপিত হোল। অরণ্যের গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা থমথমে ভয়াবহতা বিরাজ করে। মাঝে মাঝে দু একটি পাহাড়ী— ভুটিয়াকে পাহাড়ী পথে উঠা-নামা করতে দেখা যায়। ক্যাম্পে বসে মনে হল আমরা যেন একটা আলাদা জগতে বাস করছি—মানুষের জগতের সংগে তার কোন সম্পর্ক নেই।

বাংলার বিভিন্ন জেলেও বিনা বিচারে আটক বন্দীদের ভীড় জমে গেছে। কলকাতা ও বাংলার বিভিন্ন জেল থেকে দেড় শো'র মত রাজবন্দী এনে এই অরণ্য শিবির ভর্তি করা হোল। অনুশীলন দলের কল্পনায় সব সময়েই গোটা ভারতব্যাপী বিপ্লবী অভ্যুত্থানের

স্থল ছিল। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র, সীমাবদ্ধ শক্তিকে নিয়োজিত ক'রে আঘাতকে অসীম করার কথা কোন দিনই আমরা ভাবি নি। কিন্তু এখন তা ভাবতে হোল। কারণ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, আমাদের ব্যাপক প্রস্তুতি অন্যের চকিত আঘাতের ফলেই বানচাল হয়েছে। কোন দল এখানে-সেখানে দুচারটি ডাকাতি ও খুন করলেই গোটা বাংলার বিপ্লবী সমাজকে তার ফল ভোগ করতে হয়েছে। ১৯১৪ সালেও তাই হয়েছে। ১৯৩০ সালেও তাই হোল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকে কেন্দ্র করে গভর্ণমেণ্ট সব দলের নেতা ও কর্মীকে জেলে নিয়ে এলো। এক কথায় একটি দলের কাজের ফলে গোটা ভারতের বিপ্লবী সমাজ তাদের পরিকল্পনানুযায়ী কর্মসাধনে বাধা পেল। এই রূপ অবস্থায় আলীপুর জেলে থাকাকালীনই আমাদের নতুন উদ্যমে নতুন পরিকল্পনায় কাজ করার [illegible] হয়েছে।

অনুশীলন দলের সভ্যদের মধ্যে ভাবী দিনের যে কর্মসূচী স্থিরীকৃত হোল, তার সংবাদ বিভিন্ন জেলে আবদ্ধ সহকর্মীদের কাছে ও দলের যে সব সভ্য বাইরে ছিল তাদের কাছে গোপনে পাঠানো হোল। মোটামুটি স্থির হোল, জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে পুরাণো আদর্শের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। আমাদের আপাতলক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা হলেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই আমাদের উদ্দেশ্য। শুধু বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানোই নয়, জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি

সাধনের জন্য ধনতন্ত্রেরও অবসান ঘটিয়ে সাধারণের অর্থনৈতিক সংগ্রামকে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের অংগীভূত করতে হবে। নিজেদের মধ্যে আলোচনায় স্থির হোল, আমরা অত্যাচারী শাসকদের পৈশাচিক জুলুমের জবাব দেব। পুলিশের উপর হানা, স্থানীয় বিদ্রোহ প্রভৃতি দলের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত কোরবো। সাংগঠনিক দিক থেকে আমাদের সর্ব ভারতীয় বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর দৃঢ় করে সারা ভারতব্যাপী বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে হবে।

এই আদর্শ ও নীতিকে কার্যকরী করতে হলে বিভিন্ন বন্দী শিবির, জেলখানা ও অন্তরীণ স্থান থেকে বিশিষ্ট সভ্যদের পালিয়ে যেতে হবে। তদনুযায়ী কয়েকজন বাছাই করা সভ্যের কাছে নির্দেশ পাঠানো হোল।

অনুশীলন দলের একজন বিশিষ্ট কর্মী প্রভাত চক্রবর্তী বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে অন্তরীণ ছিলেন। দলের নির্দেশ মত তিনি পলায়ন করে কলকাতায় এসে দলের সংগঠনের ভার নেন। অন্তরীণের আদেশ পেয়ে শ্রীপরেশ গুহ যথা নির্দিষ্ট স্থানে যাচ্ছিলেন, মাঝ পথে তিনিও সরে পড়ে কলকাতায় দলের কর্মরত সভ্যগণের সংগে যোগদান করে পলাতক জীবন সুরু করলেন। এই সময় দলের পলাতক কর্মীর সংখ্যাও কম ছিল না। এঁরা পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে দলের সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখছিলেন।

ছয়

বক্সা শিবিরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কালে অনুশীলন দলের যে সভ্যরা প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে ছিলো শ্রীরবীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র চ্যাটার্জি, শ্রীত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ), শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, বরিশালের শ্রীযতীন রায় (ফেগা রায়), শ্রীধীরেশ রায়, শ্রীকৃষ্ণপদ চক্রবর্তী, শ্রীজিতেন গুপ্ত, শ্রীযশোদা চক্রবর্তী, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ব্যানার্জি, শ্রীরাধিকা কর, শ্রীনরেন দাস, বর্তমান লেখক এবং দলের বিশিষ্ট সভ্যদের আরও অনেকে। প্রসিডেন্সী জেলে আলোচনা কালে দলের অন্যতম নেতা শ্রীরমেশ আচার্য্য উপস্থিত ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ায় গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ চাপ সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ তাঁকে বক্সায় পাঠাতে পারে নি।

পরিকল্পিত কর্মপন্থাকে কার্যকরী করার জন্য বিশেষ করে আমাদের যে কয়জনের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হলো, তাদের মধ্যে ছিল ধীরেশ রায়, যশোদা চক্রবর্তী, ক্ষিতীশ ব্যানার্জি, রাধিকা কর, জিতেন গুপ্ত, কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী ও বর্তমান লেখক। এই সময় বিপ্লবী শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতার দিক দিয়ে যাঁরা দলের সংগঠনকে পেছন থেকে সাহায্য করে আসছিলেন,

তাঁদের মধ্যে অমূল্য মুখার্জি, মণীন্দ্র লাহিড়ী ও দেবেন ঘোষ অন্যতম।

আমাদের কাজটি কি! কাজ হোল ক'একজন বিশিষ্ট কর্মীকে জেল বা ক্যাম্পের বাইরে পাঠানো,—যাঁরা যোগ্যতার সংগে আমাদের পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করতে পারবেন। অন্তরীণ থেকে পালিয়ে যাওয়া সহজ, কিন্তু বন্দী শিবির বা জেল থেকে পলায়ন দুঃসাধ্য। বিশেষতঃ, বক্সা দুর্গের পারিপার্শ্বিক দুর্গমতা ও প্রাকৃতিক বাধা মানুষের বাধার চেয়েও অনেক দুর্লংঘ্য। শিবিরটিকে উঁচু কাঁটা তারের ডবল বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। স্থানে স্থানে প্রাচীরও রয়েছে। এই যুগ্ম বেষ্টনীর বাইরে সশস্ত্র পাহাড়ার ব্যবস্থা। শিবিরের অভ্যন্তরে উঁচু Watch Tower বা পর্য্যবেক্ষণ গম্বুজ। সেখান থেকে সব দিকের দূরের ও কাছের সব কিছুই দেখা যায়। এই শিবির থেকে বাইরে যাবার তিনটি ফটক ছিল। দুটি সর্বদা বন্ধ থাকতো,—শুধু কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন মতো খোলা হোত। প্রতিদিনের জন্য খোলা থাকতো একটি মাত্র ফটক। যেখানে সশস্ত্র শান্ত্রী দিবারাত্র মোতায়েন থাকতো সতর্ক প্রহরায়। ভুটান পাহাড়ের গায়েই বন্দী-শিবির। পর্বতমালার লহরীর পর লহরী মিশেছে—গিয়ে দুরান্তরে মেঘের গায়ে। এই পথে একমাত্র ভুটানের অভ্যন্তর দেশেই যাওয়া যায়। তারপর তিব্বত ও চীনের দুরধিগম্য পথ। ক্যাম্পের দক্ষিণ দিক বেয়ে কোন রাস্তা নেই। সেদিকে পাহাড় সোজা নীচে কোন অতলে

নেমে গেছে। বহু নীচে পাহাড়ের গহ্বরে ঘন জংগলের রাশি রাশি বৃহদাকার গাছগুলো দেখাচ্ছে তৃণ ও গুল্মের মতো। এক এক দিন কুয়াসায় ঢেকে যায় দক্ষিণ দিগন্ত। মনে হয় কুহেলী ঢাকা এই দক্ষিণ দিগন্তে যেন সাগর ছড়িয়ে রয়েছে।

মোটের উপর দেখা গেল উত্তর ও দক্ষিণ দিক দিয়ে কোন স্থান হতেই পলায়ণের পথ বার করা সম্ভব নয়। পশ্চিমের যে ফটকটি সদাসর্বদা বন্ধ থাকতো এটি তো বার হবার একটি মাত্র পথ এবং এর উপরেই সশস্ত্র শান্ত্রী দিবারাত্র সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত। অথচ, এই একটী মাত্র পথ ছাড়া আর সব দিকেই পাহাড় গভীর খাদে নেমে গেছে। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের সব জায়গা পর্য্যবেক্ষণ করে নিরাশ হয়ে আমরা পূবের দিকটায় মনোনিবেশ করলাম।

পূবদিকে দুর্বল স্থানের সন্ধান পাওয়া গেল। বন্ধুবর ধীরেশ রায় একটি বিশিষ্ট স্থান দেখে এসে আমাদের খবর দিলেন। উঁচু ডবল তারের বেষ্টনী এক জায়গায় নর্দমার কাছে এসে শিথিল হয়েছে। সেখান দিয়ে গলে বেরিয়ে যাওয়া যায়—কিন্তু অদূরেই উত্তর দিকে সশস্ত্র শান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে। তারই সামনে হাবিলদারের অফিস ও রিজার্ভ বাহিনী মুখোমুখী রয়েছে। হাবিলদারের আফিসের সামনে একদিকে ক্যাম্প অফিস একদিকে দোকান, দক্ষিণ দিকে সিপাহীদের ব্যারাক। মনে হয় সব কিছুই যেন

বিভিন্ন স্থান থেকে আমাদের উপর নজর রেখে বসে আছে। উত্তর দিকে প্রধান ফটকের সিপাহী আর দক্ষিণ দিকে সিপাহী ব্যারাকের গা ঘেঁষে পালাবার যে পথের সন্ধান পাওয়া গেছে, তারই অনতিদূরে পনেরো ফুট উঁচু আর একটি বহিঃপ্রাচীর রয়েছে। সেই প্রাচীরের গায়ে একটি দ্বার, দ্বারটি চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ থাকে। এই দ্বার ও সংলগ্ন প্রাচীরের উপর কাঁটা-তার এলোমেলো ভাবে জড়ান আছে। প্রথমকার কাঁটা তারের বেড়া অতি সতর্কতার সহিত পার হয়ে গেলেও পুনরায় এই প্রাচীর ডিঙোতে হবে,—তবেই ক্যাম্পের বাইরের রাস্তায় পৌঁছান যাবে। এদিকে ব্যারাকের গা-ঘেঁষে দু'চারটি কুকুরও রাখা হয়েছে, যারা নৈশ প্রহরীর কাজ করে। শুধু শীতের প্রকোপ একটু বেশী হলেই এদের সাড়া শব্দ একটু কম পাওয়া যায়। দূরে—বাইরের তমসাচ্ছন্ন প্রাকৃতিক বাধার মতো ভিতরের আলোক সমাবেশও কম বাধা নয়। সুপ্রচুর বিজলী আলোকিত বক্সা ক্যাম্প। শীতের রাতে গাঢ় কুয়াসার আলোগুলোকে কলেরা রোগীর চোখের মতো ঘোলাটে দেখা যায়। গাছের ছায়া মায়া জড়িয়েছে, ডবল বেষ্টনীর দুর্ব্বল স্থানটায় সিপাহীর দৃষ্টিপথকে কোরেছে অস্পষ্ট। বহু অনিশ্চয়তার মধ্যেও শেষ পর্য্যন্ত আমরা এই স্থানটিকেই বেছে নিলাম।

এই অনিশ্চিত পথযাত্রায় নিশ্চিত বিপদের মুখে ঝাঁপ দেবার জন্য দুজনের নাম নির্দিষ্ট হোল,—জিতেন গুপ্ত ও কৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তী। জিতেন গুপ্ত দলের পুরাতন সভ্য। অতি নিরিবিলি জীবন যাপনে

অভ্যস্ত বলে ক্যাম্পের অধিকাংশ লোকই তাঁর উপস্থিতি বুঝতে পারতো না। প্রকৃতিতে কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী ছিলেন ঠিক বিপরীত। একেবারে মজলিশী লোক। অভিনয়ে হাসিগল্পে, খেলা ধূলায় কৃষ্ণপদ সর্বাগ্রগণ্য। তাঁকে ছাড়া আমাদের আসর জমে না। তাঁর চলনে ছিল অপূর্ব রসের মিশ্রণ। দেহবর্ণ তাঁর কৃষ্ণ নামের সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করেছে। নিখুঁত মিশকালো দেহশ্রীর কৌলীন্যে কৃষ্ণপদ ক্যাম্পে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর ও আমাদের এই ধারণা চকিতে বদলাতে হয়েছিল সগু আগত মতিবাবুর শুভাগমনে। কৃষ্ণের রং শুধু কৃষ্ণই ছিল। মতিবাবুর গাত্রবর্ণ ঘণকৃষ্ণ। সবাই কৃষ্ণপদকে সান্তনা দিয়ে বলত,—"দুঃখ কোরনা ভাই, জীবন সংগ্রামে হারজিত তো আছেই।" চারিদিক থেকে উঠতো হাসির উল্লাস-ধ্বনি, কৃষ্ণপদর হাসির শব্দ গগন বিদারী।

সাত

বন্দীশিবিরের আবহাওয়াকে একেবারে নিষ্করুণ মরুভূমি মনে করলে ভুল হবে। এখানে মাঝে মাঝে দু'চারটি পান্থ পাদপের সন্ধানও মিলিবে। ভূপতিদাকে (শ্রীভূপতি মজুমদার) এই প্রসঙ্গে স্মরণ কোরতে হয়। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসব্যঞ্জনা ও সাহিত্যিক ক্ষমতায় ক্যাম্পে একটি রসচক্র স্থাপন করেছিলেন। ক্যাম্পজীবনের একঘেয়ে পরিবেশে ভূপতিদা কত বিচিত্রভাবে সজীবতা সৃষ্টি কোরতেন। ক্যাম্পের অভ্যন্তরে মাঝে মাঝে অভিনয়েব ব্যবস্থা হোত। বন্দীদের মধ্যে গুণী ব্যক্তির অভাব ছিল না। চমৎকার অভিনয় করত কেউ কেউ। কৃষ্ণপদর ভৃত্যের অভিনয় ছিল অনবদ্য। শিল্প ও সাহিত্যের মাধ্যমে সুরপতি চক্রবর্তীর আনন্দ পরিবেশন উপভোগ্য ছিল। এই প্রসংগে অমলেন্দু দাশগুপ্ত ও সন্তোষ গাঙ্গুলীর নামও স্মরণ যোগ্য। সন্তোষ গাঙ্গুলী দেউলী বন্দী শিবিরে আত্মহত্যা করেন।

শীতের একরাতে এক মনোজ্ঞ জলসার আয়োজন হচ্ছে। আমরা সেই রাত্রিকে পলায়ণের প্রকৃষ্ট সময় বলে সাব্যস্ত কোরলাম। কেন না প্রধান ফটকের সামনে উত্তর দিকে রাজবন্দীদের জন্য নির্দিষ্ট ব্যারাকে আমোদ প্রমোদ বা কোন হাসির অভিনয়

চলতে থাকলে সিপাহীরাও সেদিকে আকৃষ্ট হবে,—তাদের সতর্কতা হবে শিথিল। সেই সময় দক্ষিণ দিকের দুর্বল স্থানের সুযোগ নিয়ে বন্ধুরা পলায়নের চেষ্টাকে সফল করতে পারবে।

অভিনয়ের দিন ও সময় ঠিক হয়ে গেছে। কয়দিন আগে থেকেই কৃষ্ণপদ অসুস্থতার ভান করে দূরে সরে আছে। জিতেন গুপ্ত সম্বন্ধে কারো কোন ঔৎসুক্য থাকার কথা নয়। কৃষ্ণপদ অসুস্থ একথা সবাই জানে। নির্দিষ্ট দিনে একদিকে অভিনয়ের আনন্দ-আয়োজন চলছে—অন্যদিকে সন্ধ্যা থেকে চলছে আমাদের প্রস্তুতি। বক্সার শীত প্রচণ্ড, ক্যাম্পের ভিতর ঘরের মধ্যেও হাড়ে কাঁপুনি ধরে,—ওদের কাটাতে হবে সারারাত বাইরে। প্রয়োজন-মতো শীতবস্ত্র সাথে করে নিয়ে কাঁটা তারের বেড়া ডিঙানো সম্ভব নয়। অতি হাল্কা পোষাক পরিচ্ছদে দেহকে আটসাঁট আবৃত করে বেড়া ডিঙাতে হবে। একটুখানি শব্দ হইলেই গুর্খা শান্ত্রীর গুলীর হাত থেকে রেহাই নেই। মাথায় পাতলা গরমটুপী, হাতে দস্তানা, গায়ে পাতলা গরমজামা, পরণে জাংগিয়ার উপর ধুতি, পায়ে রবারের জুতা মাত্র সম্বল করে বন্ধুদ্বয় তৈয়ারী হয়ে আমাদের কামরায় এলেন। নির্দিষ্ট স্থান থেকে ধীরেশ রায় ও যশোদা চক্রবর্তী ইংগিত করা মাত্র বন্ধুরা রওনা হয়ে গেল সবার অলক্ষ্যে। তিনচার মিনিট পরে ধীরেশ রায় এসে উভয়ের নিরাপদে প্রাচীর পার হবার সংবাদ জানালো। আমরা যারা পলায়নের ব্যবস্থায় রত ছিলাম—মুখে নীরব হাসি হেসে আপন আপন স্থানে চলে

গেলাম। আমাদের আচরণে কোন চাঞ্চল্যের আভাস মাত্র ছিল না,—কিন্তু বুকের ভিতর ছিল ঝড়ের দোলা। দুঃসাহসী অভিযাত্রী বন্ধুদ্বয়ের যাত্রাপথ নিষ্কণ্টক হোক এই কামনাই বুকের প্রতিটি স্পন্দনে নীরবে উৎসারিত হচ্ছে। রাত্রের প্রহর গুণছি ভোরের জন্য ক্লান্ত প্রতীক্ষায়। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জলসার স্থান থেকে হাল্কা হাসির হুল্লোড় ভেসে আসছিল। বন্ধুদের কেউই এখন পর্য্যন্ত বুঝতে পারেনি তাদের দুজন সহযাত্রী আজ বেড়িয়েছে বিপ্লবের রক্তরাঙা পথে।

ভোরের আলো পূবের আকাশকে রাঙিয়ে দিয়েছে। কত অজানা আশঙ্কায় বুকের ভিতরটি মথিত হচ্ছে। তাড়াতাড়ি উঠে ছুটে গেলাম পলায়নের সেই বিশিষ্ট স্থানটি পর্য্যবেক্ষণ করতে। বন্ধুরা নিদর্শন রেখে গেছে একজোড়া দস্তানা কাঁটা তারের বেড়ার মধ্যে। শার্লক হোমস এর মত গোয়েন্দার পাল্লায় পড়লে এই দস্তানার সূত্র ধরে পলাতকদের আবিষ্কার হয়তো সহজ হোত।

বন্ধুদের সংগে আবার আমার যখন সাক্ষাৎ হয়, তাঁদের কাছে এই দিনের ঘটনার যে বিবরণ পেয়েছি, এখানে পাঠকদের কৌতু-হল নিবারণের জন্য তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করছি। পলায়নের রাতে প্রচণ্ড শীত ও গভীর অন্ধকারে প্রাচীর ডিঙিয়ে বন্ধুদ্বয় যে পথ পেয়েছিলেন, সেটি নীচের দিকে নেমে আর একটি পাহাড়ের গা-বেয়ে উপরে উঠেছে। পাহাড়ে উঠে তাঁরা দিশেহারা হয়ে একটি

গাছের উপর চড়ে রাত কাটাবার ব্যবস্থা কোরলেন। গাছের ডালে বসে নীচে হিংস্র বন্য জন্তুর গতি বিধি লক্ষ্য করছিলেন। এদিকে পাহাড়ের দুর্দান্ত শীতে তাঁদের সর্বাংগ শিথিল হয়ে নীচে পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। অগত্যা পরণের কাপড়ের একাংশ দিয়ে তাঁরা গাছের ডালের সংগে নিজেদের দেহকে বেঁধে কোনমতে প্রভাতের অপেক্ষায় প্রহর গুণছিলেন। প্রভাতের সূচনায় তাঁরা গাছ থেকে নেমে ক্যাম্পের বাইরের উত্তর পাশের বক্সা দুয়ার ষ্টেশনের দিকে রওনা হন। পথের মাঝে অবস্থিত সামরিক ঘাঁটিও তাঁরা শান্ত্রীদের অলক্ষ্যে পেরিয়ে যান। ক্রমাগত হেঁটে পৌঁছে যথা সময়ে তাঁরা গাড়ী ধরতে সক্ষম হ'লেন।

পলায়নের পরদিন সকাল ৯টা ১০টার সময় অনেক ক্যাম্প বন্ধু কৃষ্ণপদর খোঁজ নিতে এসে তাকে পেলো না। মাদারীপুরের সন্তোষ দত্ত মহাশয় এলেন জিতেন গুপ্তের খোঁজ নিতে, না পেয়ে ফিরে গেলেন। এই অবস্থায় কে কি আন্দাজ কোরলেন বলা মুস্কিল। কোন অসংগত কৌতুহল প্রকাশ করা বা আন্দাজ কোরে এ নিয়ে গাল গল্প করা বিপ্লবী চরিত্রের বিরোধী। দল নির্বিশেষে যে কোন বিপ্লবী বন্ধুর চরিত্রেই এই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মিলে। তাই কৃষ্ণপদ বা জিতেন গুপ্তকে ক্যাম্পের মধ্যে খুঁজে না পেয়েও কেউ কোন প্রকার কাণাঘুষো পর্য্যন্ত সেদিন করেন নি। এমন কি মনের সংশয়টুকু নিবারণের জন্যও সংশ্লিষ্ট দলকে জিজ্ঞেস করেন নি।

পলায়নের দ্বিতীয় দিন বিকাল বেলা, কম্যুনিষ্ট দলের সদস্য আব্দুর রেজ্জাক এসে একান্তে আমায় বল্লেন,—ক্যাম্পের নাপিতের সংগে কৃষ্ণপদ ও জিতেন গুপ্তের দেখা হয়েছে—ষ্টেশনের পথে। সে তো মহাখুসী। রেজ্জাক সাহেবই ক্যাম্পের নাপিতকে বারণ করে দিয়েছেন একথা ঘুণাক্ষরে আর কারো কাছে প্রকাশ করতে। এমনি করেই নিরপেক্ষভাবে বিপ্লবী কর্মীরা একে অন্যকে সহায়তা দান করেছে। এই সহায়তার পরিমাণ হয়তো সামান্য,—কিন্তু অমূল্য।

বন্ধুদ্বয়ের পলায়নের পর তিনদিন কেটে গেল। শিবির কর্তৃপক্ষ কিছুই টের পায় নি। কিন্তু ক্যাম্পের বন্ধুরা সবাই বুঝতে পেরেছে। নিঃশব্দ সশংক চিত্তে এর প্রতিক্রিয়ার প্রতীক্ষা কোরছে সবাই। তখন ক্যাম্পের কমাণ্ডাণ্ট ছিল—কোটাম। বিপ্লবী আন্দোলন দমন কল্পে ঢাকার নাগরিকদের উপর বেপরোয়া অত্যাচার চালিয়ে ইতিপূর্বে সে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। আমার অগ্রজ ৺বিমলানন্দ কনিষ্ঠ ভ্রাতা অজিতানন্দের গ্রেপ্তারকালে খানাতল্লাসীর পরোয়ানা দেখতে চাওয়ার ঔদ্ধত্যের অপরাধে এই স্বনামধন্য কোটামের হাতেই প্রহৃত হন। আমাদের বৃদ্ধা মাতাও লাঞ্ছনা থেকে রেহাই পান নি। কংগ্রেস নেতা ও অনুশীলন সমিতির ভূতপূর্ব সদস্য ঢাকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবীন বয়সেও এই কোটামের যথেচ্ছ লাঞ্ছনার হাত হ'তে অব্যাহতি পান নি। এহেন কোটাম-

কেই বক্সা ক্যাম্পে পাঠান হয় সন্ত্রাসবাদীদের শায়েস্তা করবার জন্য। আর তারই আমলে দুইজন বন্দী পাহাড় জংগলে পরিবেষ্টিত এমনি সুরক্ষিত ক্যাম্প থেকে পালিয়ে গেল।

চারদিন পরে। বেলা ১০টায় ক্যাম্প কমাণ্ডান্ট কোটাস সাহেব সদল বলে ক্যাম্পের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জিতেন ও কৃষ্ণপদর থাকবার ব্যারাকে এবং রান্নাঘরে এসে ম্যানেজার ক্ষিতীশ ব্যানার্জীকে এই দুইজনের অবস্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করল। উত্তরে ক্ষিতীশ বাবু বললেন,—"কাল রাত্রে তাদের দেখেছি, এখন কোথায় জানিনা।" ক্ষিতীশ বাবুর জবাব শুনে কোটাস সদল বলে পলাতকদের ব্যারাকে ঢুকে নাম মাত্র তল্লাসী করে ক্ষিতীশ বাবুকে জানাল, কিছুক্ষণ আগে এই মর্মে কলকাতা থেকে তার এসেছে যে, বন্দী কৃষ্ণপদ ও জিতেন গুপ্ত ক্যাম্প থেকে পালিয়ে কলকাতায় ফেরারী বিপ্লবীদের আড্ডায় আশ্রয় নিয়েছে এবং তিন চার দিন আগেই তারা ক্যাম্প থেকে অন্তর্ধান করেছে। এই কথা বলে কমাণ্ডান্ট পলায়নের সূত্রের সন্ধানে প্রাচীর ও তারের বেড়ার চারিদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল, কিন্তু যে দস্তানা জোড়া কাঁটাতারে আটকে হাওয়ায় উড়ছিল তা তার নজরে পড়ল না। অফিসে ফিরে গিয়েই সে প্রধান ফটকের শান্ত্রীদের তলব করে পাঠালো। তাদের কেউই সন্তোষজনক কিছু বলতে পারলো না। জনৈক অল্পবয়স্ক গুর্খা সিপাহীকে দায়ী করাতে সে জবাব দিয়েছিল —"যব পাকড়া যায়েগা তব মালুম হোগা। বাবু লোক জরুর সচ

বোলেগা, হামারা সামনেসে ভাগ গিয়া হোগা তো উস্ ওয়াকত বহ লোগ সাচ বোলেগা।' এমন জবাবের পর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংকল্প শেষ পর্য্যন্ত কর্তৃপক্ষ ত্যাগ করেন বলে শোনা যায়।

কুখ্যাত কোটাম সাহেব এমন চরম আঘাত নীরবে সহ্য করবে না এটা এক প্রকার স্থির নিশ্চিত। দু'তিনদিন এমনি কেটে গেল। হয়তো সে মনে মনে ফন্দি আটছিলো কি করে বন্দীদের শায়েস্তা করা যায়। দিন তিনেক বাদেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রকাশ পেতে লাগলো। প্রথমেই খাবারের বরাদ্দ টাকা অর্দ্ধেক করা হলো। ক্যাম্পের অভ্যন্তরের কোন অভিযোগই শুনতে সে প্রস্তুত নয়। ক্যাম্পের ভিতরে সামরিক কায়দায় নিয়ম শৃংখলা বজায় রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো। নানা বিশৃংখলা দেখা দিল। কোন অভিযোগের জবাব পর্যন্ত পেতাম না। উপকমাণ্ডাণ্ট লিউ-লিন, আই, সি, এস। সবেমাত্র বিলাত থেকে এসে এখন কমাণ্ডাণ্ট কোটামের অধীনে শিক্ষানবিশী করছিলো। তার কোন ক্ষমতাই ছিল না। দিনের পর দিন ক্যাম্পে অভিযোগ জমেই উঠতে লাগল, অথচ প্রতিকারের কোন ব্যবস্থাই হোল না। ক্যাম্পের ভিতরে না এসে কোটাম সাহেব তার অফিস থেকেই শুধু হুকুম চালাচ্ছিলো। পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিয়েও বন্দীরা কোন কথার জবাব পাচ্ছিলেন না। লিউলিন পর্যন্ত কোটামের এই ব্যবস্থায় খুশী ছিল না। তার সংগে দেখা করে আমরা কোটাম সাহেবের সহিত সাক্ষাৎকারের দাবী জানালাম। সে উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন জানতে চাইলো।

জবাবে বললাম, বন্দীদের রাশিকৃত অভিযোগের সুমীমাংসায় সদিচ্ছা নিয়েই আমরা তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই, বিশেষ করে তার নিজের যখন কিছুই করার ক্ষমতা নেই। কোটাম সাহেব সাক্ষাৎ না করায় লিউলিনের কাছে তার উদ্দেশ্যে ভীরু, কাপুরুষ ইংরাজ, শাসনের একান্ত অযোগ্য অফিসর ইত্যাদি গালিবাক্য প্রয়োগ করতে কসুর করলাম না। আমাদের আভ্যন্তরীণ আলাপ আলোচনায় স্থির হয়েছিল যে, ক্যাম্পের এই অত্যাচার অবিচার এখন ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে এবং স্বাভাবিকভাবে অভিযোগ পেশ করে তার প্রতিকার আর সম্ভব হবে না। শিবিরের ভিতরের খবর বাইরে পৌঁছায় না। বাইর থেকে সেখানে কারুর আসাও সম্ভব নয়। একমাত্র ক্যাম্পের অভ্যন্তরে কমাণ্ডান্টকে কেন্দ্র করে কোন বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হলেই হয়ত বিচারালয়ের মারফৎ তা বাইরের জগতে পৌঁছাতে পারে। আলাপ আলোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, কোটাম সাহেবকে আঘাত করতে পারলেই ঐরূপ সম্ভাবনা দেখা দেবে। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা কোটাম সাহেবের দর্শনপ্রার্থী হলাম। সে সাক্ষাৎ করতে রাজী হল। সাক্ষাতের জায়গা অফিস ঘর। প্রধান ফটক থেকে বার হয়ে সোজা উত্তর দিকে সামান্য দূরেই অফিস। একজন সিপাহী দর্শনার্থীদের নাম অনুযায়ী একজন করে কমাণ্ডান্টের অফিস গৃহে যেতে দিল এইভাবে আমাদের চার পাঁচজন ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে এল। এবার আমার পালা। পরণে ধুতি, সার্ট, পায়ে চটী জুতা। এভাবেই অফিস ঘরে প্রবেশ করলাম। ঢুকতেই কমাণ্ডান্ট অভি-

বাদন করল। আমিও প্রত্যাভিবাদন করে চেয়ারে বসে পড়লাম। আমার দুপাশেই দুজন প্রহরী দাঁড়িয়ে। মুখোমুখী একটি বড় টেবিলের অপর পার্শ্বে কোটাম হেলান দেওয়া একটি চেয়ারে বসে আছে। শুভেচ্ছা জানিয়েই সে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। ফলে তার মুখখানি প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। আমার ডান পাশের কোণে লিটলিনের টেবিল। সে একমনে হিসাব পত্র পরীক্ষা করছে বলে মনে হল। দু'চারটা কড়া কথা বলে উত্তেজিত করাতেই কোটাম সাহেব চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। সেই সুযোগে আমি চট্ করে পায়ের চটী তার গালে ছুঁড়ে মারলাম। সঙ্গে সঙ্গেই আমার গালে, মাথায়, পিঠে বেদম প্রহার পড়তে লাগলো। রক্তাক্ত হোয়ে মুহূর্ত-মধ্যেই আমি চেয়ারের উপর লুটিয়ে পড়লাম, আমার মাথা বুকে পড়ল টেবিলের উপর। কে আর কিরূপ আঘাত লাগল সঠিক বুঝতে পারলাম না, তবে আমার বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে পাগলাঘন্টি বেজে উঠতেই সিপাহী-শান্ত্রীরা প্রস্তুত হয়ে ছুটে আসছে শুনতে পেলাম। জুতা খেয়েও কোটাম ইংরাজ সুলভ চরিত্রগুণে কর্তব্যবোধ হারায় নি। ক্যাম্প ডাক্তারকে ঔষধ-পত্র সহ অবিলম্বে চলে আসতে নির্দেশ পাঠালো। ডাক্তার শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী (বর্তমানে কলকাতা মেডিকেল কলেজের ফিজিওলজি বিভাগের অধ্যক্ষ) নির্দেশ পাওয়া মাত্র ঔষধ-পত্র ও যন্ত্রাদি সহ এসে অফিস ঘরে প্রবেশ করেই সযত্নে সেলাই ব্যাণ্ডেজাদি করে আমাকে ষ্ট্রেচারে উঠালেন। আমাদের কারাজীবনে যে সব সরকারী ডাক্তার ও জেল কর্মচারিদের কাছ থেকে সহা-

য়তা ও সহৃদয়তা পেয়েছি এই মাখন বাবু তাঁদের সাথে আমাদের স্মৃতিতে অবিস্মরনীয় হয়ে আছেন। ডাক্তার সহ কোটাম্ ও তার সহকর্মী ষ্ট্রেচারে করে আমাকে ব্যারাকে পৌঁছে দেবার জন্য ক্যাম্প গেট পর্য্যন্ত এলো। গেটেই বন্ধুরা সব ভিড় করে প্রতীক্ষায় ছিল, তাদের কাছে আমাকে পৌঁছে দিয়েই ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ চলে গেল।

পরবর্তী কালে দণ্ডিত অবস্থায় সুদীর্ঘ কারাজীবনে ভারতীয় ও ইংরাজ কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের তুলনা করে দেখেছি যে, শত্রুর প্রতিও ইংরাজদের কর্তব্যবোধ ও মানবীয় ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। সভ্যতার সাধারণ রীতিনীতি তারা মেনে চলে। সেই সময় ভারতীয় অফিসারদের বেলায় এ পরিচয় খুব কমই পাওয়া গেছে। কোটাম সাহেব আহত বন্দীর চিকিৎসার আশু ব্যবস্থারও ত্রুটি করেনি। সহকর্মী সহ আমাকে গেট পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে কসুর করেনি।

ব্যাণ্ডেজ বাধা অবস্থায় নিজেদের ব্যারাকে শুয়ে পড়ে রইলাম। তার পরদিন বন্ধুবর ধীরেন মুখার্জী আবার কোটাম সাহেবের সাক্ষাৎ প্রার্থী হলেন। পূর্বদিনের মত কোটাম তাঁকেও ডেকে পাঠালো। পৌঁছামাত্রই ধীরেনবাবু বাহাতে তাঁর জুতো কোটাম সাহেবের প্রতি ছুঁড়ে মারলেন। বন্দীর ডান হাতের প্রতি লক্ষ্য রাখার সম্বন্ধে হয়তো সিপাহীদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাঁহাতও সমান ক্ষিপ্রতা ও নিপুণতার সংগে চালাতে

পারে এমন কেউ এসে উপস্থিত হবেন এ ধারণা সিপাইরা করতে পারেনি বলে ধীরেন বাবু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হন নি। তাঁহাকে নিক্ষিপ্ত জুতা কোটাম সাহেবের গালেই সজোরে আঘাত করল। বলা বাহুল্য ধীরেন বাবুও সিপাইদের বেপয়োরা আঘাতের হাত থেকে অব্যাহতি পান নি। তবে তাঁর গা কেটে রক্ত বেরোয় নি এই যা তফাৎ। আহত ধীরেন বাবু ক্লান্ত দেহে বন্দী ব্যারাকে ফিরে এলেন।

শিবিরাধ্যক্ষের উপর পর পর দুইদিন আক্রমণ হলো। প্রতিটি আক্রমণের রিপোর্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে তার যোগে প্রেরিত হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া বাংলার অন্যান্য বন্দী-শিবিরগুলোতেও দেখা গেছে। বক্সার শিবিরাধ্যক্ষ ত বটেই অন্যান্য শিবিরের অধ্যক্ষরা ও অধিকতর সুরক্ষিত অবস্থায় শিবিরের মধ্যে আগমন নির্গমন কোরতে আরম্ভ করলো। বক্সা শিবিরে পীড়নের মাত্রা গেল চড়ে, এবং প্রতিশোধোন্মত্ত হয়ে রাজবন্দীদের উপর গুলী চালনা করা যায় কিনা কর্তৃপক্ষ তারই সুযোগ খুঁজছিল।

আট

সেবার মারের ধাক্কা সামলাতে সপ্তাহ তিনেক লেগেছিল। এ সময় আমাকে ও ধীরেন বাবুকে—শিবিরাধ্যক্ষকে প্রহারের অভিযোগে অভিযুক্ত করে আলিপুর দুয়ারে বিচারের জন্য পাঠানো হলো। বিচার কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে হোল না—সরকার জলপাইগুড়ি জেলের মধ্যেই বিচার ব্যবস্থা করলেন। এই সময় ১৮১৮ সালের ৩ আইনের বন্দী দেশপ্রিয় যতীন্দ্র-মোহন সেনগুপ্তকেও দার্জ্জিলিং থেকে জলপাইগুড়ি জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আমাদের মামলা পরিচালনা করবার জন্য তিনি কলকাতার বিশিষ্ট ব্যারিষ্টার নিশীথ সেন ও জে, সি, গুপ্তকে অনুরোধ করে পাঠালেন। এই সময় জলপাইগুড়ি জেলে কংগ্রেস নেতা খগেন দাশ গুপ্ত, প্রফুল্ল ত্রিপাঠী, শশধর কর, ও বীরেন সরকার, বর্দ্ধমানের কালাচাঁদ ব্যানার্জ্জি এরা কয়জন রাজবন্দী হয়ে আটক ছিলেন।

প্রথম শুনানীর তারিখেই ব্যারিষ্টারদ্বয় উপস্থিত হয়ে মামলা পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন। মামলা চলতে লাগল। অনেক চমকপ্রদ বিষয়ের অবতারণা হোল। কোটাম সাহেবের দুর্ব্যবহারের ফিরিস্তি যা এতকাল সাধারণ্যে অপ্রকাশিত ছিল, এবার মামলার মারফৎ তা প্রকাশের পথ পেলো। ক্যাম্প-কিচেনের ম্যানেজার হিসাবে তাঁহার সহিত আমার আচরণ, পলাতক বন্দী কৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তী ও জিতেন

গুপ্তের বক্সা শিবির থেকে পলায়নের কি প্রতিক্রিয়া তার মনে হয়েছিল—কৌশলী ব্যারিষ্টারদ্বয়ের জেরার মুখেই বেরিয়ে পড়ল।

ঢাকা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালীন বিপ্লবী-আন্দোলন দমনের নামে কোটাম নাগরিকদের উপর কিরূপ অত্যাচার করতো—আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিনা কারণে প্রহার ও কারাগারে নিক্ষেপ, বৃদ্ধা মাতার উপর নির্যাতন প্রভৃতি তার ম্যাজিষ্ট্রেট জীবনের কুকীর্ত্তির দীর্ঘ ফিরিস্তি কোর্টে উত্থাপিত হোল।

জলপাইগুড়ি জেল থেকেও পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা আমরা করেছিলাম। অনুশীলনদলের জলপাইগুড়ি জেলা সংগঠনের সঙ্গে আমাদের গোপন যোগাযোগ স্থাপিত হোল এবং সাঙ্কেতিক চিঠিতে কলকাতার ফেরারী বিপ্লবী বন্ধুদের কাছেও আমাদের পরিকল্পনার সংবাদ দেওয়া হোল। সেনগুপ্ত মহাশয় আমাদের অভিপ্রায় অনুমান করে নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই সাহায্য করতে চাইলেন। সবদিক চিন্তা করে, বিশেষ করে এতবড় একজন সম্মানিত নেতার সুনাম ও পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বিষয় ভেবে, আমরা তাঁর আন্তরিক সাহায্য গ্রহণ করলাম না। বৈপ্লবিক কাজ খুব নিখুঁত গোপনীয়তা রক্ষা করে চলেও গোয়েন্দা বিভাগের হাত থেকে রক্ষা পায় না। বহু সংখ্যক গুপ্তচরের সাহায্যে গোপন খবর পাওয়ার ব্যবস্থা তাদের আছে। বিশেষ করে যাঁরা শেষের দিকে বিপ্লবীদলের কঠোর শিক্ষানবিশীর

সুযোগ পান নি, তাঁরা অনেক সময় অভিজ্ঞতার অভাব বশতঃই কথা গোপন করতে পারতেন না। ইতিমধ্যে এক দিন দুপুরবেলা একজন জেল-কর্মচারীর মারফৎ কলকাতার চিঠি ও প্রার্থিত করাত এলো। সাঙ্কেতিক চিঠির সাঙ্কেতিক জবাব জলপাইগুড়ির স্থানীয় সংগঠন মারফৎ পেলাম।

আমি ও ধীরেনবাবু করাতটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম। বেশভাল লোহা-কাটা করাতটি, হাতল আছে, আমাদের ঘরের লোহার শিক কাটতে সুবিধা হবে। এবার সুরু হো'ল জেলের দুর্বল-স্থানের সন্ধান ও পলায়নের অন্যান্য পরীক্ষা কার্য। জেলার জেলগুলোতে প্রাচীর-প্রহরীর ব্যবস্থা থাকলেও সরকারী ব্যবস্থা একেবারে ত্রুটিমুক্ত নয়। জলপাইগুড়ি জেলের ভিতরে এক কোণ ঘেঁষে বহিঃপ্রাচীর থেকে বেশী দূর নয় এমন স্থানে রয়েছে সাতটি নির্জন ঘর সারি বেধে। তারই পেছনের স্থানটি আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে উপযোগী হবে বলে স্থির হোল। খুব শীগগীরই কৃষ্ণপক্ষের এক অন্ধকার রাতে প্রাচীর ডিঙিয়ে পালাবো। বাইরের বন্ধুদের কাছে সংবাদ পাঠান হোল তারা যেন নির্দিষ্ট দিনে যথাযোগ্য সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকে। আমরা আস্তে আস্তে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। আমাদের সংকল্প ও উদ্দেশ্যের সাফল্য কামনা করে দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর শুভেচ্ছা ও মনের আনন্দ জ্ঞাপন করলেন।

আমরা সবদিক দিয়েই প্রস্তুত হচ্ছিলাম, ইতিমধ্যে অকস্মাৎ একদিন দুপুর বেলা শুভার্থী জনৈক জেল-কর্মচারী

এসে আমাদের সতর্ক করে দিয়ে গেলেন যে, কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশের নির্দেশ ক্রমে কারাধ্যক্ষ এক্ষুণি আমাদের দুজনের জিনিষপত্র তল্লাসী করতে আসছেন। গোয়েন্দা-পুলিশের খবর হোল কলকাতা থেকে একটা লোহা-কাটা করাত পাঠান হয়েছে এবং তা আমাদের কাছেই রয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জেল কর্তৃপক্ষ সিপাহী শান্ত্রীসহ সদলবলে এসে আমাদের কক্ষে প্রবেশ করেই জোর খানাতল্লাসী সুরু করে দিলো। কিন্তু তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করেও কিছুই আবিষ্কৃত হলো না। কর্তৃপক্ষ বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেল। এই সংবাদের সংগে সংগে সরকারী মামলা পরিচালনাও ত্বরান্বিত করা হোল, খুব তাড়াহুড়ো করে মামলা শেষ হোল। আমাদের উপর ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হোল।

এবার সুরু হোল আমাদের সায়েস্তা করার পালা। রাজসাহী সেন্ট্রাল জেলে আমরা প্রেরিত হলাম কারাদণ্ড ভোগের জন্য। এই জেলে প্রবেশ করেই বুঝতে পারলাম দণ্ডপ্রাপ্ত বিপ্লবী বন্দীদের উপর অমানুষিক পীড়ন চল্‌ছে। আমাকে ও ধীরেন বাবুকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হোল। এই (ক) নিঃসঙ্গ সেলবাসের ব্যবস্থা বেশ নিখুঁত ভাবে করা হোল। আমাদের দুজনের মধ্যে দেখা শুনা বা পত্র বিনিময়ের কোন সুযোগই রইলো না।

(ক) নিঃসংগ সেল (Solitary Cell) সাধারণতঃ শাস্তির ব্যবস্থা হিসাবে উদ্দিষ্ট। নিঃসংগ সেল-বন্দীর পক্ষে ডিগ্রির অন্য কোন সেল-বন্দীর সংগেও দিবারাত্রের কোন সময়েই কোন কারণে বা অবস্থায় মেলামেশা নিষিদ্ধ।

১০নং ডিগ্রি (ক) নিঃসঙ্গ সেল (খ) বলে পরিচিত হলেও সারা রাজসাহী জেলকে কতকটা সরগরম করে রেখেছিল। দণ্ডিত বিপ্লবী বন্দীদের মধ্যে চরমুগুরিয়া ডাকাতি মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত সুরেন্দ্র কর ও বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গোপাল গুপ্ত এই ডিগ্রির দুটি সেলে ছিল। চরমুগুরিয়া ডাকাতি মামলায় মনোরঞ্জনের ফাঁসী হয়। আর সাধারণ দণ্ডিত বন্দীর মধ্যে এক পাঠান ছিল এই ডিগ্রীতে। যৌবনে নরহত্যার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে পনেরো বছর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেছে। বারো বছর কারাদণ্ড ভোগ করে'ও সে মুক্তি পায় নি।

তার কারণ হল সে জেলখানায় কারুবই নিকট কখনও মাথা নোয়ায় নি, এবং নানা শাস্তি ভোগ স্বীকার করে, এমন কি নিজের জীবন বিপন্ন করেও সে বহুবার বীর পাঠানের মতোই জেল খানায় জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ করেছে। আমি ছিলাম এক নম্বর সেলে এবং গোপাল গুপ্ত সাত নম্বরে, পাঠান যুবক পাঁচ নম্বর এবং সুরেন কর আট নম্বর সেলে থাকত। এই দশ নম্বর ডিগ্রির জন্য বিশেষ প্রহরীর ব্যবস্থা ছিল। যে ডিগ্রিতে দুরন্ত বা দীর্ঘ মেয়াদী বন্দীদের রাখা হত সেখানে জেলের বাছাই করা পেটোয়া জেল-প্রহরী ও কয়েদী-প্রহরীর দ্বিবিধ কড়া ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

(ক) ডিগ্রি (জেলের চলতি নামে) উপপ্রাচীরে ঘেরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সেল সমূহের সারি।

(খ) সেল (Cell) নিরাপত্তা বা শাস্তির ব্যবস্থা হিসাবে উদ্দিষ্ট একজন মাত্র বন্দীর বাসের উপযোগী নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠ।

রাজসাহী জেলে জাল ডিগ্রিতে তখন বহু বিপ্লবী বন্দী ছিল। তাদের ওপর সেসময়ে অমানুষিক অত্যাচাব চলছিল।

একটু বর্ণনা না দিলে জাল ডিগ্রি (Cubicle) সম্বন্ধে পাঠকের সুস্পষ্ট ধারণা হবে না। সাধারণতঃ একটি লম্বা ব্যারাকের মধ্যে লোহার তারের জাল দিয়ে দেয়াল, ছাদ সবই ঘেরা। পাঁচ ফুট উঁচু, ছয় ফুট লম্বা, সারে চার ফুট চওড়া পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট একজন মাত্র কয়েদী থাকতে পারে এমন ছোট ছোট বহু কোঠা বা সেলের দু'টি সারি। দুরন্ত অথবা দাগী স্বভাব কয়েদীদের (Habitual Prisoners) জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাত্রে এখানে সাধারণত ঐ জাতীয় কয়েদীদের রাখা হয়। কখনও কখনও শাস্তি বা নিরাপত্তা হিসাবে দিনরাতও কাউকে কাউকে থাকতে হয়। জালের বেড়া ছাড়া আর কোন আব্রুর ব্যবস্থা নেই। প্রত্যেকটি কোঠায় পৃথক পৃথক দরজা আছে। দরজায় তালা লাগান থাকে। প্রত্যেকটি কোঠায় মল-মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা হিসাবে আল্‌কাত্‌রা লেপা একটি করে টুক্‌রী থাকে। এক কোঠার মল-মূত্র পাশের কোঠায় অনায়াসেই গড়িয়ে যেতে পারে। এই পরিবেশে অনেককে হয় তো রাতদিন কাটাতে হয়। কারুর ভাগ্যে কখনও কখনও দীর্ঘ ভোগের ব্যবস্থাও হয়। কখন কখন সেলের মধ্যে বসে নির্দিষ্ট খাটুনীও খাটতে হয়। কোঠার স্বাভাবিক উচ্চতা নেই। দেহ-সঞ্চালনের জায়গা অতি অল্পই। জাল ডিগ্রির দুর্ভাগাদের অতি অস্বাভাবিক অবস্থায়ই কাল কাটাতে হয়। জেলের সেল সম্বন্ধে

একটা স্বাভাবিক বিভীষিকা আছে—একান্ত নিঃসঙ্গতার কারণে সেল জীবনও ক্রমে সয়ে যায়, কিন্তু জাল ডিগ্রি বাসে প্রাণ ওঠে হাঁপিয়ে।

দশ নম্বর ডিগ্রিতে আমরা অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থাতেই ছিলাম। অবশ্য নির্য্যাতনের পাল্লা সেখানেও কম ছিল না? বাছাই করা যে সব সিপাই ও কয়েদী-প্রহরী মোতায়েন হত, তারা কখনও দুর্ব্যবহারের সুযোগ নষ্ট করত না।

রাজসাহী জেলে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সেলাইয়ের কাজ দেওয়া হোল। দৈনিক চব্বিশটি কয়েদী জাঙ্গিয়ার বড় সেলাই অথবা আঠারটি কুর্ত্তার (জামা) বড় সেলাই নির্দ্দিষ্ট কাজ হিসাবে সমাপ্ত করে দিতে হবে। অনভ্যস্ত হাতে এতটা কাজ করে ওঠা সম্ভব হ'ত না। বিশেষ করে জাঙ্গিয়ার কাজ শক্ত তো ছিলই, সময়ের হিসাবে কাজের পরিমাণও বেশী ছিল। পূরা খাটুনী দিতে না পারলে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল।

তা ছাড়া অতি তুচ্ছ অজুহাতে ও তুচ্ছ ক্রটির জন্যও শাস্তির বিধান ছিল। একদিন কারাসমূহের ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল ফ্লাওয়ারডিউ সাহেব জেল পর্য্যবেক্ষণ কালে ডিগ্রির পাশে এসে আমাকে সাধারণ কয়েদীর মত তার সামনে দাঁড়াতে বল্‌লে আমি অস্বীকার করি। ক্রুদ্ধ হয়ে সে আমায় সায়েস্তা করবার উদ্দেশ্যে সিপাই শাস্ত্রী দিয়ে তার পছন্দ মাফিক কায়দায় সবলে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলো। অনেক ধস্তাধস্তি করেও সিপাইরা অকৃতকার্য হলে আমার ওপর এক মাসের জন্য নিঃসঙ্গ সেল বাস ও ডাণ্ডাবেড়ির শাস্তি বিধান

করা হয়। স্থানীয় কারাধ্যক্ষ লিউক অবশ্য এক্ষেত্রে আমার কোন দোষ পায় নি। বিভাগীয় কর্তার আদেশ তাকে মেনে চল্‌তেই হবে।

একমাসের জন্য পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি পরে আমায় নিঃসঙ্গ সেলবাস করতে হল। কারাবিধান অনুযায়ী নিঃসঙ্গ সেল-বন্দীর জন্য সকালে বিকালে দুবার মোট একঘণ্টা করে বেড়াবার ব্যবস্থা আছে। আমার সেলের ঠিক সামনেই সম-আয়তনের ছাদবিহীন উপ-সেল ছিল। এই উপ-সেলের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আঙ্গিনাটুকুই আমার নির্দিষ্ট পাদচারণের স্থান। নিঃসঙ্গ সেলবাসের ব্যবস্থা অনুসারে আমার সেলটি প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই তালাবন্ধ থাকত,—নির্দ্দিষ্ট প্রয়োজন ছাড়া তালা খোলা হ'ত না। সেল থেকে ও উপসেলে পা বাড়ান মাত্রই উপ-সেলের বাইরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হত, যাতে আমি ডিগ্রির অন্যান্য বন্দীদের সাথে মেলামেশা বা কথাবার্তা কইতে না পারি। দশ নম্বর ডিগ্রিতে থাকাকালীন আমি, পাঠান যুবকটি ও অপর দু'জন বন্ধুর সঙ্গে সকাল বিকাল পায়চারি করতাম। নিঃসঙ্গ বন্দীত্বের কালে সেটুকুও বন্ধ হয়ে গেল।

দশনম্বর ডিগ্রিতে থাকাকালে একদিন বেলা পাচটার সময় আমাব ডিগ্রি খুলতে দেরী হওয়ায় পাঠান যুবকটি সিপাইকে তিরস্কার করতে থাকে। সেলের ভিতর থেকেই আমি তার তিরস্কার শুনতে পাই। তালা খুল্‌তে সিপাই অস্বীকার করলে সে সিপাইর হাত থেকে জোর করে

চাবীর তোড়া কেড়ে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে আমার সেল নিজেই খুলে দিয়ে চাবি সিপাইর হাতে ফেরৎ দিয়ে দেয়। সিপাই বিপদ-সূচক বাঁশী বাজাতে উদ্যত হলে পাঠানটি তাকে এই বলে সতর্ক করে দেয় যে, সে বাঁশী বাজালে তার বিপদ হতে পারে কিন্তু তার আগেই সে সিপাইকে মেরে নিজেও মৃত্যুবরণ করবে। পাঠান যুবকটিকে চিনতো না পুরানো সিপাইদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না। তার কথায় ভয় পেয়ে এবং আমাদের হস্তক্ষেপের ফলে সিপাই বাঁশী বাজান থেকে নিরস্ত হল। ইতিমধ্যে দশনম্বর ডিগ্রি থেকে পলায়ন সম্পর্কে পাঠান যুবকের সহিত আলাপ করি। সে সম্মত হয়। হাতল-ছাড়া করাতের ব্লেড দু'খানা অন্যত্র লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছিলাম। সময় বুঝে অতি সঙ্গোপনে ও সতর্কতার সহিত সেদু'টো আমার সেলে আনিয়ে পরীক্ষা করলাম। অনেকদিন অব্যবহার্য অবস্থায় অযত্নে পড়ে ছিল বলে ব্লেডে এত বেশী মরচে পড়ে গিয়েছিল যে, তা লোহা কাটার কাজে লাগলো না। এমতাবস্থায় শিক কেটে পলায়নের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হল।

কয়েদীদের প্রতি ভাল ব্যবহারের জন্য জেল সুপার লিউকের সুনাম ছিল। বিপ্লবী-আন্দোলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে এবং গভর্মেণ্টের তরফ থেকে তাদের প্রতি খুব কড়া ব্যবহারের নির্দেশও আসে। ফলে লিউক সাহেবের ব্যবহার ও আচরণে পরিবর্তন দেখা যায়। দমনদলন নীতি প্রয়োগের জন্য রাজসাহী জেল তখন কুখ্যাতি

অর্জন করেছে। বিপ্লবী বন্দীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। এই কঠিন অবস্থার অবসান ঘটাবার জন্য তাঁদের অনেকেই লিউক সাহেবের উপর কোন আক্রমণাত্মক প্রতিশোধের পক্ষপাতী হয়ে উঠলো। বাইরে থেকেই তখন সেরূপ আক্রমণ সম্ভবপর ছিল। সমিতির কেন্দ্রীয় সংস্থায় আমাদের অবস্থা জানাবার জন্য রাজসাহীর সংগঠনের নিকট একখানা গোপন চিঠি পাঠিয়ে দিতে সমর্থ হলাম।

একদিন ঠিক সন্ধ্যার সময় সবে মাত্র “লক্-আপ”, (Lock-up) হয়ে গেছে, আমাদেরও সেল গুলোতে বন্ধ করেছে, এমনি সময় চৌদ্দ নম্বর ডিগ্রীর প্রাচীরের দিকে পদ্মার ধার থেকে পর পর কয়েকটি গুলির শব্দ কানে এলো আট নম্বর সেল থেকে বন্ধুবর সুরেন কর মনের উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল—“বেটা মরেছে” বলে। ইতিমধ্যে বিপদ-সূচক বাঁশী বাজতে লাগল, জেলের পাগলা ঘন্টি বেজে উঠল। আমরা যা ভাবছিলাম তাই। আধ ঘন্টা পর সিপাহীদের পাহারার পরিবর্ত্তন হলে জানতে পারলাম যে লিউক সাহেব গুলির আঘাতে গুরুতর ভাবে জখম হয়েছে। সিপাহীরা যেন চোরের মত নিঃশব্দে পাহারা দিতে লাগল।

সন্ধ্যার সময় নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে লিউক সাহেব সস্ত্রীক মোটর চালিয়ে যাবার সময় অকস্মাৎ একজন তরুণ বিপ্লবী সাইকেল দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তার দুইজন বন্ধু গুলি চালিয়ে লিউক সাহেবকে আঘাত করে। গুলি তার মুখে লেগে চোয়াল ভেঙ্গে বের হয়ে যায়—আঘাত গুরুতর।

আহত লিউক সাহেবকে অবিলম্বে স্পেশাল ট্রেণ যোগে কলিকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

রাজসাহী জেলের দমন ও দলননীতি সাময়িক ভাবে বন্ধ হলো। মালিকহীন অবস্থার মত রাজসাহী জেল স্থানীয় একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে চলতে লাগলো। জেলের প্রধানের উপর আক্রমণের প্রতিক্রিয়া ক্ষুদে শাসকদের উপর স্পষ্ট দেখা গেল। নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তারা সন্দিহান। তাদের মুখে বিভীষিকার কলো-ছায়া। অন্যদিকে মনের চাপা আনন্দ প্রকাশের সুযোগ না পাওয়ায় রাজনৈতিক ও অন্যান্য নিপীড়িত বন্দীদের চোখে মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের ভাব ফুটে উঠেছে। জেলের আবহাওয়া সাময়িক ভাবে শান্ত হোল।

লিউক সাহেবের আততায়ী বলে ধৃত হলো, রাজসাহী সংগঠনের সভ্য ভোলনাথ রায়। বিশেষ ট্রাইবুন্যালে বিচারের জন্য তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। বিচারে ভোলানাথ রায়ের প্রতি সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও দীপান্তরের আদেশ হলো।

নয়

ঘটনা ও দুর্ঘটনা সবেরই প্রতিক্রিয়া আছে। লিউক সাহেবের প্রাণ হনন প্রচেষ্টায় আমাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগের প্রমাণ না থাকলেও কর্তৃপক্ষ ধরে নিয়েছিল আমরা এই কার্যের প্রেরণাদাতা। কাজেই রাজসাহী জেল থেকে শীঘ্রই আলীপুর জেলে স্থানান্তরিত হলাম। রাজসাহী জেলে দ্বিতীয় শ্রেণীব বন্দী হিসাবে একমাত্র সাপ্তাহিক সঞ্জীবনী ও ইংরাজী ষ্টেট্‌স্‌ম্যান-এর সাপ্তাহিক ওভারসীজ সংস্করণ পেতাম। তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরা তো কোন কাগজই পেত না। সংবাদপত্র সরবরাহের এই সীমাবদ্ধ বরাদ্দের উপর সরকারী সেন্সারের কাঁচি যদৃচ্ছ চলে বেড়াতো। ক্ষুদ্র-বৃহৎ কর্তনচিহ্ন নিয়ে এই সংবাদপত্র যখন আমাদের হাতে আসতো, তখন তাতে দু'চারটি নারী হরণের সংবাদ অথবা সরকারের কোন কার্য্যের সাফাই-গান ছাড়া আর বিশেষ কিছু থাকতো না। রাজনীতি বা কূটনীতির গন্ধযুক্ত বিদেশী সংবাদ যা রয়টার কর্তৃক কৃপণ হাতে পরিবেশিত হোত, সরকারী সেন্সারের কাঁচি থেকে তাও অব্যাহতি পেত না। এমনি করে সংবাদবঞ্চিত ও বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাসের পর মাস কাটিয়ে যখন আলিপুর জেলে এলাম, তখন সবিস্ময়ে দেখলাম ভারতের, বিশেষ করে বাংলাদেশের অনেক চমকপ্রদ ঘটনার সঙ্গেই আমাদের আদৌ পরিচয় ঘটেনি। সেন্সরের কাঁচি সেখানেই সার্থক হয়েছে।

আলিপুর জেল তখন বিপ্লবীদের বাসভূমি। সারা জেলময় তারা নানা পরিবেশে ছড়িয়ে আছে। সত্যধৃত হয়ে কেউ হাজতবাস কোরছে, কেউ বা সাজা পেয়ে দণ্ডভোগ করছে, কেউ বা আন্দামানগামী জাহাজের প্রতীক্ষায় বসে আছে। আবার কেউ আলিপুর জেল হাসপাতালে রোগের চিকিৎসা করাচ্ছে। অনুশীলন দলের বন্ধুদের মধ্যে সত্যধৃত প্রভাত চক্রবর্তী ও আগরতলা ডাকাতি মামলায় দণ্ডিত কৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তীর সাথে দেখা হোল। কলকাতায় ফেরারী বিপ্লবীদের আড্ডায় হানা দিয়ে পুলিশ সরকারের চোখে আপত্তিকর জিনিসপত্র এবং সহকর্মীদের সংশ্রব প্রমাণের উপযোগী কাগজপত্রাদি সহ প্রভাত চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করে। প্রাপ্ত কাগজপত্রের দৌলতে বাংলায় ও অন্যান্য প্রদেশে ব্যাপক তল্লাসী চালিয়ে পুলিশ অনুশীলন সমিতির বহুসংখ্যক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের (Inter-Provincial Conspiracy) সূচনা হয় এই থেকে।

তের নম্বর ডিগ্রির এক নিঃসঙ্গ সেলে আমায় সতর্ক প্রহরায় রাখা হয়েছে। সেখানে এক টুকরো কাগজে এলো গোপন নির্দেশ, আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী হবার জন্য অপেক্ষমান হৃষীকেশ গুপ্ত আমারই পাশের সেলে। তাকে প্রভাবিত করে তার সংকল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে। হৃষীকেশ দেখছিল মুক্তির স্বপ্ন। তার মত পরিবর্তন করানো সম্ভব হোল না। বরং সেলে বসে তাকে যে সব পরামর্শ দিয়েছিলাম মুক্তির আশায় তার কিছু কিছু সে পুলিশের কাজেই ব্যবহার করেছে।

হৃষীকেশকে আমার আওতা থেকে দূরে রাখবার জন্য আমাকে 'বম্' ইয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হোল।

পলায়নের ঝোঁক তখনো মাথায়,—অসুস্থতার অজুহাতে 'বম্' ইয়ার্ড থেকে জেল হাসপাতালে ভর্তি হই। হাসপাতাল তখন বিপ্লবী বন্দীতে জমজমাট। বক্‌সার পলাতক বন্দী কৃষ্ণপদ চক্রবর্তীও সেখানে আছে। আগরতলার এক ডাকাতিতে ধরা পড়ে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড নিয়ে এসেছে। বর্দ্ধমানের অন্তরীন স্থান থেকে পলাতক ও পরে কলকাতায় ধৃত প্রভাত চক্রবর্তী মহাশয়ও হাসপাতালে। তাঁর কাছে দলের সংগঠনের বর্ত্তমান অবস্থা জানা গেল,—তিনি কি অবস্থায় কি ভাবে ধরা পড়লেন তাও বললেন। লিউক-হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে ভোলা রায় ও শশী দে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলেই দণ্ডভোগ করছে।

জেল হাসপাতালে থাকাকালীন কৃষ্ণপদর সঙ্গে পলায়নের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলাপ করলাম। আমাদের দলের সভ্য সুনেত্র সেন তখন হাসপাতালে। তাঁর কাছে শুনলাম যুগান্তর দলের বিশিষ্ট বিদ্রোহী সভ্য ফণী দাশগুপ্ত ও সুরেন দত্ত রায় পলায়নের পরিকল্পনা নিয়ে হাসপাতালে এসেছে। ফণী দাশগুপ্ত বন্দীশিবির থেকে পালিয়ে বাইরে ফেরারী অবস্থায় ধরা পড়ে। দু'টি মামলায় বত্রিশ বছর কারাদণ্ড লাভ করেছেন। ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলায় পনোরো বছর সাজা নিয়ে সুরেন দত্ত রায় আলিপুর জেলে আছেন।

হাসপাতালে ঘুমিয়ে আছি। রাত্রি হু'টো, চারিদিক নিস্তব্ধ। হঠাৎ হট্টগোলের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘন ঘন সিপাইর বাঁশী বাজছে, পাগলা ঘন্টি বেজে চলেছে। সদলবলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হাসপাতালে এসে হাজির। সাথীসহ ফণী দাশগুপ্তকে নিঃসঙ্গ সেলে বন্ধ করে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হোল। আমার সমস্ত অন্তর বিষাদে ভরে গেল।

ফণীবাবুরা শিক কেটে হাসপাতালের দোতালা থেকে কাপড় ঝুলিয়ে নীচে নেমে পড়েছিলেন। সেখান থেকে পাঁচীলের দিকে যাবার পথে একটি ঘরে কয়েকটা পোষা রাজহাঁস ছিল। মানুষের পায়ের শব্দে ভয় পেয়ে তারা প্যাঁক প্যাঁক করে চীৎকার সুরু করে দেয়। লণ্ঠনধারী প্রহরী ছুটে এসে তাঁদের দেখে ফেলে।—ফলে এই বিপর্যয়। আমাদেরও হাসপাতাল থেকে পালাবার প্রচেষ্টা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখতে হোল।

—*—

দশ

কোটাম মামলার সাজা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানান্তরিত করা হোল। বছর চারেক পর আবার সেই পুরাণো প্রেসিডেন্সী জেলে এলাম। সেখানে তখন বিপ্লবী বন্দীর সংখ্যা তিন চার'শো হবে। তা'ছাড়া দণ্ডিত সত্যাগ্রহী বন্দীরা তো ছিলই।

প্রত্যেক বিপ্লবী দলেরই কেউ না কেউ সেখানে আছেন। অনুশীলন সমিতির বহু সদস্য তখন প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলেন। তাঁদের সাথে সংবাদ বিনিময় হল। বিভিন্ন ক্যাম্পেরও খবর পেলাম। বিভিন্ন ক্যাম্পে ও জেলে তখন দলের দণ্ডিত, বিচারাধীন যে সব বন্দী রয়েছে তাদের কাছ থেকে খবর যা সংগ্রহ করলাম এবং বাইরের দলের খবরও যতটা জানতে পারলাম সে সব মিলিয়ে দলের তখনকার অবস্থা মোটামুটি বোঝা গেল। পার্টি তখন নিজ কার্যক্রম অনুসারে অগ্রসর হ'তে প্রস্তুত ও সক্ষম। আমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় আশা ভরসা ও উৎসাহ কিছুটা বেড়ে গেল; কারণ সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও অবস্থার সঙ্গে আমি সমধিক পরিচিত।

প্রভাত চক্রবর্তীর নিকট প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী বাইরে তখনও অনুশীলন দলের যে সব ফেরারী বন্ধুরা ছিলেন তাঁদের সাথে সহজে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভবপর হয়েছিল। কলকাতার সদর কেন্দ্রে তখন ফেরারীদের মধ্যে হরিপদ দে, অমূল্য সেন, নিরঞ্জন ঘোষাল প্রভৃতির এবং মেয়েদের মধ্যে মায়া

নাগের নাম উল্লেখযোগ্য। জিতেন নাহা নামক জনৈক নতুন যুবকের নামও শুনলাম। নোয়াখালীর কিশোরী দাশগুপ্ত, এম্.-এ পড়ার সময়েই আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কলকাতার বাইরে প্রফুল্ল সেন, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, দেবপ্রসাদ রায় চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বক্সা ক্যাম্প হতে আগত বন্ধুদের নিকট প্রাপ্ত সংবাদাদি হতে বুঝতে পারলাম যে, বহু বিশিষ্ট সভ্যের গ্রেপ্তারের ফলে শক্তিহীন সংগঠনকে বাঁচিয়ে আবার শক্তিশালী করে তুলবার জন্য জেল-ক্যাম্প থেকে অচিরেই বিশিষ্ট বিশিষ্ট বন্দী বন্ধুদের পালিয়ে বাইরে যাবার পক্ষে বক্সার দলীয় বন্ধু মহলে দৃঢ় মত গড়ে উঠেছে এবং তাঁদের মত ও আগ্রহকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য তাঁরা স্থানান্তরিত কোন বন্ধুর মারফৎ এক হাজার টাকার একখানা নোট আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আটক বন্দীদের নিয়ম অনুসারে প্রাপ্ত জিনিষপত্রের একটা অংশ বাঁচিয়ে এবং তা গোপনে বিক্রী করে আগে থেকেই যে অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল, তা থেকেই ঐ টাকা তাঁরা পাঠিয়ে দিলেন। আমরা সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলাম। ইতিমধ্যে শ্রীসত্যেন্দ্র মজুমদারের উপর অন্তরীণের আদেশ এল। যশোহরের কোন গ্রামে তাঁকে নজরবন্দী হিসাবে আটক থাকতে হবে। সত্যেনবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র। রাজসাহী কলেজে পড়তেন। কৃতী ছাত্র বলে সেখানে তাঁর সুনাম ছিল। তাঁর বিপ্লবী আগ্রহ ও আন্তরিকতায় আমাদের কারো কোন সন্দেহ ছিল না, তাঁকে বাইরে পাঠাবার প্রস্তাব করা হলে তিনি সানন্দে রাজী হলেন। স্থির হল অন্তরায়ণ স্থান থেকে

তিনি পলায়ন করবেন। 'কালজানা'র একটি খালি কৌটোর মোড়ক খুলে তার গায়ে নোটখানি জড়িয়ে দিয়ে মোড়কটি আবার ভাল করে লাগিয়ে দিয়ে নিত্য ব্যবহার্য কতগুলি টুকিটাকি জিনিষ ভর্তি করা হোল। অন্তরায়ণ স্থানে যাবার দিনে ছোটখাট নানা প্রয়োজনীয় জিনিসে ভর্তি আরও কয়েকটি কৌটোর সঙ্গে এই কৌটাটিও ট্রাঙ্কে ভরে দেওয়া হোল। তাঁর সঙ্গে যে টাকা দেওয়া হল এবং কি ভাবে দেওয়া হল তা আমি, চারুবিকাশ দত্ত ও প্রতাপ রক্ষিত ছাড়া আর কেউ জানতেন না। যে বন্ধুটি বক্সা থেকে গোপনে টাকা বয়ে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি দলের নিয়মানু- যায়ী টাকা পৌঁছে দিয়েই কর্তব্য কায সম্পাদন করেছেন। এ বিষয়ে তিনিও বিন্দু বিসর্গ জানতেন না, জানবার চেষ্টাও করেন নি। সত্যেনবাবু তাঁর বই, বাক্স, বিছানাপত্র সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন। তল্লাসীর সময় জেলফাটকে কিছুই ধরা পড়েনি। নিরাপদে জেল গেট পার হয়ে গেলেন। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লাম। পুলিশের হেফাজতে সত্যেনবাবু যশোহরের পুলিশ সাহেবের কাছে উপস্থিত হলে তাঁর বাক্স তল্লাসী সুরু হয়। পুলিশসাহেব সামনে থেকেই তল্লাসী করায়। জিনিসপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে পুলিশ- সাহেব নিজেই কৌটাটি বার করে মোড়ক খুলে ফেলে নোটখানি বার করে ফেল্‌লো। সত্যেন বাবুর বুঝতে বাকী রইলো না যে, জেলের বিশিষ্ট কর্মীদের মধ্যেও বিশ্বাসঘাতক আছে, যে ভিতর থেকেই পুলিশকে অতি গোপনে সংবাদ সরবরাহ করছে। প্রতাপ রক্ষিত 'কালজানা'র কৌটাটি সত্যেন বাবুর হাতে দেবার সময় চটের পর্দাঘেরা দেয়াল-এর অপর দিক থেকে হয়ত

কোন বিশ্বাসঘাতক এটা দেখে গোয়েন্দা বিভাগে খবর দিয়েছিল।

সত্যেন মজুমদারকে তক্ষুণি গ্রেপ্তার করে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে আলিপুর জেলে পাঠানো হলো। তাঁর পলায়ন চেষ্টা ব্যর্থ হলেও প্রেসিডেন্সী জেল হতে আমরা চেষ্টা করতে থাকি। বাইরের ফেরারী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। রোজই সাঙ্কেতিক লিপির আদানপ্রদান চলছে। সাঙ্কেতিক লিপি লিখতে এবং মর্মোদ্ধার করতে অনেক সময় লেগে যেত। নিরাপত্তার খাতিরে তা করতে হ'ত। আমাদের সাঙ্কেতিক লিপির প্রয়োগ সহজসাধ্য কিন্তু চাবি জানা না থাকলে মর্মোদ্ধার অত্যন্ত কঠিন। কোন একটি অক্ষরের জন্য একটিমাত্র বিশিষ্ট সাঙ্কেতিক সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না। যে কোনো অক্ষর যে ভাবে যতবারই ব্যবহৃত হোক প্রতিবারেই নতুন নতুন সাঙ্কেতিক সংখ্যা ব্যবহৃত হ'ত। কোন সাঙ্কেতিক সংখ্যা একাধিকবার ব্যবহৃত হতো না। এই সাঙ্কেতিক ধারার মধ্যে বাহ্যতঃ কোন বিশিষ্ট ধারা বার করা দুরূহ। মনে হোত কোন ধারাই যেন নেই। সঙ্কেত লিপির পারদর্শীর পক্ষেও সঙ্কেত উদ্ধার প্রায় অসম্ভব ছিল। সঙ্কেত লিপিতে সংখ্যা হিসাবে শুধু ভগ্নাংশই ব্যবহৃত হ'ত এবং একটি ভগ্নাংশ একবারের বেশী ব্যবহৃত হ'ত না। 'a'র সাঙ্কেতিক সংখ্যা $1/2$, $3/4$, $5/8$, $7/50$, $3/100$ বা অন্য যে কোন ভগ্নাংশ হতে পারে, b, c, d, প্রভৃতি যে কোন অক্ষর সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা। কোন্ অক্ষরের কোন স্থানে এরূপ কোন্ ভগ্নাংশের প্রয়োগ হবে 'চাবি' বা 'key' জানা

না থাকলে কোন উপায়েই বলা যেত না। সাঙ্কেতিক চিঠি লেখা বা বাইরে থেকে প্রাপ্ত সঙ্কেত লিপির উদ্ধারের ভার আমার ওপরই ছিল। চিঠি বাইরে পাঠাবার এবং বাইরে থেকে চিঠি এলে তা গ্রহণ করার ব্যবস্থার ভার ছিল শ্রীশচীন্দ্র চক্রবর্তীর ওপর। অন্য তু'একজন বিশিষ্ট সভ্য শচীনবাবুকে সহায়তা করতেন। শচীন চক্রবর্তী দলের পুরাণো সভ্য। দলের অর্থ ভাণ্ডার বাড়ানোর জন্য ৺প্রবোধ দাশগুপ্তের সাথে নোট জাল করার সময় তিনি ১৯২৫ সালে ঢাকা জেলার কোন গ্রামে গ্রেপ্তার হন এবং সাত বছরের জন্য সাজা পান। দণ্ডভোগের শেষের দিকে জেলে তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। দণ্ডকাল শেষ হলে এই ক্ষয়রোগ নিয়েই তিনি বাইরে আসেন অসহায় অবস্থায়। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের চিকিৎসায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন। সুভাষচন্দ্রের সাহায্য না পেলে তাঁর চিকিৎসাই সম্ভবপর হতো না।

সঙ্কেত-লিপি মারফৎ জেল হ'তে পলায়নের পরিকল্পনা বাইরে ফেরারী আড্ডায় জানানো হয়। কাঁকুড়গাছি ফেরারী আড্ডায় তখন পরেশ গুহ, হরিপদ দে, নিরঞ্জন ঘোষাল, সুশীল চক্রবর্তী, সুধীর ভট্টাচার্য, হাস্যবালা দেবী, মায়া নাগ প্রভৃতি ছিলেন। এবিষয়ে তু'টি পরিকল্পনা তাঁদের কাছে পাঠানো হয়। প্রথমটি ডিনামাইট দিয়ে প্রেসিডেন্সী জেলের প্রাচীরের একটি বিশিষ্ট অংশ উড়িয়ে দেওয়া, ঠিক ঐ সময় ঐ ভাবে ইহা কার্যে পরিণত করতে পারলে পলায়নের সাফল্য সমধিক নিশ্চিত ছিল। দ্বিতীয়টি—বিশিষ্ট রকমের একটি রসি-সিঁড়ি (Ropeladder)

তৈরী করে মোটরে করে জেলের পার্শ্বে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট রাত্রিতে নির্দিষ্ট সময়ে নিয়ে আসতে হবে। বাইরে বন্ধুদের গাড়ী থেকে সবুজ আলো দেখাবার উত্তরে ভিতর থেকে লাল আলোর সঙ্কেত পেলেই প্রাচীর-সংলগ্ন রাস্তা থেকে প্রাচীরের উপর দিয়ে সিঁড়ি জেলের ভিতর এমন ভাবে ফেল্‌তে হবে, যাতে সিঁড়ির শেষাংশ প্রাচীর থেকে ভিতরের দিকে আট ফুট দূরে অবস্থিত একতলা দালানের ছাদের ওপর পড়ে। হয় শিক্ কেটে নয় গুণতি ফাঁকি দিয়ে পলায়নের উদ্যোগে বন্দী বন্ধুরা সেই নির্দিষ্ট সময়ে একতলার ছাদে উঠে প্রতীক্ষায় থাকবে এবং সেই নিক্ষিপ্ত সিঁড়ির সাহায্যে জেল থেকে পালিয়ে যাবে। বাইরের বন্ধুরা দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি অনুমোদন করে আমাদের চিঠি দিলেন। ডিনামাইট ব্যবহার করে পলায়ন অধিকতর সহজসাধ্য হোত— এবং ডিনামাইট আমাদের সংগৃহীত থাকা সত্বেও এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হওয়ার কারণ এই কার্যে বহুলোক হতাহত হবার আশঙ্কা ছিল। কাঁকুড়গাছির ফেরারী বন্ধুরা এ কাজের ভার নিলেন। আমি ও ক্ষীরোদ দত্ত যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানিয়ে বাইরে সঙ্কেতবার্তা পাঠান হল। জেলে আসার আগে ক্ষীরোদ দত্ত মেদিনীপুর জেলায় অনুশীলন দলের কর্মকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন, তিনি মেদিনীপুর কলেজেই বি, এ, পড়্‌তেন।

এর কিছুদিন আগে একদিন রাজবন্দীদের ব্যারাকগুলিতে খুব কড়া তল্লাসী হয়ে গেল। তল্লাসীর দল শুধু মোটা দড়ির সন্ধানই বিশেষ করে করেছিল। আমাদের ব্যারাকের

ওপরই তল্লাসীর প্রকোপটা হোল বেশী। সে সময়ে প্রেসিডেন্সী জেলে তিনশোর মতন রাজবন্দী ছিলেন। এর মধ্যে দশবারোজন বিভীষণ ছিল বলে আমরা বিশেষভাবে সন্দেহ করতাম, যারা নিয়মিত ভাবে বা সুযোগ মত গোয়েন্দা বিভাগের সহিত ঘনিষ্ঠ সংশ্রব রেখে ভিতরের গোপন সংবাদ সরবরাহ করতো। বলা বাহুল্য দৃশ্যতঃ এরা কোন না কোন বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলো। দলের লোকেরা সাধারণতঃ কোন বিশেষ সংবাদ তাদের জানাতেন না। দল নির্বিশেষে বন্দীরা তাদের যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। মনে হয় এই সব বিভীষণদের মধ্যে কারুর মনে কোন কারণে সন্দেহ জেগেছিল যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার পালাবার চেষ্টা করবে। কি কবে কোন্ জায়গা থেকে পালাবার পরিকল্পনা করছি তার বিস্তারিত সংবাদ তাদের জানা ছিল না। সম্ভবতঃ দড়ির সাহায্যে পালাবার চেষ্টার কথা অনুমান করেই গোয়েন্দা বিভাগে খবর দিয়েছিল। এক সময়ে এই উদ্দেশ্যে কিছু দড়ি ভিতরে আনাও হয়েছিল, পরে যে কোন কারণে পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়।

এগার

নির্দিষ্ট দিনে আমি ও ক্ষীরোদ দত্ত অন্যান্য বন্ধুদের সাহায্যে সন্ধ্যার লক্-আপের সময় সিপাইর দৃষ্টি ও গুণ্তি এড়িয়ে ব্যারাকের বাইরে এসে অতি সাবধানে উপরে উঠে উপুর হয়ে শুয়ে রাত্রির প্রতীক্ষায় রইলাম।

আমরা ছাদের উপর শুয়ে সামনের দোতালা ব্যারাকের ছাদের ওপর প্রহরারত রাইফেলধারী শান্ত্রীদের দেখতে পেলাম। সেখান থেকে তারা জেলপ্রাচীরের সবটাই পর্যবেক্ষণ করছে। প্রেসিডেন্সী জেলের পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র (Watch tower) তখন রাজবন্দীদের ব্যারাকের ওপরই করা হয়েছিল। আমরা একতলার সেই ছাদের গায়ে লেগে শুয়ে পড়েছিলাম। রাত্রির প্রথমাংশ অন্ধকার থাকায় এবং একেবারে নিশ্চল হয়ে পড়েছিলাম বলে পর্যবেক্ষণ প্রহরী আমাদের অবস্থান জানতে পারবে না বলে আমাদের বিশ্বাস ছিল। ছাদের ওপর কান রেখে আমরা সতর্ক দৃষ্টিতে শান্ত্রীর গতিবিধি দেখতে লাগলাম। নীচের সিপাইদের কথাবার্তাও আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। ছাদের ওপর উপুর হয়ে বুকে হেঁটে শম্বুক গতিতে প্রতি পদক্ষেপে দু'তিন আঙ্গুল করে প্রাচীরের নির্দিষ্ট স্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। এ ভাবে প্রায় দেড়শ ফুট যেতে হবে। এ গতিতে অগ্রসর হলে সেখানে পৌঁছোতে রাত প্রায় এগারোটা

বেজে যাবে। এর মধ্যে আঁধার কেটে জ্যোৎস্নার আলোক দেখা যাবে। আমাদের উদ্দিষ্ট কার্যে ব্যাঘাত হবে। এই অবস্থায় তাড়াহুড়া করে বুকে ভর দিয়ে চল্‌তে গেলেও পর্যবেক্ষণ প্রহরীর দৃষ্টি এড়ান কঠিন হয়ে পড়বে। চলন্ত বস্তুর ওপর তাদের নজর পড়ার আশঙ্কা বেশী থাকবে। কাজেই আমরা বুকে হাঁটার গতিবেগ বাড়াতে পারিনি। যাই হোক, এ ভাবে চলে আমরা অনুমান ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলাম। সে দিকে বাইরের ফেরারী বন্ধুদের মোটর গাড়ী হতে সবুজ রঙের আলো আকাশের গায় পড়ামাত্র ব্যারাকের বন্ধুরাও লাল আলোর সংকেত ক'রে উভয় পক্ষকেই প্রস্তুতির নির্দেশ দেবে। কিন্তু অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করা সত্ত্বেও আকাশের গায়ে সবুজ আলোর কোন সংকেত আমাদের নজরে পড়ল না। অনেকক্ষণ পরে একবার শুধু সবুজ রঙের এক ঝলক আলো দেখলাম বলে মনে হলো, কিন্তু তারপর আর পুনরাবৃত্তি হল না। উত্তরে লাল আলোর সংকেতও দেখা গেল না। এ ভাবে ব্যর্থ প্রতীক্ষায় রাত দু'টো পর্যন্ত ছাদের ওপর সেই অবস্থায় পড়ে রইলাম। উপুর হয়ে ছাদের ওপর কান রেখে নিশ্চল অবস্থায় একই ভাবে নিঃশব্দে দুজনে পাশাপাশি শুয়ে পড়েছিলাম। মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে শুধু ইসারায় ইংগীতে ভাব বিনিময় হচ্ছিল; রাত দুটোর পর আর প্রতীক্ষা না করে ফিরে যাওয়াই সমীচীন বলে মনে করলাম এবং ক্লান্ত দেহে ফিরে যেতে চেষ্টা করলাম।

যাবার সময় যেভাবে চলেছিলাম ফিরতি পথে কিন্তু সেরকম ধীর ও দৃঢ় পদক্ষেপে বুকে ভর করে চলা দায় হল। অবসন্ন দেহ যেন আর টেনে বয়ে নেওয়া যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে দেহটা টেনে টেনে চলতে চেষ্টা করছিলাম। তখন আর যেন শরীরটাকে ছাদের ওপর স্থির রাখতে পারছিলাম না। মাঝে মাঝে একটু আধটু শব্দও হচ্ছিল। তবু এভাবেই ফিরে চল্লাম। কিছুদূর চলার পরই সামনে পড়ল একতলার ছাদের ওপর দিকে মাঝখানে টিনের একটি বায়ু-নিকাশী (ventilator)। বায়ু-নিকাশীর নীচের জায়গাটুকুতেই শুধু শিক লাগান ছিল, তার নীচ দিয়ে দেহটিকে টেনে নিতে হবে। যাবার পথে অতি সহজেই মাথা গলিয়ে শিকে ভর করে চলে গিয়েছিলাম, কোন কষ্ট হয়নি, ফিরতি পথে দেখা গেল মাথা গলিয়ে শিকের উপর ভর করে হাতের জোরে আর দেহকে টানতে পারছি না, তাই খানিকটা জোর পায়ের উপর পড়ল। ফলে দেহ একটু উচুতে উঠে যাওয়ায় উপরের টিনের গায়ে একটা ধাক্কা লেগে গেল। নিশার নিস্তব্ধতা ভেদ করে প্রচণ্ড শব্দ হোল। নিরাপত্তার খাতিরে আমরা উভয়েই টিনের নীচে সেই অবস্থায়ই চুপ করে রইলাম, শব্দ শুনেই নীচের লণ্ঠনধারী সিপাই 'ক্যা হ্যায়? ক্যা হ্যায়?' বলতে বলতে শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে এল। আরও দু'তিন জন সিপাইও তাকে অনুসরণ করল, ছাদের শাস্ত্রীদের মধ্যেও চাঞ্চল্য আসতে পারে মনে হোল। নিশ্চল হয়ে চুপটি করে ভাবছি এই বুঝি বাঁশী বাজে। ইত্যবসরে একটি আকস্মিক ঘটনা ঘটলো। বায়ু-নিকাশীর নীচে চেঁচামেচি শুনে এবং আলোর শোভাযাত্রা

দেখে ভয় পেয়ে মিউমিউ করতে করতে একটি বিড়াল হঠাৎ ছাদ থেকে লাফিয়ে সিপাইদের সামনে পড়ল। শব্দের সঙ্গে বিড়ালের কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করে সিপাইরা তাদের অভ্যাসসুলভ চোস্ত ভাষায় বিড়ালটার উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থানী গালি দিতে দিতে চলে গেল।

আমরা তখন গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর জন্য আবার বুকে হাঁটা শুরু করলাম। রাত চারটে, সাড়ে চারটের সময় আমাদের গন্তব্যস্থানে, অর্থাৎ ছাদের এক কোণে ফিরে এলাম। কিন্তু তখনও ছাদ থেকে নামলাম না। সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে লক্-আপ্ খোলার সময় নীচে নামবো বলে ঠিক করলাম। কারণ ব্যারাকের বন্ধুরা তখন আমাদের সাহায্যার্থে ছুটে আসবে এবং হট্টগোলের ভেতর সিপাইরাও আমাদের আলাদা করে দেখবার সুযোগ পাবে না।

ছাদের কোণে এসে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তেই কখন যে আমি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম তা টেরও পেলাম না। আমার অবস্থা বুঝতে পেরে বন্ধুবর ক্ষীরোদ দত্ত সজোরে ধাক্কা দিয়ে আমায় জাগিয়ে দিল। ঘুম ভাঙলে আকাশের দিকে চাইতেই বুঝতে পারলাম, নামবার সময় হয়ে গেছে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে আমরা উভয়েই ছাদের কোণের দিক দিয়ে নীচে নেমে পড়লাম। ব্যারাক খুলতে তখন হয়ত দশ পনেরো মিনিট দেরী আছে। এই সময়টুকুতে সিপাইদের দৃষ্টি এড়াবার স্থান আছে পায়খানার সারিগুলি। আমরা দুজনে পাশাপাশি দুটো পায়খানায় ঢুকে পড়লাম, হিন্দুস্থানী সিপাইর দল ভোরে

ব্যারাক খোলার আগেই পায়খানায় যায়। তারা আমাদের আগেই আশেপাশের পায়খানায় ঢুকে নিত্যকার্য্য সেরে বার হয়ে গেল। ইত্যবসরে ব্যারাক খোলার আওয়াজ কানে গেল, সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুর দল ছুটে নীচে নেমে এসে আমাদের দুজনকে ঘিরে দাঁড়াল, তাদের সাথে আমরাও তখনই উপরের ব্যারাকে চলে গেলাম। আমাদের দেহ ক্লান্ত, সর্বাঙ্গে ও ধুতি জামায় শ্যাওলা ও কাদামাটি মেখে আমরা ভূত সেজেছি। মুখের ওপর পুরু দাগ পড়েছে, হাত পা মলিন হয়েছে। এসব চিহ্ন সিপাইদের দৃষ্টি এড়াবার নয়। কিন্তু তাদের নজরে পড়বার আগেই বন্ধুরা আমাদের ঘিরে উপরে নিয়ে চলে গেল। যাক্ ব্যারাকে সোজা স্নানের ঘরে ঢুকে জামা কাপড় ভাল করে ধুয়ে পরিস্কার হয়ে বার হয়ে এলাম। এমনি করেই সেই নৈশ অভিযানের অবসান হোল। পরিকল্পনা-অনুযায়ী বাইরের ফেরারী বন্ধুরা নির্দিষ্ট রাত্রে ও নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হতে না পারার কারণ সন্ধানের জন্য বাইরে সঙ্কেতলিপি পাঠালাম। জবাব আর পেলাম না। কাঁকুড়গাছির ফেরারী বাসায় পুলিশের নজর পড়তে শুরু করেছে। দু'চার দিনের মধ্যেই তারা সেখানে হানা দিয়ে মায়া নাগ ও আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের সময় খানাতল্লাসীতে মোটর গাড়ী, রসি-সিঁড়ি (Rope ladder) আলোর সঙ্কেত ব্যবস্থাদিসহ কিছু মালমশলা পুলিশের হাতে পড়ে।

পরবর্ত্তী কালে হরিপদ দে গ্রেপ্তার হয়ে যখন জেলে এলো, তখন তার কাছে জানা গেল প্রেসিডেন্সী জেল থেকে পালাবার

যে তারিখ নির্দিষ্ট করা ছিল—সেই তারিখের দু'তিন দিন পূর্বেই জিতেন নাহা ধরা পড়ে। এবং তার পরেই তার পরিচিত পল্‌তার বাসার দুইজন ফেরারী কর্মী খগেন ব্যানার্জি ও নরেন সরকার ধৃত হয়। এতে হরিপদ দে প্রভৃতির জিতেন নাহা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে সন্দেহ হয়। সেজন্য তারা নির্দিষ্ট দিনের আগের দিন জেল প্রহরার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে যায়। স্পষ্টই তাদের মনে হয়েছে সরকার পূর্বাপেক্ষা অধিক প্রহরীর ব্যবস্থা করেছে এবং সশস্ত্র প্রহরীও মোতায়েন করেছে। এই পরিকল্পনা ত্যাগ করাব জন্য তারা একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের কাছে চিঠি পাঠাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারে নি। কিছুদিন হল জিতেন নাহা ধরা পড়ে প্রেসিডেন্সী জেলে এসে আমাদের সঙ্গে বাস করছে। দলের সভ্য হলেও এর তেমন কোন বৈপ্লবিক পরিচিতি ছিল না। প্রেসিডেন্সী জেল থেকে পালাবার ব্যবস্থার কিছুটা দারিত্ব বাইরের বন্ধুরা জিতেন নাহার উপরই দিয়েছিল। বাইরের উদ্যোগ-পর্বের প্রধান অংশের ভারই ছিল হরিপদ দের উপর। জেলের ভেতরে এসেই জিতেন নাহা জানায় যে, হরিপদ দে, পরেশ গুহ, নিরঞ্জন ঘোষাল প্রভৃতির সঙ্গে তার বিপ্লবী কার্য-কলাপের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। প্রেসিডেন্সী জেলের কোন্ স্থান হতে কি ভাবে পালাবার পরিকল্পনা হয়েছে,—সে বিষয়ে জিতেন আমায় প্রশ্ন করতে থাকে। অধিকাংশ বিষয়েই আমি মৌনাবলম্বন করে থাকি। সে নির্দিষ্ট স্থান সম্বন্ধে জানতে চাইলে আমাদের ব্যারাক থেকে বহুদূরে এমন একটি স্থানের কথা বলি, যা কার্যে

পরিণত করা আদৌ সম্ভবপর নয়। তাতে সে সংশয় দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বিষয়ান্তরে আলাপ সুরু করে দেয়। ফেরারী আসামী হলেও গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গেই জিতেন নাহাকে সরাসরি ব্যারাকে রাজবন্দীদের সঙ্গেই রাখা হয়। এই কারণে আমাদের মনে স্বভাবতঃই সন্দেহ জাগে যে, এতে হয়তো পুলিশের কোন গোপন হস্ত রয়েছে। সাধারণতঃ কোন ফেরারী বিপ্লবী গ্রেপ্তার হয়ে জেলে এলে তাকে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য অন্যদের সম্পর্ক থেকে আলাদা করে দূরে সরিয়ে রাখা হতো—তার উপর কোন মামলা দায়ের করা যায় কিনা তারই অপেক্ষায়। বিশেষতঃ যে সময়ে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা পাকাবার জন্য গোয়েন্দা বিভাগ বিশেষ ভাবে সচেষ্ট ছিল সে সময়েই জিতেন নাহাকে সরাসরি রাজবন্দীদের ব্যারাকে এক সঙ্গে রাখা তাৎপর্যপূর্ণ।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের দলীয় বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল। আমাদের সঙ্কেত লিপির আদান প্রদানও চলত। হঠাৎ কখনো কর্তৃপক্ষের হাতে পড়লেও যাতে সন্দেহের উদ্রেক না হয়, অথবা সন্দেহের অবকাশ কমই থাকে এবং সঙ্কেত উদ্ধার কঠিনতর হয় সেই জন্য মাঝে মাঝে সঙ্কেত-লিপি লিখে দিতাম অদৃশ্য কালিতে। বন্ধুরা অদৃশ্য কালিতে লেখা পাঠোদ্ধারের সঙ্কেত জানতেন। জিতেন নাহার গ্রেপ্তারের কয়েকদিন পর আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন আসামী প্রভাত চক্রবর্তীর একখানা সঙ্কেতলিপি আমাদের নিকট পৌঁছলে আমরা জানতে পারি যে,

জিতেন নাহার পক্ষে ঐ ষড়যন্ত্র মামলার দ্বিতীয় রাজসাক্ষী হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এবং দলেব ভিতরকার খবর সংগ্রহ করার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই গোয়েন্দা বিভাগ তাকে প্রেসিডেন্সী জেলে রাজবন্দীদের সঙ্গে একত্রে রেখেছে। তাব সম্বন্ধে উপযুক্ত "ব্যবস্থা" করার বিষয়, লিপিতে লেখা ছিল। চিঠিখানা মাদারী-পুরের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু যুগান্তর দলেব শ্রী সন্তোষ দত্তের মারফত পেয়েছিলাম। অদৃশ্য কালিতে লেখা আরও একখানা চিঠি চট্টগ্রামের শ্রীনগেন সেন (জুলুসেন নামেই তিনি রাজনৈতিক বন্ধুদের নিকট পরিচিত ছিলেন) এর মারফত এসে পৌছাল।

প্রেসিডেন্সী জেল থেকে তখন আব কাবো পক্ষেই পালানো সম্ভব নয় কারণ সেখান থেকে আমাদের দেউলী বন্দা নিবাসে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। দেউলীতে পাঁচশো বন্দীকে রাখবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ এবং শ' খানেক বন্দীকে সেখানে পাঠানোও হয়েছে।

বাংলা দেশ থেকে বহুদূরে দেশীয় রাজ্য মণ্ডলীর অন্তর্গত চীফ-কমিশনাব শাসিত প্রদেশ রাজস্থানের খর মরুভূমি পার হয়ে রাজপুতানার এক প্রান্তে, আজমীর হয়ে দেউলী বন্দীনিবাস যেতে হয়। দেউলী ছিলো, পূর্ব্বে ব্রিটিশ সেনা নিবাসের একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

বাংলাদেশ বৈপ্লবিক আবহাওয়ায় ও পরিবেশে সরগরম। বিংশ শতাব্দির প্রারম্ভ থেকেই বাংলা দেশ ইংরেজের সঙ্গে নানা-ভাবে সংগ্রামে লিপ্ত। বঙ্গভঙ্গ ও ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জনের আন্দোলন থেকে সুরু করে বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রতিটি ধাপের সহিত

বাংলা সুপরিচিত। যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব ছাড়া আর কোথাও বিপ্লব আন্দোলন বাংলার মত দানা বেঁধে উঠ্‌তে পারেনি।

মাঝে মাঝে আন্দোলনের ঝড় বয়ে গেলেও রাজস্থানের মরুভূমিতে বিপ্লব আন্দোলনের স্রোত তখনও পৌঁছাতে পারেনি। দু'চারটি যুবক বিপ্লবের পথে পা বাড়ালেও সেখানে এমন পরিবেশ গড়ে ওঠেনি যার ফলে সে অঞ্চলে কোথাও কোন বন্দীনিবাস স্থাপন করলে রাজনৈতিক আবহাওয়ায় কোনও পরিবর্ত্তন ঘটতে পারে। বঙ্গোপসাগর মধ্যবর্ত্তী দণ্ডিত বিপ্লবী বন্দীদের জন্য যেমন আন্দামান বন্দীশালা বাইরের জগত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরী হয়েছিল, তেমনি একই উদ্দেশ্যে দেউলী বন্দীনিবাসও তৈরী হলো। বক্সা হিজলী ও বহরমপুর বন্দীনিবাসগুলি বাংলার অভ্যন্তরে—বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে এবং সেখান থেকে বিপ্লবীরা গোপন পথে সংগঠনের সঙ্গে যোগ সূত্র রেখে বৈপ্লবিক কাজ করতে সমর্থ বলে শাসক বর্গ মনে করতো—তাই বিপ্লব আন্দোলনকে রাজবন্দীদের সহযোগিতা থেকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত করার জন্যই শাসকবর্গের এই প্রয়াস।

বার

দেউলী যাত্রীদের অর্ডার এসে গেছে। সন্ধ্যার সময় সাবেকী আমলের অনুকুল দা (অনুকুল মুখার্জি) অর্ডার পত্রখানা উল্টিয়ে ধরে রহস্য করে আমায় বললেন, "দেখো, আমি দেউলী যাব কিনা সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ মতামত জিজ্ঞেস করেছে। অনুকুল মুখার্জির মত না হলে তাকে পাঠায় কার সাধ্য ?" "অনুকূলদার অভিমত না নিয়ে তো আমাদেরও পাঠাতে পারবে না" পাল্টা পরিহাস ছলে তাঁকে এ জবাব দেই। তারপর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভাবতে লাগলাম—দেউলীর পথে পালাবার কোন পরিকল্পনা ঠিক করা যায় কিনা। আমরা থাকব রিজার্ভ গাড়ীতে, সশস্ত্র শান্ত্রী-পরিবেষ্টিত। মধ্যবর্তী কোন ষ্টেশনে নামা-ওঠাও চলবে না। একমাত্র গাড়ী বদল হবে আগ্রায়। আগ্রা বাংলা থেকে বহুদূরে। এরূপ যখন অবস্থা— তখন পালাবার কোনো সার্থক পরিকল্পনা করতে হলে সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনীর সাথে লড়বার সামর্থ্য নিয়েই করতে হয়। আমরা তখন বেপরোয়া, বাইরে গিয়ে নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী আঘাত হানবার জন্য পাগল। অবস্থা যতই বিপদজনক হোক না কেন, তার সম্মুখীন হতে সব সময়ই প্রস্তুত। বাইরে ফেরারী বন্ধুদের

কাছে এক পরিকল্পনা পাঠালাম। তাদের অনুমোদন ও সমর্থন পেলে পথে খণ্ডযুদ্ধ করে পরিকল্পনাকে কার্যকরী করব।

আমরা এইভাবে পালাবার পরিকল্পনা তৈরী করে বন্ধুদের জানিয়ে দিলাম। রাত্রিতে পথের মাঝে শিকল টেনে গাড়ী থামিয়ে আমরা লাফিয়ে বাইরে পড়ব। তারপর রক্ষী পুলিশ-দলকে অতর্কিত আক্রমণে অভিভূত ও পঙ্গু করে ধূম্রজালের আড়ালে অপেক্ষমান মোটরে সরে পড়ব। একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবশ্যকমত অস্ত্র-শস্ত্র ও যন্ত্রপাতি সহ মোটর গাড়ী নিয়ে বন্ধুরা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই উপস্থিত থাকবে। বাইরের আলোর নিশানার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ী থেকেও অনুরূপ আলো দেখানো হবে। এভাবে আলোর সংকেতের মারফৎ উভয় পক্ষের প্রস্তুতি পরস্পরকে জানাবার ব্যবস্থা ছিল। যাত্রার দিন পূর্বাহ্নেই জেল থেকে বাইরের বন্ধুদের জানিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। হাওড়া ষ্টেশনে সেই একই গাড়ীতে ভিন্ন কামরায় অনুসরণকারী সহায়ক বন্ধুদের যাবার জন্যও লিখে জানিয়েছিলাম।

বাইরের বন্ধুদের কাছে পালাবার পরিকল্পনা পাঠাবার কিছুদিন পরেই দেউলী যাত্রার নির্দেশ এলো। ইতিমধ্যে জনৈক বন্ধুর মারফৎ সংবাদ পেলাম যে, কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ একটি ফেরারী বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করার জন্য কলকাতার এক বাসায় দুই এক দিনের মধ্যেই হানা দেবে। ফেরারী বিপ্লবীর নাম ও বাসার ঠিকানাসহ খবরটি জরুরী সংকেতলিপির মারফৎ অবিলম্বে বাইরে পাঠিয়ে দিলাম। তিন দিন পর ফেরারী বন্ধু অমূল্য সেন উক্ত ঠিকানায় এই সংকেতলিপিসহ ধরা পড়ে।

কারণ সংকেতপলিপি উদ্ধারকারী কোনও ব্যক্তির সঙ্গে তার তখন পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নি। সংকেত উদ্ধারকারীরা হয় ধরা পড়েছে, নয় অন্যত্র চলে গেছে।

দেউলী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। চট্টগ্রামের শ্রীপ্রতাপ রক্ষিত এতকাল দলের গোপন বিষয়গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। সংকেতলিপির সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। যাবার সময়ে আমার সঙ্গে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা আপত্তিকর চিঠিপত্র যাতে না থাকে, সেজন্য আমার ট্রাঙ্ক ও সুটকেশ তল্লাসী করে দেখার ভার তিনি নিজেই নিলেন। কিছুদিন আগেই একখানা গুরুত্বপূর্ণ সংকেতলিপি বাইরে পাঠাবার সময় ধরা পড়ে যায়। চিঠিখানা নানা খবরে ভর্তি ছিল। সুখের বিষয় এই যে, গোয়েন্দাবিভাগ সংকেতলিপির পাঠোদ্ধার করতে পারে নি। অনেক সময় সংকেতলিপি লেখা হয়ে গেলেও সুযোগের অভাবে বাইরে পাঠানো সম্ভব হোত না। নিরাপত্তার জন্য সুটকেশ বা বাক্সের মধ্যে এমন সংগোপনে রাখতে হত যে, কয়েকদিন পরে নিজেরাই খুঁজে পেতাম না, অথবা সে কথা মনে থাকতো না। এভাবে দু'এক খানা আপত্তিকর লিপি বাক্সের তলায় বা কোনে পড়ে থাকা অসম্ভব নয়। এরকম অঘটন অনেকের কপালেই ঘটেছে, তাই এই সতর্কতা।

দেউলী যাত্রার দিন হাওড়া ষ্টেশনে এসে উৎসুক দৃষ্টি মেলে এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম—নির্দিষ্ট চিহ্ন ও লক্ষণযুক্ত কাউকে দেখা যায় কিনা। গাড়ী ছাড়ার পূর্ব মূহূর্ত পর্য্যন্ত কাউকে দেখতে পেলাম না। বাংলার এলাকার প্রতিটি

ষ্টেশনে সজাগ দৃষ্টি রাখা সত্বেও আশাজনক কিছু নজরে পড়ল না। বাংলার বাইরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আশার আলো একেবারেই নিভে গেল। অনুসন্ধানী দৃষ্টির আর কোন কারণ বা অর্থই রহিল না। আগ্রায় গাড়ী বদল করতে হল। শেষ ষ্টেশনে নেমে মরুপথে সুদীর্ঘ আশি মাইল মোটরে যেতে হল, পথে একটি ছোট্ট পাহাড়ী নদী। চারিদিকে দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল মরু-প্রান্তর! তারি মধ্য দিয়ে চলে গেছে এই পথ। মাঝে মাঝে মরূদ্যান ও প্রাচীর-ঘেরা ছোট ছোট পল্লী, আর তার চারপাশে সামান্য চাষের জমিতে চাষবাস হচ্ছে দেখা যায়। আবার সেই সীমাহীন মরুভূমি। মরুপথের দুধারে মাঝে মাঝে ভেড়ার পাল স্বচ্ছন্দে চড়ে বেড়াচ্ছে,—সঙ্গে দু'চার জন মেষপালও আছে। ঐ মরুপথের মাঝে মাঝে কলকাতার শ্রেষ্ঠীদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে,—জনগণের রক্তশোষক মালিকদের ভূয়া জমক ও দেমাকের প্রাণহীন উদ্ধত পরিচয়স্বরূপ। কলকাতা ও ভারতের ধনিক কুলোত্তম শ্রেষ্ঠীদের পিতৃভূমি এই রাজস্থান। কিন্তু এদের দৌলতে এতটুকু লাভবান হয়ে ওঠেনি এই মরুরাজ্য। স্কুল, কলেজ, রুগ্ন-সদন, পল্লী-সমবায় সমিতি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি এবং আদর্শ কৃষিক্ষেত্র, পশু-সদন ইত্যাদি নানাবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে মরুভূমির বুকে প্রাণ সঞ্চার করে দেবার, তাকে শস্য-সম্পদে সমৃদ্ধ করে তোলবার কোনো প্রচেষ্টারই পরিচয় চোখে পড়েনি; মাড়োয়ারী ধনী বণিক তার শোষণলব্ধ অর্থের ভগ্নাংশ বিশেষ দু'চারটে মন্দির, ধর্মশালা খুলে ধর্মের ঘরে ফাঁকি দিয়ে ইহলোকে দৈহিক সুখ-বিলাস ও পরলোকে

স্বর্গবাসের সহজ ব্যবস্থা করে রেখেছে মাত্র, এবং একেই মনে করেছে যথেষ্ট।

প্রেসিডেন্সী জেল ছাড়ার দু'দিন পর বিকাল চারটার সময় দেউলী শিবিরে এসে পৌঁছোলাম। শিবিরে ঢুকতেই সুরু হল তল্লাসীর পালা—একদিকে ডাক্তারের তল্লাসী চলছে, দুইজন বিশিষ্ট ডাক্তার—কেউই এম-বি, বি এস-এর নীচে নয়, পরীক্ষা করছেন বন্দীদের উলঙ্গ করে। উলঙ্গ করে পরীক্ষা করার অধিকার নাকি একমাত্র এম্ বি, বি-এস ডিগ্রিধারী ডাক্তারদেরই আছে। লজ্জা সংকোচের বালাই তাঁদের নেই। অন্যদিকে বাক্স বিছানা প্রভৃতি জোর তল্লাসী সুরু করে দিয়েছে কমাণ্ডান্ট বা শিবিরাধ্যক্ষ মিঃ ফিনি।—এই আমাদের পূর্ব পরিচিত বক্সা শিবিরের প্রথম অধ্যক্ষ। সরকারের কাছে এর যথেষ্ট কদর। তাই দেউলী শিবির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ফিনি সাহেবকে অধ্যক্ষ করে সেখানে পাঠানো হয়েছে। সে নিজেই আমার বাক্স তল্লাসী সুরু করলো। সুরু করেই একটুকরো লেখা কাগজ খুঁজে পেয়ে পড়তে সুরু করে দিল। দুটো চোখ তার হিংস্র আগ্রহে চক্‌চক্ করছে। চোখে তখন আমার চশমা ছিলনা, তবুও বেশ বুঝতে পারলাম, টুকরো কাগজটুকুতে ছিল সংকেতলিপিতে রূপান্তরিত করার পূর্বে সরল ইংরাজীতে লেখা দলের সংবাদের খসড়া; কি করে যে এই চিরকূট বাক্সে রয়ে গেল এবং কি করেই যে বাক্স খোলার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা পাওয়া গেল তা বুঝতেই পারলাম না। তবে সম্ভবতঃ কোন সময়ে কোন বিশেষ সংবাদ

বাইরে পাঠাবার জরুরী তাগিদে তাড়াহুড়া করে খসড়া রচনা ও সংকেতলিপি শেষ করে তখনই বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে যাওয়ায় চিরকুটটি নষ্ট করা হয়ত সম্ভরপর হয় নি। তাই নিরাপত্তার খাতিরে ও যাতে সহজে কারো চোখে পড়তে না পারে এরূপ সংগোপনে বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল—পরে নষ্ট করে ফেলে দেওয়া হবে বলে। নানা ঝঞ্ঝাটে ও ঝামেলায় পড়ে আর নষ্ট করার কথা মনেই ছিল না। এমনি করেই হয়তো কোন কানাচে বা কোনও কিছুর ফাঁকে বা ভাঁজে পড়ে ছিল। বলা বাহুল্য এ জাতীয় আপত্তিকর কাগজপত্র সাধারণতঃ টুকরো টুকরো করে যেখানে সেখানে ফেলে দেওয়া নিরাপদ নয়, একেবারে নিশ্চিহ্ন করেই ফেলে দিতে হয়, যাতে পরে কখনও কোনও সন্ধানী চক্ষুর গোচরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। কারণ টুকরো টুকরো কাগজ জোড়া দিয়ে এমনকি পোড়া কাগজ থেকেও লিপি-বিশারদরা অনেক ক্ষেত্রে লিপির মর্ম উদ্ধার করেছে। যাই হোক, ফিনি সাহেবের হাতে আপত্তিকর কাগজের টুকরো দেখামাত্র তার হাত থেকে চিঠিখানা ফস্ করে কেড়ে নেবার চেষ্টা করতেই চতুর ফিনি সাহেব মুচ্‌কী হেসে নিঃশব্দে চিঠিখানা নিয়ে দ্রুত অফিস ঘরে চলে গেলেন। তিনি সম্ভবতঃ পরবর্তী ডাকেই কলকাতার সদর গোয়েন্দা অফিসে কাগজটুকু পাঠিয়ে দিলেন।

দেউলী পৌঁছোবার পরদিনই আমার পেটে ভীষণ যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, ডাক্তারেরা সেটাকে এপেণ্ডিসাইটস্ বলে সিদ্ধান্ত

করেন এবং অবিলম্বে অপারেশনের প্রয়োজন মনে করায় সেইদিনই আমাকে মোটরে করে আজমীড় হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। হাসপাতালে পৌছানমাত্র অপারেশন করা হয়। পরের দিন রোগ শয্যায় শুয়ে, তখনো ভাল করে জ্ঞান হয়নি এ অবস্থায় শ্রদ্ধেয় জে, এম, সেনগুপ্ত মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ পেলাম। কলকাতা মেডিকেল কলেজ হ'তে ডিগ্রীপ্রাপ্ত হাসপাতালের এক সহৃদয় হিন্দুস্থানী ডাক্তার সংবাদটি গোপনে জানিয়ে গেলেন।

বাংলার ও ভারতের এক বিশিষ্ট জননেতা চলে গেলেন। স্বদেশী আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে সেনগুপ্তের নাম অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত ছিল। তার অভাব যেন সমগ্র সত্বার মধ্যে অনুভব করলাম। অস্ত্রোপচারের বেদনা মর্মের বেদনায় রূপান্তরিত হলো।

ভারতের জাতীয় আন্দোলন সেনগুপ্তের কাছে বহু বিষয়ে ঋণী। ১৯২১ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের যুগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সুযোগ্য সহকারী হিসাবেও আসাম বেঙ্গল রেলওয়েতে দীর্ঘ ধর্মঘট চালিয়ে রেল চলাচল ব্যাহত করে দিয়ে যোগ্য নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বাংলার ত্রি-নেতৃত্ব, বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি, কাউন্সিলে স্বরাজ্যদলের নেতা এবং কলকাতা করপোরেশনএর মেয়রের দায়িত্ব ভার তাঁর উপর পড়ে এবং যোগ্যতার সঙ্গে তিনি সে সব ভার বহুদিন বহন করেন। বাংলার বিপ্লবী সংগঠনও তার কাছে অনেক বিষয় ঋণী ছিলো। কৌঁসুলী হিসাবে চট্টগ্রাম রেলওয়ে ডাকাতি ও চট্টগ্রামের গোয়েন্দা অফিসার প্রফুল্ল রায়কে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত বিপ্লবী আসামীদের

পক্ষ সাহসের সহিত সমর্থন করে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন।

১৯৩০ সালের পর থেকে বিপ্লবী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে দেখে তদানীন্তন বাংলার গবর্ণর ষ্টানলী জ্যাকসন বিপ্লবী আন্দোলনকে শান্ত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে জে, এম, সেনগুপ্তের মাধ্যমে বিপ্লবীদের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করেছিলেন। সেনগুপ্ত হঠাৎ গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য লণ্ডনে চলে যাওয়াতে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে। লৌহ কঠিন I.C.S. বর্গ সেনগুপ্তের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাংলার গভর্ণরকে বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে আপোষ আলোচনা চালাতে বাধা দেয়। বক্সা-দুর্গ বন্দীনিবাসের কমাণ্ডাট কটামের মামলা চলবার সময় জলপাইগুড়ি জেলে সেনগুপ্তের সাথে আমাদের দেখা সে কথা আগেই বলেছি। আমাদের সাথে তাঁর মেলামেশা নিষিদ্ধ হ'লেও গোপনে একত্রিত হয়ে একসঙ্গে বসে তাস খেলা এবং নানাবিধ রাজনৈতিক আলোচনা চলত। সহজ রসালাপও হ'তো প্রায়ই। মিসেস সেনগুপ্তা একদিন জেলে দেখা করতে এসে জানালেন যে বেনারস হতে জ্যোতিষ নাকি ভৃগু গণনা করে তাঁকে জানিয়েছে যে সেনগুপ্তের পঞ্চাশ বৎসর বয়সে জীবনের আশঙ্কা আছে। এ কথা শুনে তিনি উচ্চ হাস্য সম্বরণ করতে পারেন নি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মৃত্যুতে বলেছিলেন—স্বদেশের মঙ্গলের জন্য যে সব সাহসী যোদ্ধা সংগ্রাম করে গেছেন যতীন্দ্রমোহন তাঁদের অন্যতম। মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য কোনও

প্রকার ত্যাগ স্বীকারে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। অপরিসীম দুঃখের জীবনই তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন। আচরণে মহৎ এবং সৌজন্যে সর্ব্বজয়ী যতীন্দ্রমোহন সমগ্র ভারতের একজন রাষ্ট্রনৈতিক নেতা···যে জীবন মহৎভাবে উদ্‌যাপিত এবং অকুণ্ঠ-চিত্তে উৎসর্গীকৃত তার স্মৃতি গৌরবের ও বেদনার।

অস্ত্রোপচারের ঘা সারতে একুশ দিন লাগল। ক্যাম্পের কমাণ্ডাণ্ট ফিনি সাহেব নিজে এসে আমার ক্যাম্পে ফিরতে আর ক'দিন লাগতে পারে জানতে চাইলেন। বুঝতে দেরী হল না চতুর ইংরাজ অফিসার কোনও অভিপ্রায় নিয়ে নিশ্চয়ই এসেছেন এবং অতি শীঘ্রই তা বাস্তবে রূপায়িত হবে। দেউলী ক্যাম্পে অচিরে ফিবে যাবার ব্যবস্থা করে ফিনি সাহেব চলে গেলেন।

হাসপাতালে থাকার সময় রক্ষী-সিপাহীরা হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও বিভিন্ন রোগী মহলে বাংলার পিস্তলধারী বিপ্লবী বলে আমার পরিচয় জানিয়েছিল। তাই যাবার সময়ে সাধারণ রোগীরা বাংলার পিস্তলধারী বিপ্লবীকে দেখার জন্য সারি বেঁধে দাঁড়ালো। মহিলারা আমায় তাদের নিজের ভাষায় আশীর্ব্বাদ করলেন—জানালেন অন্তরের শুভেচ্ছা।

তের

দেউলী বন্দীনিবাসে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সরকারের নির্দ্দেশনামা পেলাম—আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আটকের নির্দ্দেশ। ইতিমধ্যে কলকাতায় আলিপুরের বিশেষ আদালতে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা সুরু হয়েছে। মামলায প্রভাত চক্রবর্ত্তী, জিতেন গুপ্ত, হরিপদ দে, নিরঞ্জন ঘোষাল, পরেশ গুহ, প্রভাত মিত্র, ভোলানাথ দাস, সত্যেন মজুমদার, অজিত বসু, প্রভৃতি অনেকেই আসামী হয়ে এসেছেন। রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র ছিল মামলার মূল অভিযোগ। আর তারই আনুসঙ্গিক হিসাবে ছিল,—উক্ত ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ, বিস্ফোরক দ্রব্যাদির প্রস্তুতি ও যোগাড়, হত্যা বা হত্যার প্রচেষ্টা প্রভৃতি। সরকার পক্ষের পাবলিক প্রসিকিউ-টার শ্রীনগেন ব্যানার্জ্জি উক্ত ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ট সংশ্রবের এবং দেউলী বন্দী নিবাসে আমার সুট্‌কেসে পাওয়া চিরকুটের কথা তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতাতে উল্লেখ করলে ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আদালত আমাকে আসামীভুক্ত ক'রে আদালতে উপস্থিতির দাবী করে। ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে আমার নামোল্লেখ করলেও, জেলের বাইরে ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সংশ্রবের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না থাকায় পাবলিক প্রসিকিউটার আমাকে

আসামী শ্রেণীভুক্ত করার কোনও প্রার্থনা জানাননি। ট্রাইব্যুনাল কিন্তু নাছোড়বান্দা। তাঁরা সুস্পষ্ট অভিমত দিলেন, আমাকে ষড়যন্ত্রের একজন প্রধান নায়ক বলে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে—ক্যাম্প অথবা জেল হতে এই ষড়যন্ত্র পরিচালনা করার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

দেউলী হতে আলিপুর জেলে আসার সঙ্গে সঙ্গে আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার বিচারার্থে প্রতিষ্ঠিত স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের সামনে আমায় হাজির করা হোল। একদিকে সরকার পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটার নগেন বানার্জ্জি ও তার সাঙ্গপাঙ্গ বি, সি, নাগ ও গুনেন্দ্র সেন প্রভৃতি। অন্যদিকে আসামীদের পক্ষে ব্যারিষ্টার শ্রী জে, সি, গুপ্ত ও তাঁর সহকারীরূপে শেখর বোস, (এখন স্বর্গত) এ্যাড্‌ভোকেট সুকুমার দাশগুপ্ত, পুর্ণেন্দু রায় চৌধুরী মামলা পরিচালনা করতে লাগলেন। আমাদের পক্ষে মামলা চালানো অতি কষ্টসাধ্য হয়ে উঠ্‌লো। ব্যারিষ্টার জে. সি, গুপ্ত নামমাত্র দক্ষিণাতেই তার সহকর্মীদের সাথে মামলা পরিচালনা করতে রাজী হলেন। শেষের দিকে এই নামমাত্র দক্ষিণাও তাঁদের দেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। কলকাতা হাইকোর্টের অথবা আলিপুর জজ কোর্টের কোনও উকীল বা ব্যারিষ্টারকে এত কম দক্ষিণায় দীর্ঘকাল স্বদেশী মামলা পরিচালনায় পাওয়া যায়নি। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার এবং কংগ্রেস নেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও হাইকোর্টের উকিল হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়রা চেয়েছিলেন দৈনিক তিনশো হতে দুশো টাকা পর্য্যন্ত, যা আমাদের পক্ষে সে সময় সাধ্যাতীত ছিল। মেদিনীপুরের

খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা ও উকীল মন্মথ দাস মহাশয় বিপ্লবী দলকে পরামর্শ ও সাহায্য দানের সন্দেহে মেদিনীপুর হতে বহিস্কৃত হয়ে কলকাতায় ওকালতি করতে বাধ্য হয়েছিলেন—মাঝে মাঝে আমরা তাঁর সাহায্যও অতি সামান্য দক্ষিণায় পেয়েছি—সে সাহায্যের মূল্যও কম ছিলনা।

বন্ধুবর প্রভাত চক্রবর্তীর ফেরারী আড্ডায় প্রাপ্ত সংকেত লিপিতে লেখা তালিকায় পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ ও বর্মার ঠিকানা পাওয়া গিয়েছিল। বর্মা তখন ভারতের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশ মাত্র ছিল। সঙ্কেতলিপি উদ্ধারের ফলে এই সব প্রদেশ থেকে দলের বহু সভ্য ধৃত হয়। বর্মা থেকে ডাঃ বিনয় সেন, সঞ্জীব মুখার্জী, পাঞ্জাব থেকে ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সীতানাথ দে, যুক্তপ্রদেশ থেকে শ্যামবিহারী শুক্লা, লক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মা (ওরফে পণ্ডিতজী) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এরা ছিল বিভিন্ন প্রদেশের পার্টি সংগঠক। পার্টির দরদী ও বহুসংখ্যক ব্যাক্তিকে সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করানো হয়। সঙ্কেত লিপিতে লেখা নামের তালিকায় পুলিশ বিভিন্ন স্থানের বিপ্লবীদের আড্ডার সন্ধান পায় এবং তৎপরতার সঙ্গে ব্যাপক খানাতল্লাসী চালাবার ফলে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ ইত্যাদি হস্তগত করে। রাজসাক্ষী হৃষিকেশ গুপ্ত (বরিশাল), জিতেন নাহা (ঢাকা) প্রভৃতির সাক্ষ্য শেষ হলে বহু দলিল পত্র পেশ করা হয়। তারপর চলে বিভিন্ন প্রকার সাক্ষীর বহর। সাক্ষীর সংখ্যাও ছিল দু'শোর উপর। কখনো

পুলিশ, কখনো ম্যাজিষ্ট্রেট্, কখনো হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞ, কখনো বিস্ফোরক-অভিজ্ঞ, কখনো বা আগ্নেয়াস্ত্র অভিজ্ঞ, সঙ্কেত লিপি অভিজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক পার্টিসভ্য, সাধারণ সাক্ষী, দেশ বিদেশের নানা ভাষাভাষী সাক্ষী, এমনি রকমারী সাক্ষীর এক বিপুল সমাবেশ হয়। আসামীদের কারো কারো ক্রন্দনরতা জননী ভগিনীদেরও সাক্ষীর কাঠগড়ায় খাড়া করা করা হয়। বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে প্রাপ্ত বোমা, পিস্তল, বোমার খোল, বিস্ফোরক পদার্থ ইত্যাদির সমাবেশে ট্রাইব্যুনালটি একটি ছোটখাট প্রদর্শনীর আকার ধারণ করে।

মামলা চলবার সময় আমরা সবাই কাঠগড়ার মধ্যে একত্রে মিলবার সুযোগ পেতাম। সে সুযোগ জেলের আবদ্ধ প্রকোষ্ঠের মধ্যে ছিল না। সেখানে আমাদের দুই তিন ভাগে ভাগ করে রাখতো। কর্তৃপক্ষ ভাগ করতো তাদের খুসীমত, আমাদের পছন্দমত নয়। যে-সব বিশিষ্ট বন্ধুদের সাথে পরামর্শ দরকার, কর্তৃপক্ষের এই ব্লক বিলি ব্যবস্থায় তা ব্যাহত হোত। তাই কোর্টের কাঠগড়াই ছিল আলোচনা চালাবার ও পরামর্শ করার বিশিষ্ট স্থান। সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও বিভিন্ন প্রমাণাদির বিবরণ শুনবার সাথে সাথে আমরা রাজনৈতিক অবস্থা ও পার্টির কার্য্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করতাম। বিপ্লবী সংগঠনকে যাতে আরও শক্তিশালী এবং দৃঢ় করে তোলা যায় তার জন্য বাইরে পালাবার পরিকল্পনা নিয়ে গোপন আলোচনা ছিল প্রধান বিষয়-বস্তু। বিপ্লবের রক্তরাঙা পথে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে

মুক্ত করবো—এই ছিলো আমাদের একমাত্র ধ্যান। আলিপুর জেল থেকে পালাবার দুরূহ পরিকল্পনা তাই আমরা অতি সহজেই গ্রহণ করেছিলাম—দুরূহ বাধা বিঘ্ন আমাদের কাছে আর দুরূহ বলে মোটেই মনে হয়নি।

পালাবার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হবার পর শেষ পর্য্যন্ত আমরা একটী পরিকল্পনা বেছে নিলাম।

বিশেষ আদালতের বিচার দিনের মত শেষ হলেই আমাদের দু'খানা কয়েদী গাড়ীতে (কয়েদী গাড়ীগুলো 'ব্ল্যাক মেরিয়া' নামে ইংরাজীতে পরিচিত) বোঝাই করে জেল ফটকে পৌঁছে দিত। সশস্ত্র পুলিশের গাড়ী আগে ও পিছনে চলত। আমরা বদ্ধ গাড়ীর ভিতর থেকে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করে দেশবাসীকে জানাতুম মাতৃভূমির প্রতি আমাদের আবেদন। সশস্ত্র গাড়ী দু'খানা আমাদের জেল ফটকের সামনে অবতরণ লক্ষ্য করতো এবং আমরা জেল ফটকের অভ্যন্তরে পৌঁছলেই তারা জেল কর্ত্তৃপক্ষ হতে আমাদের নিরাপদে ও হিসাবমত পাবার ছাড়পত্র নিয়ে গাড়ী ঘুরিয়া চলে যেতো তাদের ব্যারাকে।

সশস্ত্র রক্ষীদল আমাদের পৌঁছে দিয়ে চলে গেলে বড় গেটের অভ্যন্তরে আমাদের ৩৪।৩৫ জনকে চার পাঁচজন সার্জ্জেন্ট ও সিপাহী মিলে নাম লিখত ও তল্লাসী করতো। তারপর জেলে ঢুকবার ভিতরকার গেট খুলে সিপাহীদের সাথে ভিতর পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতো।

এই সুযোগে আমরা বড় গেটের সিপাহীদের কাছ থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে জেলের বাইরে যাবার প্রচেষ্টা করলে

হয়তো সফলকাম হতে পারি যদি গেটের বাইরের সশস্ত্র সিপাহীদের আমরা সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারি। বাইরের সংগঠনের সাহায্য ভিন্ন তা সম্ভব নয় এবং তাদের লিখে জান্‌তে চাইলাম যে তারা বাইরে থেকে পালাবার সময়ে আচ্ছাদক গুলি বর্ষণ দ্বারা সাহায্য করতে পারবে কিনা। বাইরের গেট্ প্রহরায় মোতায়েন রাইফেলধারী সিপাহীদের কোনও ভাবে পঙ্গু না করতে পারলে এই প্ল্যান কার্য্যকরী হওয়া সম্ভব নয়। বহুদিন অপেক্ষা করেও শেষ পর্য্যন্ত বাইরে থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা না হওয়ায় আমরা এই প্ল্যান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলাম।

ইতিমধ্যে নূতন এক পরিকল্পনা মাথায় এসে গেলো। আমরা যেন পথ খুঁজে পেলাম।

জেল বা ব্যারাকের গরাদ কেটে পালান নয়, তাতে মাত্র দু'এক জনের পালাবার ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু এতে ছিলো তখন অন্ততঃ ছয় সাত জনের যাবার সম্ভাবনা।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের একাংশ কালীঘাট গঙ্গার দিকে পার ঘেঁসে রয়েছে। এদিকে জেলের অভ্যন্তরে রয়েছে সাজা দেবার ডিগ্রীগুলি (১৩।১৪ নং ডিগ্রী)। সেখানে আমাদের মামলার একদল বন্ধুকে রাখা হয়েছে আর একদলকে রাখা হয়েছে বম-ইয়ার্ডে—বম-ইয়ার্ড ছিলো জেলের মধ্যভাগে।

বম ইয়ার্ডের দলকে যদি পালাবার দিন ১৩।১৪ নম্বর ডিগ্রীতে একত্র করা যায় তবে আমরা ভিতরের ছোট নয় ফুট্ প্রাচীর পার হয়ে গঙ্গার ওপরকার বড় প্রাচীর—সতর আঠার ফুট—পার হতে

পারি এবং জেলের বাইরে একবার যেতে পারলে গঙ্গা সাঁতার দিয়ে অনায়াসে পার হয়ে যাব।

তাই প্রাথমিক সমস্যা হল, কি করে বম ইয়ার্ড থেকে ১৩।১৪ নম্বর ডিগ্রীতে একত্রিত হওয়া যায়।

সুকৌশলে ট্রাইব্যুনালকে জানালাম যে মামলা পরিচালনার প্রয়োজনে ও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আমাদের সবাইর জেলের ভিতরে পরামর্শের জন্য একত্রিত হওয়া দরকাব। ট্রাইব্যুনাল বিচার বিবেচনা করলেন—জেল কর্তৃপক্ষের ও পুলিশেব পরামর্শ নিয়ে শেষ পর্যন্ত ছুটির দিন দিনের বেলায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে এক ঘণ্টাব জন্য একত্রে মিলবার সুযোগ দিতে জেল কর্তৃপক্ষকে অনুবোধ কবে পাঠালেন। জেল কর্তৃপক্ষ রাজী হলো। আলীপুব জেলেব জেল সুপাবিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক পাটনী সাহেব আই. এম. এস. ও জেলার অপ্‌সন্‌ সাহেব। ছুটিব দিন আমাদের গতায়াত শুরু হোল।

কোর্ট ছুটির দিন অপবাহ্ণের দিকে সিপাহী এসে আমাদের বম ইয়ার্ড থেকে ১৩।১৪ নম্বর ডিগ্রীতে নিয়ে যেতো। এভাবে প্রাথমিক আয়োজন শেষ হলে আমবা দেয়াল ডিঙ্গোবার পরিকল্পনায় মন দিলাম। গঙ্গার পাবে বাইরের দেয়াল দূর থেকে দৈত্যের মত দেখায়। সতর আঠাব ফুট উঁচু হলেও দেখায় যেন তার চেয়ে বেশী উঁচু, প্রতিটি ইট গুণে আমরা জানতে পেরেছি যে এর উচ্চতা আঠার ফুঠের বেশী হবে না এবং আমরা সারি বেঁধে একের পর এক কাঁধে উঠলে তৃতীয়

ব্যক্তি অতি কষ্টে হলেও দেয়ালের শীর্ষস্থান নাগাল পাবে। কিন্তু বাইরের এই পাষাণ-প্রাচীরের গায়ে গায়ে রয়েছে প্রহরী। সরকারী প্রহরীদের সাহায্য করবার জন্য আবার রয়েছে একদল বাছাই করা কয়েদী প্রহরী।

সরকারী সিপাহীদের সাহায্য করবার জন্য যেমন কয়েদী সিপাহীর ব্যবস্থা রয়েছে :তমনি বাইরের দেয়ালকে রক্ষা করবার জন্য জেলের অভ্যন্তরে রয়েছে ব্যারাক ও ডিগ্রীগুলি ঘিরে ছোট ছোট ৮।৯ ফুট উঁচু দেয়াল। সেখানে আবার দেয়ালের প্রতিটি ফটকের সাথে রয়েছে সরকারী প্রহরী ও নানাবিধ সতর্কতার ব্যবস্থা।

অদূরে রয়েছে সু-উচ্চ গম্বুজ ঘর ১৩।১৪ নম্বর ডিগ্রীগুলির সামনে—সমস্ত জেলকে দেখবার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা। জেলের ভিতরে ও বাইরে প্রতিটি লোকের যাতায়াত সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।

এতগুলি সতর্কতামূলক ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে দেয়াল ডিঙ্গোবার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমরা ৭।৮ জন বাইরে যাব, তাই ৭।৮ জনকেই দেয়াল ডিঙ্গোবার কৌশল শিখে নিতে হবে। শেখার সময় সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে আরও বেশী লোকের প্রয়োজন। বম-ইয়ার্ডে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করবার ভার নিল জলপাইগুড়ির বিশ্বস্ত কর্মী অজিত বসু। ১৩।১৪ নম্বর ডিগ্রীর ভার নিল ঢাকার অমূল্য সেন।

সেলগুলি মেঝে থেকে ছাদ পর্য্যন্ত প্রায় ১৫ ফুট

উঁচু হবে। একজনের কাঁধে আর একজন উঠবার পর তৃতীয় জনের পক্ষে মাথা সোজা করে দাড়ানো শক্ত হলেও শেখার কাজ চলতে পারে। শেখবার সময় দেখা গেলো প্রথম ব্যক্তির উপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এবং তার উপর তৃতীয় ব্যক্তি কাঁধের উপর চড়তে আনুমানিক ৩০ সেকেণ্ড সময় লাগবে। দৌড়ের উপর ওঠবার অভ্যাস করে দেখা গেল প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রথম দেয়াল ধরে দাঁড়াবে সে অতি সহজেই দৌড়ে ওঠবার বেগের ধাক্কাও সামলে নিতে পারে এবং তাতে হয়তো ৫ থেকে ১০ সেকেণ্ড সময়ও বেঁচে যেতে পারে। দিনের বেলায় আলিপুর জেল থেকে পালাবার পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে হলে যেমনি দরকার হবে সতর্কতার ব্যবস্থা তেমনি দরকার হবে পালাবার কৌশল বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করা। সব চেয়ে বেশী দরকার—সময়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করে মুহূর্ত্তের মূল্যকে কাজে লাগান। পালাবার সময় সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারলে শত্রু পক্ষের সব রকম হুঁশিয়ারী ব্যবস্থাকে নিষ্ফল করে দিয়ে আমরা কলকাতা সহরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব।

পূর্ব্বেই বলেছি যে জেলে হুঁশিয়ারী ব্যবস্থার অন্ত নেই। প্রত্যেক সিপাহীর কাছে রয়েছে বাঁশী, একজন সিপাহী বাঁশী বাজালেই অন্যান্য সিপাহীরা জেলের নানা দিক থেকে বাঁশী বাজাতে থাকে। গম্বুজ প্রহরী বাঁশীর শব্দে বৃহৎ ঘণ্টাটি বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে টানাবে—বিপদ্-জ্ঞাপক লাল নিশানা ও বিপদের দিক্‌নির্ণয়ক নম্বর প্লেট। বাঁশীর ও ঘণ্টার শব্দ কানে পৌঁছামাত্র জেলের বাইরে থেকে ছুটে আসবে সিপাহীরদল যে যে অবস্থায়

থাকবে ঠিক সেই অবস্থায় অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠি হাতে নিয়ে, এবং তার পিছনে আসবে উর্দ্ধি পড়া বাহিনী বড় বড় লাঠি বা অস্ত্র নিয়ে। ইতিমধ্যে একদল জেলের সিপাহী বাইরের বড় প্রাচীর ঘিরে রাখবে। বাঁশী ও ঘণ্টার আওয়াজ পেলেই নিকটস্থ পুলিশের রিজার্ভ বাহিনী জেলখানার সাহায্যার্থে ছুটে আসবে তাদের দল বল নিয়ে। এই সতর্কতার নাম হোল "পাগলাঘন্টি।" লক্ষ্য করে দেখেছি, এই ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করতে তিন থেকে পাঁচ মিনিট সময় লেগে যায়।

এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জেলের ছোট নয় ফুট উঁচু দেওয়াল থেকে স্নুরু করে ছোট-বড় দেয়ালের মধ্যস্থ ২৫ হাত খালি জায়গা পার হয়ে ১৭।১৮ ফুট উঁচু দেওয়াল টপকাতে হবে এবং তারপর উঁচু দেয়ালের বাইরে গঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত খালি জায়গা থেকে—প্রায় ৫০।৬০ হাত—বর্ষার গঙ্গার ওপার পর্য্যন্ত সবগুলিই তিন মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে হবে, নইলে আমরা সমগ্র জেল ও পুলিশ বাহিনীর সম্মুখীন হব এবং আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

সমস্ত রকম চুল চেরা হিসাব করে আমরা দেখেছি, সবাইর পক্ষে তিন মিনিটের মধ্যে গঙ্গার ওপারে পৌঁছানো সম্ভব নাও হতে পারে। তাই ঝড় বাদলের স্নুযোগ নিয়ে পালানোর চেষ্টা করতেই আমরা মন স্থির করলাম।

সেলের ভিতর নিয়মিত অভ্যাস ও মহড়ার পরীক্ষা চলছে। ঘড়ি ধরে সময়ের হিসাব নেওয়া সম্ভব হয়নি। বিচারাধীন আসামী অথবা দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের কাছে ঘড়ি রাখার নিয়ম

ছিলনা তাই সময়ের হিসাব শ্বাস-প্রশ্বাসের নিরীখে নিয়েছি—এক কথায় একে বলা চলে নাড়ীর জ্ঞানে সময়ের হিসাব।

ঝড় বাদলের পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়, আবহ্‌তথ্য থেকে। দৈনিক পত্রিকায় আবহ্‌তথ্য প্রকাশিত হয়। বিচারাধীন প্রথম শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে আমরা একখানা ইংরাজী ষ্টেট্‌সম্যান কাগজ নিজ খরচে পেতাম। আমাদের সঙ্গে মামলার বিচারাধীন আসামী ছিলেন বন্ধুবর দ্বিজেন রায়। দ্বিজেন রায় ছিলেন বৈজ্ঞানিক। বিস্ফোরক পদার্থ থেকে সুরু করে বিপ্লবী দলের প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য তাঁর কাছ থেকে আমরা পেতাম। আমাদের নিজস্ব দল ছাড়াও অন্যান্য দলও তাঁর সাহায্য নিতো। বিপ্লবী দলের পুরানো বিশ্বস্ত কর্ম্মী হিসাবে তাঁর খ্যাতি ও সুনাম ছিলো। আবহ্‌তথ্য পড়ে মোটামুটি ধারণা দেওয়ার ভার ছিল তাঁর উপর। তিনি নিয়মিত ভাবে আবহ্‌তথ্যের আভাস দিয়ে যেতেন।

বক্সা দুর্গের কমাণ্ডাণ্ট কটাম সাহেবকে মারবার অভিযোগে জলপাইগুড়ি জেলে মামলা চল্‌বার সময় ১৯৩১ সালে অজিত বসুর সঙ্গে সঙ্কেতলিপি মারফত আমার পরিচয় ঘটে—অজিত বসু তখন জেলার পার্টি সংগঠক। সেখান থেকে পালাবার প্রচেষ্টার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। ১৯৩২ সালে রাজসাহী জেলে বন্দীদের উপর অত্যাচারের জবাব দেবার জন্য একখানা চিঠি সংগোপনে উত্তরবঙ্গের স্থানীয় সংগঠন মারফত পাঠিয়েছিলাম। চিঠি পেয়ে জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অজিত বসু তখন কেন্দ্রীয় সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। বন্ধুবর প্রভাত চক্রবর্ত্তী ও জিতেন

গুপ্ত তখন পালিয়ে এসে সংগঠনের ভার নিয়েছেন। প্রভাত চক্রবর্ত্তী জিতেন গুপ্তের সঙ্গে পরামর্শ করে কুমিল্লার সুধীর ভট্টাচার্য্যকে নিয়ে উত্তরবঙ্গে চলে আসেন এবং সেখানকার নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী ক্ষিতীশ দেব ও অন্যান্য বিশিষ্ট কর্ম্মীদের—সত্য চক্রবর্ত্তী, বাণী চক্রবর্ত্তী, ভোলা সরকার প্রভৃতির সাথে দেখা করেন এবং সুপারিন্টেডেন্ট লিউক সাহেবের ওপর আক্রমণ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করবার জন্য প্রভাত দত্ত, ভোলা রায় ও সুধীর ভট্টাচার্য্যকে ভার দেওয়া হয়। সন্ধ্যার সময় লিউক সাহেব নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে মোটর গাড়ী নিয়ে যাবার সময় ভোলা রায় সাইকেল দিয়ে গাড়ীখানাকে থামিয়ে দিতে সমর্থ হয় এবং প্রভাত দত্ত পরপর গুলি চালিয়ে লিউক সাহেবকে ভীষণভাবে জখম করে। পুলিশ ভোলানাথ রায়কে আততায়ী সন্দেহে গ্রেপ্তার করে এবং লিউক সুটিং মামলায় তাকে সাত বৎসর সাজা দিতে সক্ষম হয় কিন্তু পুলিশ প্রভাত দত্তকে সন্ধান করেও তখন বের করতে পারেনি। পরে সে ধৃত হ'লে প্রমাণাভাবে পুলিশ তাহাকে অন্তরীন করতে বাধ্য হয়েছিল। সুধীর ভট্টাচার্য্য আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার আসামী শ্রেণীভুক্ত হয়ে এসেছিল কিন্তু লিউক সুটিং-এ যে তার সক্রিয় অংশ ছিল পুলিশ তা শেষ পর্য্যন্তও জানতে পারেনি যদিও তৃতীয় ব্যক্তির খোঁজ তারা করে বেড়াচ্ছিল।

১৯৩৪ সালে অজিত বন্দ্ব আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী। জেল থেকে পালাবার পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলবার জন্য তাঁর উপর ন্যস্ত বৈপ্লবিক দায়িত্ব সে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যেতে লাগল।

চৌদ্দ

এদিকে পালাবার প্রথম পর্য্যায়ের মহড়া নিয়মিত ভাবেই চলেছে। 'বম-ইয়ার্ডে' তিনজন—নিরঞ্জন ঘোষাল, হরিপদ দে ও লেখক মহড়ার শিক্ষা নিতো। মাঝে মাঝে অপরাপর বন্ধুরাও ১৩।১৪ নম্বর ডিগ্রি হতে এসে অতি সঙ্গোপনে একত্রে শিক্ষা নিতো। বম-ইয়ার্ডের ডিগ্রির বাইরের বারান্দায় একখানি সংবাদপত্র হাতে নিয়ে অজিত বসু অফিসার ও সিপাহীদের গতিবিধি লক্ষ্য করতো।

বম-ইয়ার্ডের শিক্ষা সমাপ্ত করে ছুটির দিন অপরাহ্নে আমরা আবার ১৩।১৪ নম্বর ডিগ্রীতে একত্র হতাম- -আত্মপক্ষ সমর্থনের অছিলায়। সেখানে আবার একদফা নূতন করে ডিগ্রীর অভ্যন্তরে সত্যেন্দ্র মজুমদার, ভোলানাথ দাস, সীতানাথ দে ও অমূল্য সেনের সঙ্গে মহড়ার শিক্ষা চল্‌তো। দিনের পর দিন আমরা এইভাবে শিক্ষাকার্য্য চালিয়ে যেতাম।

আমরা দিন গুন্‌ছি—অনুকূল ঝড়ো হাওয়ার সাগ্রহ প্রতীক্ষায়। কিন্তু হাওয়ার দেবতা মাঝে মাঝে আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও এপর্য্যন্ত পালাবার সময় সম্বন্ধে কোনও বিচার করেননি। একমাত্র ছুটির দিন অপরাহ্নে তার অনুকূল দর্শন না

পেলে আমরা যে তার সহযাত্রী হতে পারবোনা, সে ধারণা তার তখনও হয়নি। কখনও অপরাহ্ণ বেলার এপারে, কখনও রাত্রির অন্ধকারে, আবার কখনও বিচারালয়ের কাঠগড়ার অভ্যন্তরে ঝড়ের আহ্বান এসেছে কিন্তু আমরা তখন বন্দী-শালার বদ্ধ কারাগারে পাহারাদারের সতর্ক ব্যবস্থার মধ্যে অচল বা নিশ্চল হয়ে রয়েছি। এদিকে বর্ষার দিনগুলিতো প্রায় শেষ হতে চল্‌লো—আর তো সময় নেই! আমরা ভাবছি—অনুকূল আবহাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে সোজাসুজি এক নির্দিষ্ট দিনে ঝাঁপিয়ে পড়ব কিনা!

পালাবার প্ল্যান সম্বন্ধে অন্যান্য যাবতীয় খুঁটিনাটি ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ হয়েছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার আনুকূল্যে অথবা দুপুরবেলাকার মাথা ভাঙ্গা রোদের মাঝে—যেভাবেই আমরা চেষ্টা করিনা কেন ঠিক হয়েছে যে ছোট দেয়াল ডিঙ্গিয়ে যুগপৎ দুটি সারিতে আমরা বড় দেয়াল পার হব। এক সারিতে থাকবে—হরিপদ দে, নিরঞ্জন ঘোষাল ও লেখক; অন্য সারিতে থাকবে—ভোলানাথ দাস, সত্যেন্দ্র মজুমদার ও সীতানাথ দে। সারি দুটির সর্ব্ব নিম্নে থাকবে—হরিপদ দে ও ভোলানাথ দাস। তাঁদের আমরা সংক্ষেপে base man অথবা ভিতের মানুষ বলতাম। ভিতের লোক হতে হলে অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ হওয়া দরকার, তাই তাঁরা ভিতের ভার নিয়েছিল। ভিতের লোকের উপরে উঠবে এক সারিতে নিরঞ্জন দে ও অপর সারিতে সত্যেন্দ্র মজুমদার, আবার তাদের উপর উঠবে এক এক সারিতে লেখক ও অন্য সারিতে সীতানাথ দে। অপেক্ষাকৃত

লঘু দেহ বলে লেখকের ও সীতানাথ দের ভাগ্যে জুটেছিল শীর্ষস্থান—লঘু দেহের প্রতি তাচ্ছিল্য বশতঃই হোক্ অথবা সম্মান বশতঃই হোক্ বন্ধুরা তা স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ করেছিলো।

সারি দুইটিকে বহিঃপ্রাচীরের প্রাচীর-রক্ষীদের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য ঠিক হোল, অমূল্য সেন প্রথমতঃ তার সমগ্র শক্তি দিয়ে—প্রয়োজন হলে তার জীবনের বিনিময়ে—রক্ষীদের প্রতিরোধ করবে যতক্ষণ না প্রাচীরের ভিতর দিক্ হতে বন্ধুরা প্রাচীরের অপর পারে পৌঁছাতে পারে। অমূল্য সেন দৈহিক বলিষ্টতাব জন্য যেমন পরিচিত ছিলো, তেমনি সাহসের জন্য ও তার খ্যাতি ছিলো। বয়সে নবীন হলেও সহিষ্ণুতারও অভাব তার ছিল না। সাগ্রহ চিত্তে ও হাসিমুখে সে তার ওপর ন্যস্ত কাজের ভার বুঝে নিল।

বড় প্রাচীরের গাঁ ঘেসে জেলের ভিতর দিক থেকে একটি পায়ে হাঁটার রাস্তা সমস্ত জেলকে প্রদক্ষিণ করে চলে গেছে—সিপাহী ও অফিসারদের প্রাচীর পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্যই রাস্তাটি ব্যবহৃত হতো। রাস্তার মাঝে মাঝে রয়েছে দেয়াল প্রহরী। আবার এই রাস্তাকে স্থানে স্থানে উঁচু লৌহ গরাদের বেড়া দিয়ে খণ্ডিত করেছে। বেড়ার গায়ে রয়েছে লোহার দরজা—কোথাও দরজা অর্গল বন্ধ আবার কোথাও তাহা উন্মুক্ত। প্রাচীর প্রহরীদের মধ্যে জেলের সাধারণ সিপাহী ছাড়াও কয়েদী হতে বাছাই করে এক দলকে প্রহরীর কাজে লাগাবার ব্যবস্থা ছিলো। তাদের অনতিদূরেই ছিল সরকারী সিপাহীর ব্যবস্থা। প্রাচীরকে রক্ষা

করবার ভার ছিলো উভয় শ্রেণীর কিন্তু সরকারী সিপাহীদের প্রাচীরের ওপর নজর রাখবার সাথে কয়েদী প্রাচীর-প্রহরীদের ওপরও নজর রাখার কাজ ছিলো। জেলের ভিতরকার এই রাস্তার সাহায্যে কয়েদী প্রাচীর-প্রহরীরা যাতে নিজেদের গণ্ডীর বাইরে জেলের অন্য স্থানে না যেতে পারে তার জন্য সিপাহী প্রহরী কয়েদী প্রহরীর দিকের লোহার দরজাটি তাদের দিক হতে তালা দিয়ে বন্ধ করে দিত। প্রাচীর রক্ষার কাজে এতদিন তাতে কোনও বিঘ্ন হয়নি।

১৩।১৪ নম্বর ডিগ্রীর ছোট দেয়ালের অপর পারে বড় দেয়াল থেকে টেনে দুইটি লোহার বেড়া দুই দিক হতে এসে ছোট ও বড় দেয়ালের মাঝখানটায় যে একটি নিভৃত স্থান সৃষ্টি করেছিল ঠিক সেখানটায় কোনও প্রহরী ছিলনা। এই লম্বা-চওড়া ৪০।৫০ হাত মাঝখানটির খালি জায়গাই ছিলো আমাদের বড় দেয়ালে পৌঁছবার পথ। লোহার বেড়ার উভয় পারেই রয়েছে প্রহরী—একদিকে কয়েদী প্রহরী, অন্যদিকে সিপাই প্রহরী। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কয়েদী প্রহরী তাঁর নির্দ্দিষ্ট স্থানটিকে পাহাড়া দিত। বড় প্রাচীরের গাঁ ঘেসে তালপাতার তৈরী ছাতার নীচে ছিল তার বস্‌বার জায়গা—সঙ্গে থাকত কয়েদীর সম্বল অর্থাৎ কম্বল, গামছা, বাটি ও পানীয় জলের ব্যবস্থা। মাথা-ফাঁটা রোদই হোক অথবা বিরামহীন বৃষ্টিই হউক সকাল হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তার নির্দ্দিষ্ট স্থানটি ত্যাগ করবার জো ছিল না। দূর হতে প্রাচীরের সিপাহী-প্রহরীরা যেমন তার ওপর নজর রাখতো তেমনি জমাদার,

সার্জ্জেণ্টের দল যে কতবার তার 'ডিউটী' দেখতে আস্তো তার ইয়ত্তা ছিল না। বিনিময়ে সে পেতো কারা আইনের নিয়মানুযায়ী তার কয়েদের দিনগুলির আংশিক হ্রাস—মুক্তির দিন এভাবে বৎসরে দুই তিন মাস পর্য্যন্ত তার এগিয়ে যেতো।

প্রাচীরের বজ্রবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রাচীরের কাছেই তাই তার আত্মসমর্পণ। নিঃসঙ্গ দেয়ালকে সঙ্গী করে কখনও দাঁড়িয়ে, কখনও বা বসে সে স্বপ্ন দেখতে বাইরের যেখানে সে ফেলে এসেছে তার জীবনপ্রবাহ। তাকে ফিরে পাবার জন্য জেল জীবনের মধ্যে আবরণহীন অর্দ্ধ উলঙ্গ রূপ নিয়ে মানুষের যে স্পর্শ ছিলো তা থেকেও সে নিজেকে বঞ্চিত করে প্রাচীর প্রহরীর নিঃসঙ্গতা বরণ করে নিয়েছিলো যেন তার মুক্তির দিন সহজ হয়ে আসে। মেয়াদ হ্রাসের এই দিনগুলি তাই তার নিকট ছিলো অতি মূল্যবান—জীবনের চেয়েও মূল্যবান মনে হ'তো।

ডিগ্রীর ভিতর থেকে পালাবার সময় প্রথমেই আমরা বাধা পাব সেখানকার সিপাহী, জমাদার, সার্জ্জেন্ট সুবাদারদের তরফ থেকে। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনকে কড়া নজরে ও সংযত রাখার উদ্দেশ্যে ইংরাজ শাসন কর্ত্তৃপক্ষ বাংলার সেণ্ট্রাল জেল-গুলোতে প্রথম মহাযুদ্ধের রণক্ষেত্রের ফেরতা ও সরকারী পেন্সনভোগী একদল সুবাদার শ্রেণীর সামরিক পাঞ্জাবী অফিসারকে আমদানী করেছিল। তাদের অনেকেই 'ফ্লাণ্ডার্স' যুদ্ধক্ষেত্রে অসম সাহসিকতার জন্য সম্মান-পদক ভূষিত। জেলের সিপাহীদের কড়াভাবে পাহাড়া দেবার দায়িত্বে সজাগ করে রাখার ভার ছিল তাদের

ওপর। সুবাদার শ্রেণীর মধ্য হ'তে একজনকে বাছাই করে সেদিন মোতায়েন করেছিল ১৩।১৪ নম্বর ডিগ্রীতে। এদের বাধা এড়াবার জন্য আমরা ঠিক করেছি যে যদি একই সঙ্গে আমরা সাত জন ছোট প্রাচীর অতি দ্রুত পার হয়ে যেতে পারি তবে এরা কেউই আমাদের রুখ্‌তে পারবে না। অন্যান্য বিপ্লবী বন্ধুদের অরক্ষিত অবস্থায় রেখে আমাদের অনুসরণ করাও এদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। উপরন্তু দেয়াল টপকানোও শিক্ষা সাপেক্ষ। একমাত্র ছুটাছুটি, চীৎকার, পাগলাঘন্টি ও বাঁশি বাজিয়ে তারা সাহায্যের আবেদন জানাবে মাত্র।

পনের

অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত দিবসের যেন ইঙ্গিত পেলাম। আগষ্ট মাসের শেষ তারিখে (৩১শে আগষ্ট, ১৯৩৪ সাল) প্রাতঃকালীন ইংরেজী ষ্টেটম্যান্স কাগজখানায় আবহ্‌তথ্যের পূর্ব্বাভাসের রিপোর্টে অপরাহ্নের দিকে প্রবল ঝড় বাদলের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ ছিলো। সকাল বেলা থেকেই আকাশের গায় এলোমেলো ভাবে ছড়ান রাশি রাশি সাদা মেঘ দূর হতে দূর গগনে উড়ে বেড়াচ্ছে। তাদের আহ্বানে দিক্‌চক্রবাল থেকে অনন্ত মেঘের পুঞ্জ মহাকাশের শূন্যতা ভরে দিতে লাগল। অসীমের নীল আকাশ ঢাকা পড়ল মেঘের আবরণে। সূর্য্যের স্তিমিত আভা নিঃশেষ হয়ে এলো।

আমরা কয়জন বম-ইয়ার্ড থেকে ১৩।১৪ নম্বর ডিগ্রীতে যাবার অনুমতি নিয়ে সিপাহীর প্রতীক্ষায় বসেছিলাম। সিপাহী যখন এলো তখন অপরাহ্নের দিকে বেলা গড়িয়ে গেছে। ১৩।১৪ নম্বর ডিগ্রীর গেট্‌-প্রহরী আমাদের নিয়ম মাফিক্‌ তল্লাসী করবার পর ডিগ্রীর আঙিনায় প্রবেশের অনুমতি দিল। ডিগ্রীর বন্ধুরা আমাদের অপেক্ষায় আঙিনাতেই দাড়িয়ে ছিল। সামান্য আকার ইঙ্গিতে কথাবার্ত্তা বলে আমরা ডিগ্রীর ভিতর মহড়া দেবার জন্য ঢুকে পড়লাম। মহড়া শেষ হলো। তারপর পরবার চারখানা ধুতিকে দড়ির মত করে পাকিয়ে কয়েক হাত অন্তর

কয়েকটি শক্ত গাঁট বেঁধে দিলাম। দুখানা ধুতি দিয়ে একটি করে দড়ি তৈয়ার হ'লো। আমরা আর দেরী না করে ডিগ্রীর ভিতর থেকে বাইরের আঙিনায় এলাম।

আসন্ন দুর্যোগের ছায়া পৃথিবীতে নেমে এসেছে। মেঘের ঘন আবরণ পৃথিবীকে ঢেকে দিয়ে আমন্ত্রণ জানালো দিকে দিকে—ছুটে এলো পাগলা হাওয়া উন্মত্ত বেগে। গাছপালাগুলি তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেন ছুটে বেড়াতে চায়। আকাশের গা চিড়ে মেঘের বুক থেকে বিদ্যুৎ ঝলক্ মুহুর্মুহু রাঙিয়ে দিচ্ছে বিশ্বচরাচর—অনন্ত যাত্রাপথে আলোক বিচ্ছুরণ। ঠিক্ এমনি সময়ে "আমিও যাব" "আমিও যাব" বলতে বলতে ছুটে এলো ডিগ্রীর ছোট প্রাচীরের দিকে আমাদেরই অপর একজন বন্ধু জ্যোতি মুকুল ঘোষ। পালাবার পরিকল্পনা নির্দ্দিষ্ট লোক ছাড়া কেউ জানতো না। দশ বার জন বন্ধুই শুধু জানত কিন্তু না জেনেও জ্যোতির বিপ্লবী মন বুঝতে পেরেছিল যে আমরা পালাবার আয়োজন করেছি এবং আজই তা সম্পূর্ণ হতে যাচ্ছে—তাই সাময়িক উন্মাদনায় তার মনের বাঁধন খুলে গেছে। যাবার জন্য তার নাম নির্দিষ্ট ছিল না। তাঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে সুবাদারের জিম্মায় অসুস্থতার অজুহাতে জেল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো। সুবাদার তাকে পৌঁছে দিয়েই অবিলম্বে ফিরে এলো।

সুবাদারের মনে সংশয় এসেছে—বাংলা দেশে বিপ্লবীদের অসম-সাহসের কত ঘটনা সে ঘটতে দেখেছে—কত বীর ফাঁসীতে গেছে, আর কতই না গেছে, দীপান্তরে। জেলের ভিতর তাদের

শক্ত বাঁধুনি দিয়ে ধবে রাখার কাজ হলো তার। বিপ্লবীরা দুর্যোগের প্রলংকরী আবহাওয়ার মধ্যে কি করবে কে জানে! জেলের আনাচে কানাচে বিপ্লবের রক্ত-শক্ত-দল। দীনেশের তাজা রক্ত এখনো শুকোয়নি! তাই সে ডিগ্রীর আঙিনায় ত্রস্তপদে সিপাহীদের সতর্ক করে দিয়ে সাবধান দৃষ্টি রেখে পাহাড়া দিচ্ছে।

ঝঞ্ঝার গতিবেগ বেড়েই চলেছে, পৃথিবী কেঁপে কেঁপে উঠছে। এবার মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এলো। মেঘের গর্জ্জন, বিদ্যুতের ঝলকানি, উন্মত্ত পাগলা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি এসে যেন অকালে কালবৈশাখীর আহ্বান জানালো—তারই সাথে সাথী হয়ে দিগন্তে ছুটে বেড়াবার জন্য। প্রহরীদের মনকে সাময়িকভাবে ভোলাবার জন্য আমরা ডিগ্রীর ভিতর প্রবেশ করলাম। তারা আশ্বস্ত হয়ে ডিগ্রী ও উপডিগ্রীর আঙিনার দরজাগুলো নামমাত্র বন্ধ করেদিয়ে বাইরের আঙিনায় পাহাড়া দিতে সুরু করলো।

এবার পালাবার সিগন্যাল পড়ে গেলো—এক-দুই-তিন। আমরা সবাই হরিপদ, নিরঞ্জন, সত্যেন, ভোলানাথ, সীতানাথ, অমূল্য ও লেখক ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছি ছোট প্রাচীরের দিকে। প্রাচীর পার হতে যাচ্ছি এমনি সময়ে ডিগ্রীর ভিতর থেকে এক কয়েদী পাহাড়াদারকে হঠাৎ সামনে দিয়ে বাহিরের আঙিনার ভেজান দরজার দিকে ছুটে যেতে দেখে বন্ধুদের সন্দেহ হল যে সে সুবাদার ও সিপাহীদের পালাবার খবর পৌঁছাতে যাচ্ছে। মূহূর্ত্ত দেরী না করে বন্ধুরা তাকে ক্ষিপ্রগতিতে ধরে

সেলে ভিতর টেনে নিয়ে গেল এবং তারপর মেঝেতে চীৎকরে ফেলে দিয়ে তার মুখে কাপড় গুঁজে হাত পা বাঁধতে শুরু করে দিল। ঠিক এমনি সময়ে আমিও তাদের সামনে এসে পড়ি এবং 'সময় নেই' 'সময়নেই' বলে হুসিয়ার করে দিতেই বন্ধুরা তৎক্ষণাৎ কয়েদীকে ছেড়ে দিয়ে আদেশ দিল যেন সে সেলের দেয়ালের দিকে মুখ করে চোখ বুজে বসে থাকে। কয়েদীটি সেই ভাবেই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই পরপর অতি সহজেই ছোট দেয়াল পার হয়ে গেলাম। পার হবার সময় দেখতে পেলাম কয়েদীটি আঙিনার দরজা খুলে যেন ছুটে বের হয়ে গেল। কানে ভেসে এলো—প্রবল উৎকণ্ঠায় নিরুপায় হাবিলদার ও সিপাহীর দল সেলের আঙিনা থেকে সমস্বরে আর্ত্তনাদ করছে—"আসামী ভাগতা হ্যায়" "আসামী ভাগতা হ্যায়"। আশেপাশের অন্যান্য সিপাইরাও বাঁশী বাজাতে সুরু করেছে। পর্য্যবেক্ষণ-গম্বুজের দৃষ্টি পড়েছে।

একদিকে ঝড় বাদলের রুদ্র তাণ্ডবের সাথে ভয়ার্ত্ত প্রহরীদের বাঁশীর শঙ্কা-ধ্বনি, অন্যদিকে শৃঙ্খল ভেঙ্গে জাতির মুক্তি সাধনে বিপ্লবের অভিযাত্রীদের সাথে দেশী ও বিদেশী অত্যাচারী শাসক শ্রেণীর নগ্নশক্তি প্রয়োগের ব্যাপক প্রস্তুতির ব্যবস্থা। উন্মত্ত প্রকৃতি তার সমগ্র শক্তি দিয়ে যেন মুক্তির পথকে রক্ষা করছে। ঝড়, বাদল ও বজ্রের শক্তি আমাদের দেহে সঞ্চারিত। চকিতে পৌঁছে গেলাম বড় দেয়ালের গায়। দূর হতে দেখা যাচ্ছে, বন্ধুবর অমূল্য সেন তার সুদীর্ঘ, সুন্দর ও বলিষ্ঠ দেহ মন নিয়ে লোহার দরজা আগ্‌লিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর ওপারের

সিপাইব সঙ্গে তাব ঝুটোপাটি ও লড়াই চলেছে। প্রথম সারিতে বন্ধুবর হরিপদ দের গা বেয়ে নিরঞ্জন ঘোষাল ঝটিতে উঠে যেতেই আমিও তৎক্ষণাৎ দড়ির এক কোন দাঁতে চেপে হবিপদদের গা বেয়ে নিরঞ্জনের কাঁধে চড়ে গেলাম। হরিপদ দে পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে সামান্য একটু উঁচু হয়ে দাড়াতেই অতি সহজে হাত বাড়িয়ে দেয়ালের শীর্ষে উঠে পড়লাম। ওপাশে দ্বিতীয় সারির দিকে দৃষ্টি দিয়ে উপরের নিকে নজর দিতেই দেখ্‌তে পেলাম সু-উচ্চ গম্বুজ ঘবের সিপাহীদের অস্বাভাবিক চঞ্চলতা। গম্বুজ শীর্ষে মোতায়েন সিপাহীবা ঝোলান বৃহৎ ঘণ্টাটি জোর হতে জোরে দ্রুততালে ঢং ঢং ঢং শব্দে বাজিয়ে চলেছে—গম্ভীর হতে গম্ভীরতর উম্মাদনায়। ঝড়ের রুদ্র তাণ্ডবের কাছে তাদের প্রচেষ্টা মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসের গায়। বিপদজ্ঞাপক লাল নিশানা ও বিপদের দিক্ দেখাবাব বোর্ডগু ল টানিয়ে দিয়েছে—জেলের সদর রাস্তার দিকে যেখান হতে ছুটে আসবে সাহায্য-বাহিনী।

দড়ির কোনটি হাতে নিয়ে প্রাচীর থেকে লাভ দিয়ে বাইরে পড়লাম, ঘাসে ভরা ভিজে মাঠেব ওপর। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে দড়ির কোনটী শক্ত করে ধরে রইলাম। মুহূর্ত্তের মধ্যেই নিবঞ্জনও দড়ি বেয়ে এপারে নেমে এলো। নিবঞ্জনেব হাতে দড়ির কোনটী দিয়ে গঙ্গার দিকে ছুটে গেলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হরিপদ দে ও নিরঞ্জন ছুটে এলো গঙ্গার কিনাবায়। গঙ্গায় ঝাপ দিতে যাচ্ছি এমনি সময়ে সীতানাথ দেও ছুটে এসে হাজির হলো। জলে ঝাঁপ দেবার সময় সীতানাথ দে বলে গেলো সত্যেন মজুমদার ও ভোলানাথ দাস দড়ি

বেয়ে দেয়ালে উঠতে না পারায় সে দড়ি ছেড়ে দিয়ে একাই ছুটে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। বোধকরি অমূল্য সেনের ব্যূহ ভেদ করে সিপাহীর দল প্রাচীরের গায়ে এসে পড়েছে এবং বন্ধুদ্বয় সত্যেন মজুমদার ও ভোলানাথ দাসের দেয়ালে উঠ্‌বার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

ষোল

সাগরের বাণী নিয়ে জোয়ার এসেছে, জোয়ারের বাণের সাথে ঝড় বাদলের অবিশ্রান্ত জলরাশি মিশে কালীঘাটের মরা গাঙ্গকে ভরা গাঙ্গে পরিণত করেছে। উচ্ছল জলরাশি গঙ্গার বক্ষে ঢেউ তুলে ঝড়ের সাথে ছুটে চলেছে। প্রৌঢ় সীতানাথ দে তাঁর লঘু দেহ নিয়ে তরতর করে সাঁতার দিয়ে নদী পার হয়ে গেলো। হরিপদ ও নিরঞ্জন একই সাথে ওপারে উঠে গেলো। আমিও তীরের দিকে এগোচ্ছি কিন্তু স্রোতের টানে আমার দুর্ব্বল দেহ কালীঘাট পুলের দিকে ভেসে চলেছে। তীরে পৌঁছতে আমার খানিকটা দেরী হতে পারে ভেবে বন্ধুদের জল থেকেই চলে যেতে নির্দ্দেশ দিলাম কিন্তু বন্ধুরা—হরিপদ দে ও নিরঞ্জন ঘোষাল—আমার কথা না মেনে আবার জলে নেমে পড়ল এবং তাঁরা তাদের হাত থেকে গামছার একটি কোন আমার দিকে বাড়িয়ে দিতেই আমি তার সাহায্যে তীরে উঠে পড়লাম। তীরে উঠেই জেলের দিকে এক পলক দৃষ্টি হেনে বুঝতে পারলাম যে সশস্ত্রবাহিনী প্রাচীর রক্ষার্থে তখনও এসে পৌঁছায়নি। পালাবার পর থেকে চার মিনিটের মত সময় পার হয়ে গেছে—রক্ষীদের পৌঁছবার সময় আসন্ন প্রায়। ওপার হতে আমাদের দেখতে পেলেই 'শিকার' লক্ষ্য করে তাদের

বন্দুকগুলি গর্জে উঠবে তাই মুহূর্ত্তও অপেক্ষা না করে বিদ্যুৎবেগে হিন্দু মিশনের গা বেয়ে ছোট্ট একটি রাস্তা ধরে হরিশ চাটার্জ্জী ষ্ট্রীটে ছুটে আমরা বের হয়ে পড়লাম।

কল্‌কাতার জনমুখর ও যানবহুল রাস্তা—প্রবল বর্ষার ধারার তলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জনপ্রাণীর বা যানবাহনের চিহ্ন মাত্র কোথাও দেখা যায় না। রাস্তার মোড়ের পুলিশ-পাহাড়াদাররা অন্তর্ধান হয়েছে। একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী প্রলয়ের দেবতা। ঝড় ও বৃষ্টি মাথায় নিয়ে একহাঁটু জল ভেঙ্গে ঘুমন্তপুরীর মত সারি সারি অট্টালিকাগুলির পাশ কাটিয়ে আমরা শহর থেকে বিভিন্ন দিক দিয়ে বের হয়ে যাবার জন্য এগোতে সুরু করেছি। সীতানাথ দে একাকী চলে গেল হাওড়ার দিকে; হরিপদ দে দক্ষিণ কল্‌কাতার উপকণ্ঠে কস্‌বার দিকে। নিরঞ্জন ও আমি ছুটে চলেছি ভবানীপুরের দিকে। সেখানে থানার নিকটে পৌঁছেই অপেক্ষমান একখানা ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে চড়ে বসলাম। থানার দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারলাম যে থানার নীরবতা ভগ্ন হয়নি, পালাবার সংবাদ তাদের নিকট তখনও পৌঁছায়নি। ট্যাক্সিখানা আঁকাবাঁকা রাস্তা বেয়ে ছুটে চললো উল্টাডাঙ্গার দিকে। উল্টাডাঙ্গা ষ্টেশনের নিকট পৌঁছেই ট্যাক্সিওয়ালাকে ভাড়া চুকিয়ে বিদায় দিলাম। অতি সংগোপনে ও সযতনে অয়েল পেপার দিয়ে মুড়ে রাখা কয়েকখানি এক টাকার নোট সঙ্গেই ছিল। বর্ষার বা গঙ্গার জলে নোট কয়খানি নষ্ট হয়নি। নিকটেই এক পার্টি বন্ধুর বাসা ছিল। তাঁকে না পেয়ে দূর থেকে রাণাঘাটগামী একখানা লোকাল

ট্রেন ষ্টেশনে আস্‌ছে দেখে ছুটে গিয়ে আমরা তাতেই উঠে বসলাম।

আমরা আগে থেকেই ঠিক করেছিলাম যে কলকাতা সহরের উপকণ্ঠে আশ্রয় নেব। কলকাতা সহর গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রস্থল। স্পেশাল্‌-ব্রাঞ্চ ও ইনটেলিজেন্স্‌-ব্রাঞ্চ গোয়েন্দা বিভাগদ্বয় বিপ্লবীদের সকল রকম কেন্দ্র ও আড্ডাগুলিকে চষে বেড়াচ্ছে। যুগান্তর, অনুশীলন, বি, ভি প্রভৃতি বিপ্লবীদলের চিহ্নিত ও সন্দেহভাজন কর্ম্মীদের ওপর শ্যেনদৃষ্টি রেখেছে। পালাবার অল্প সময়ের মধ্যেই—আনুমানিক আধ ঘণ্টার মধ্যে—কলকাতার প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি, রেল ষ্টেশন ও দ্রুতগামী যানবাহন সবই পুলিশের ব্যাপক সন্ধান ও তল্লাসীর মধ্যে এসে যাবে। গোয়েন্দা পুলিশ ও সাধারণ পুলিশ তাদের যুক্ত সন্ধানী দল উপদল নিয়ে বিপ্লবীদের আড্ডা, মেস্‌ ও বোর্ডিং ছেয়ে ফেলবে এবং তাদের সাহায্য করবার জন্য রাইফেলধারী বাহিনী ছুটবে—পুলিশের গাড়ী নিয়ে রাস্তায় রাস্তায়।

পুলিশের অসংখ্য গুপ্তচর বাহিনী এবং দেশদ্রোহীর দল সঠিক অথবা কাল্পনিক খবর দেবার জন্য অন্ধকার গুহা থেকে প্রভুদের নিকট এসে হাজির হবে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন দানা বাঁধবার সাথে সাথে দেশদ্রোহীর দল গজিয়ে উঠেছিল—আগাছারই মতন জাতির বুকের পাঁজরের মধ্যে। জাতির শক্তিমান অংশকে নির্জীব ও শক্তিহীন করে দিয়ে তারা নিজেদের ও পরিবারের উদরপূর্ত্তি করতে সংশয় করতোনা। সম্প্রতি এদের

ধরাছোঁয়ার বাইরে যাবার জন্য আমরা সহরের বাইরে ছুটে চলেছি।

ট্রেন খানায় তেমন ভিড় ছিলনা। ঝড়ের প্রচণ্ডতা থেমে গেছে কিন্তু বৃষ্টি তখনও মুষলধারায় পড়ছিল। আমাদের পরণে ধুতি ও ফতুয়া ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। সারা গাঁ বেয়ে অঝোরে জল ঝরে পড়ছিল। এমন বেহদ্দ ভিজে জামা কাপড় নিয়ে কেউ যে গাড়ীতে সওয়ার হ'তে পারে যাত্রীরা অনেকেই হয়তো ভাব্‌তেও পারেননি। গাড়ীর প্লাট্‌ফরম তো জলে ভরে গেল। অবাক হয়ে অনেকেই এমন করে ভিজে যাবার কারণ জিজ্ঞাসা করলো। জড়িতকণ্ঠে অতি সংক্ষেপে জবাব দিলাম—শ্মশান থেকে ফিরছি। জবাব শুনেই সহানুভূতিতে অনেকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে দূরে বসল। নিরঞ্জনের মুখে মুচ্‌কি হাঁসি দেখে তাব গাঁ টিপে দিয়ে মুখ নত করে বসে রইলাম যেন আমরা শোকে ম্রিয়মাণ হয়ে আছি কিন্তু আমাদের মনের ভিতর উভয়েরই অপ্রকাশে রয়েছে গভীর আশংকা।—যাত্রীদের মধ্যে অলক্ষিতে উপস্থিত কোনও গোয়েন্দা অফিসার আমাদের সুপরিচিত মুখ দেখ্‌লেই চিন্‌তে পারবে এবং শ্মশানের রহস্য বের হয়ে যাবে।

গাড়ী ছুটে চলেছে। পালাবার পর থেকে প্রায় এক ঘন্টা হ'তে চললো—অদূরেই শ্যামনগর ষ্টেশন্। শ্যামনগর পার হলেই ভাটপাড়ায় গাড়ী এসে যাবে। ভাটপাড়া ষ্টেশন মোটেই নিরাপদ নয়—ভাটপাড়া স্থানটি রাজনৈতিকগন্ধী। গোয়েন্দাদের আনাগোনার সম্ভাবনা তো এমনিই সেখানে আছে। সেখানে গাড়ী তল্লাসী হতে পারে। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই কল্‌কাতার ও

কলকাতার নিকটস্থ ষ্টেশনগুলিতে তল্লাসী সুরু হয়ে গিয়ে থাকবে। আমরা তাই আর বেশী দূর না এগিয়ে শ্যামনগর ষ্টেশনেই নেমে পড়লাম। ষ্টেশন গেটে ছাড়পত্রের জন্য এক টাকার দুইখানা নোট দিয়ে বাইরে এসেই জগদ্দলের দিকে পায় হেঁটে রওনা হলাম। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে দ্রুত এগিয়ে চলেছি—অদূরেই পুলিশের থানা। দূর থেকে থানার ভিতর অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য, যানবাহনের সমাবেশ ও বহু লোকের ব্যস্ততাপূর্ণ গতায়ত দেখা যাচ্ছে। দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে, বৃষ্টি থেমে গেছে। গোধূলির ছায়া নেমে এসেছে, পৃথিবীর ওপর। থানার রাস্তাটুকু সোজাসুজি ছুটে পার হয়ে গেলাম। শ্রান্ত দেহকে সজোরে টেনে চলেছি কিন্তু কিছুটা পথ যেতেই হঠাৎ দূর থেকে বিপরীতমুখী একখানা পুলিশের সশস্ত্র গাড়ী বেগে ছুটে আসছে দেখে আমরা প্রমাদ গুণলাম। স্পষ্টই দেখতে পেলাম যেন দূর থেকে সশস্ত্র গাড়ীখানা আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি হেনে অগ্রসর হচ্ছে কিন্তু তারা নিকটে এসে বিপ্লবীর মত অতটা ভয়ঙ্কর আমাদের দেখতে তাদের মনে না হওয়ায় সোজাসুজি শ্যাম্‌নগর থানার ভিতর গাড়ী নিয়ে ঢুকে গেলো। এরা 'খুঁজে' বেড়াচ্ছে। আমরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হেঁটে জগদ্দল শ্রমিক বস্তির ভিতর সত্বরই পৌঁছে গেলাম। এখানে পৌঁছে খানিকটা নিশ্চিন্ত মনে এগোতে সুরু করেছি। জগদ্দল বাজারের ভিতর দিয়ে রাস্তা চলে গেছে গঙ্গার পার ঘেষে, ভাটপাড়ার দিকে।

জগদ্দল বাজার—মজুরদের আনা-গোনার অন্ত নাই। উজ্জ্বল বিজলী আলোয় বাজার ও রাস্তা আলোকিত। দিনান্তে মজুরদের

পারস্পরিক আদর আপ্যায়ন তাদের গোষ্ঠী ছেড়েও পথচারীদের যেন সৌভ্রাত্রের আবেদন জানাচ্ছে। সোডা পানী, লাল ও নীল পানীয় জল, পান ও সিগারেটের ছড়াছড়ি। মলিন দেহ ও মলিন পোষাক পরিচ্ছদকে উপেক্ষা করে মানুষের অন্তরের রূপ যেন তাঁর পরিচয় জানাচ্ছে। সস্তা মালের বিপনিগুলি ঘিরে রয়েছে, মজুর ও মজুর গৃহিণীর দল—সস্তা মালের কেনাবেচার অন্তরালে সস্তা শ্রম-মূল্যের বিনিময়। অনতিদূরে বাজার পার হয়ে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের একদিকে রয়েছে এংলো-ইণ্ডিয়া জুট্ মিলসের প্রাসাদোপম অট্টালিকাশ্রেণী গঙ্গার পার ঘেঁষে, আর অন্য দিকে রয়েছে এংলো-ইণ্ডিয়া জুট্ মিলসের বাবুদের কোয়ার্টার নামে পরিচিত দ্বিতল গৃহশ্রেণী। এংলো-ইণ্ডিয়া জুট্ মিলস্ বাংলার পাটের ব্যবসাদার। পাট ও পাটজাত চট্ ও থলে তৈরী করে দুনিয়া জোড়া ব্যবসা গড়ে তুলেছে। মোটা মুনাফায় গড়ে তুলেছে বিদেশী ধণিকতন্ত্রের বিশাল ও দৃঢ় ভিৎ। আন্তর্জাতিক ধণিকতন্ত্রের মধ্যে পাটের ব্যবসাদাররা বিশিষ্ট গণ্য ও মান্য বলে পরিচিত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তাঁরা শক্তিশালী ধারক ও বাহক। তারই আশ্রয়ে রয়েছে সহস্র সহস্র কুলি মজুর আর বাঙ্গালী বাবুর দল—বংশ পরম্পরায় কেরাণীকুল নামে খ্যাত—বিদেশী ধণিকতন্ত্রের মুনাফার যোগানদার আর ভূখা মিছিলের ভবিষ্যৎ সহযাত্রী এঁরা।

বাজার ছেড়ে বাবুদের কোয়ার্টারের সামনে এসে হাজির হলাম। সেখানে অন্ধকারের এক কোনে দাড়িয়ে বাবু-কোয়ার্টারে পরেশ ব্যানার্জীর খোঁজ করতেই পরেশ এসে হাজির হলো।

পার্টি দরদী, স্বভাবে দিল্‌দরিয়া ও বেপরওয়া প্রকৃতির লোক বলে পরেশ পরিচিত ছিলো—নিরঞ্জনের বিশেষ পরিচিত ও বিশ্বাসী বন্ধু। অন্ধকার কোনে এসে আমাদের দেখেই অবাক্ হয়ে জড়িয়ে ধরে তার শয়ন কক্ষে নিয়ে গেলো। পরেশের আনন্দ যেন ধরে না! জামা কাপড বদ্‌লাবার জন্য সে তার নিজের জামা কাপড় নিয়ে এলো। ভিজে জামা কাপড় আমাদের গায়েতেই শুকিয়ে গেছে। স্নান সেবে জামা কাপড় পরে ঘরে ঢুক্‌ছি এমনি সময় পরেশের ছোট ভাই ভাটপাড়া থেকে এসে জানালো, যে ভাটপাডায় গাড়ী থামিয়ে অনেকক্ষণ তল্লাসী চলেছে। কলকাতার জেল ভেঙ্গে বিপ্লবীরা অনেকেই নাকি পালিয়েছে, তাদের ধরবার জন্য সর্ব্বত্রই তার বার্ত্তা এসেছে। কথা শুনে মনে হোল, আমাদের গাড়ীখানা বা পরবর্ত্তী গাড়ীখানা থেকেই তল্লাসী সুরু হয়েছে। আমাদের হিসাব নির্ভুল হয়েছিল। সময়মতই আমরা শ্যামনগর ষ্টেশনে নেমে পড়েছিলাম।

এবার মনে হোল, পিছে রেখে আসা বন্ধুদের কথা। সত্যেন্দ্র মজুমদার, ভোলানাথ দাস, অমূল্য সেন দেয়ালের গায় ধরা পড়েছে। তাঁদের জীবন রক্ষা হয়েছে কিনা সন্দেহ! সম্মুখ মৃত্যুর সাথে তাদের নিরস্ত্র লড়তে হবে। একমাত্র ভরসা তাঁদের মনোবল—"জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন"—এই মনোবলই হয়তো তাঁদের সবাসরি খুনের হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

সতের

হরিপদ ও সীতানাথ দে নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে তাদের আশ্রয়ে পৌঁছে থাকবে। তবুও তাদের সঠিক সংবাদের জন্য কলকাতায় লোক চলে গেল। গভীর রাতে সে ফিরে এসে জানালো,—কলকাতার ষ্টেশনগুলি গোয়েন্দা পুলিশের আমদানীতে গিজ্ গিজ্ করছে, চারদিকেই পুলিশের সতর্ক ও সন্ধানী দৃষ্টি যেন ওরা ওত পেতে বসে রয়েছে যেমন করে বসে থাকে শিকার ধরবার জন্য বনের বাঘগুলো। পাছে তাকে অনুসরণ ক'রে পুলিশ আস্তানার সন্ধান পায় তাই সে কারো কাছে যাতে সাহস করে যায় নি।

রাত কেটে গেল, প্রভাতী সংবাদের আশায়। সকাল বেলাকার কাগজ এলো। দৈনিক বাংলা ও ইংরাজী কাগজগুলো তাদের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে "আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের চাঞ্চল্যকর ও দুঃসাহসিক পলায়ন" শিরোনামা দিয়ে পলাতক রাজনৈতিক বন্দীদের নাম, ধাম ও রাজনৈতিক পরিচয় দিয়েছে। প্রাথমিক সংবাদে জেলের অভ্যন্তরে যারা ধরা পড়েছে তাদের নাম রয়েছে—সত্যেন মজুমদার, ভোলানাথ দাস ও অমূল্য সেন। পরবর্ত্তী সংবাদে দেখতে পেলাম, পুলিশ অভিযানের ফল স্বরূপ বালিগঞ্জ ষ্টেশনের নিকট হরিপদ দে গ্রেপ্তার হয়েছে।

বন্ধুবর হরিপদ দা'র গ্রেপ্তারের খবর আকস্মিক ও মর্ম্মান্তিক। সময়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের সাথে উপযুক্ত কৌশল আয়ত্ত করেই দুর্লঙ্ঘ্য গিরির মত দুর্গম জল-প্রাচীর পার হতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম। কলকাতা সহর ছেড়ে যাবার সময়ও তেমনি সময়ের সূক্ষ্ম বিচার আমরা করেছিলাম। তবুও মনে হোল যেন হরিপদ দে সেখানেই মার খেল। পালাবার অল্প সময়ের মধ্যেই কর্ত্তারা নিকটতম থানা ও ষ্টেশনের গার্ড গোয়েন্দা পুলিশ নিয়োগ করতে সমর্থ হয়েছিল এবং হরিপদ দে কসবা যাবার পথে প[illegible] গোয়েন্দা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।

ব্রিটিশ শাসক যন্ত্রের [illegible] পাহারা ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই সময়মত চালু করতে সক্ষম হয়েছে, সন্দেহ নেই। পলাতকদের সংবাদ [illegible] কলকাতার [illegible] বাইরে যে ব্যাপক অভিযান পুলিশ চালাবার [illegible] সংবাদে তার বিশদ বিবরণ আছে। সহরের নানা স্থানে থানা ও রাজনৈতিক কর্ম্মীদের গ্রেপ্তারের সংবাদের সাথে কলকাতা হতে বাইরগামী ট্রেনগুলিকে শ্রীরামপুর, চন্দননগর, নৈহাটি এমনকি বর্দ্ধমান ও খড়গপুর ষ্টেশনে সম্যক থামিয়ে তন্ন তন্ন করে দেখার বিবরণও তাতে রয়েছে। পরে এই তল্লাসীর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়ে একদিকে মফঃস্বলের সহর ও পল্লী অঞ্চলে, বিশেষ করে পূর্ব্ব বাংলায় ঢাকা, ফরিদপুর বরিশাল কুমিল্লা প্রভৃতি জায়গায় এবং অন্যদিকে সীতানাথ দেকে ধরবার জন্য ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে পাঞ্জাব, ইউ-পি ও মাদ্রাজ অবধি ছড়িয়ে পড়ল।

ইংরেজ সাম্রাজ্যের বুনিয়াদের ছোট বড় সকল ব্যবস্থাগুলিই

সংরক্ষণ নীতির উপর নির্ভরশীল। বিপ্লব আন্দোলনকে স্তব্ধ করবার জন্য চণ্ডনীতির অশেষ প্রয়োগ ব্যবস্থার মধ্যেও যেন কোথায়ও দাগ্ [illegible]। আন্দোলনের [illegible] ধারা জানবার জন্য বিপ্লবী দলের সভ্যদের মধ্যে যারা এখনও বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হয়নি, তাদের দু'চার জনকে হয়তো শাসক গ্রেপ্তার না করে বাইরে রেখে দিত, যেন তাদের অনুসরণ করে পার্টির ফেরারীদের খোঁজ-খবর পেতে অথবা নবাগতদের রূপ ও পরিচয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে পারে। বিপ্লব আন্দোলনের প্রতি ক্ষমাহীন নীতির অন্তরালে, সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে ছিল এই দ্বৈত নীতি—বর্তমান হতে ভবিষ্যতের দিকে সম্প্রসারিত।

কুমিল্লার মণি দাশগুপ্ত ও নীহার রঞ্জন রায় তখন কলকাতার কলেজে পড়ত। পুলিশের কড়া নজর এড়িয়ে সংগঠনের সাথে যোগসূত্র রাখতে তারা সক্ষম হয়েছিল। আমাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে তারা সক্ষম হলো।

বিপ্লব-আন্দোলনকে বাঁচাবার প্রয়োজনে ফেরারী হিসাবে আত্মগোপন করে যারা কোথায় কোথায় ঘুরে সংগঠনকে বাঁচিয়ে রেখেছিল তাদের মধ্যে প্রফুল্ল সেন, [illegible]প্রসাদ সেনগুপ্ত, দেবব্রত রায়, মাখন কর, পৃথীশ চন্দ্র পুরকায়স্থ ও নারীকর্মী পারুল মুখার্জ্জী ছিল অন্যতম। আমাদের খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে ফেরারী প্রফুল্ল সেন জগদ্দলে পরেশের বাসায় এসে হাজির হলো। প্রফুল্ল সেন পার্টির পুরানো কর্ম্মী। ১৯২৩-২৪ সাল থেকে বৈপ্লবিক পার্টির সাথে সক্রিয় যোগাযোগ রেখেও কংগ্রেসের বিভিন্ন আন্দোলন ও কাজের সঙ্গে সে সাধ্যমত নিজেকে যুক্ত রেখেছিল।

ইতিমধ্যে সীতানাথ দে চন্দননগর থেকে নদী পার হয়ে এপারে এসে হাজির হলো। জগদ্দলে পরেশের বাসা আনাগোনায় ভারী হয়ে উঠল। সামান্য মাত্র সন্দেহের অবকাশ পেলেই পরেশ সমগ্র পরিবারসহ 'জবাই' হবে ভেবে আমরা পরেশের বাসা ছেড়ে অন্যত্র যাবার সিদ্ধান্ত করলাম।

জগদ্দলে শ্রমিক বস্তিগুলো এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে আছে—বাঁশের মাচার ওপর টালি দিয়ে তৈরী ছাদ আর মাটির দেওয়াল-জানালা বা বায়ু প্রবেশের কোনও ব্যবস্থা তাতে নেই। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে যেন গোয়েন্দা পুলিশের নজর এড়াবার জন্যই তৈরী হয়েছে। শ্রমিক বস্তির ভিতর তাদের অংশীদার হয়ে একখানা কোঠা ভাড়া করে আস্তানা গেড়ে বসলাম। তারা কেউ সন্দেহ করলো না, এরা কারা? শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় সন্দেহের অবকাশ কোথায়। তারা জানে, পেটের তাড়নায় দুনিয়ার লোকগুলো ঘুরে মরছে এবং আমরাও তাদের মতই কলের চাকুরে অথবা চাকুরীর উমেদারি করে বেড়াচ্ছি। আশে-পাশে চারদিকেই ছড়িয়ে আছে কল আর কল, বাবু ও মজুরের দল। কলের বাঁশী বাজ্‌বার সাথে সাথে আমাদেরও তাদেরই মতন ছুট্‌তে হবে নিশ্চয়!

এখান হতে প্রাথমিক কাজ আমরা সুরু করে দিলাম। পার্টির বিশ্বস্ত বন্ধুদের সাথে দেখা করবার জন্য কতকগুলি সাক্ষাৎ-কেন্দ্র সবে মাত্র খুলেছি। সাক্ষাৎ-কেন্দ্রগুলি নামহীন নম্বর মুক্ত, কোথাও তা আমগাছের নীচে, কোথাও-বা রেলের ধারে, কোথাও বা নদীর পারে, আবার কোথাও-বা তা পুরানো পুকুর

ধারে—V^1, V^2, V^3, V^4, V^5 প্রভৃতি নম্বর দেওয়া। একমাত্র সাক্ষাৎকারীরা ছাড়া আর কেউ এদের সঠিক স্থানীয় অস্তিত্ব জানত না। ভাটপাড়া ষ্টেশন থেকে বেশী দূরে নয়, অথচ সন্দেহমুক্ত পাড়ার ভিতরে একখানি বাসা ভাড়া করে রেখে দিলাম, যেন বন্ধুরা কেউ আশ্রয় অভাবে ধরা না পড়ে।

ইতিমধ্যে দমদম গ্লাস-ফ্যাক্টরীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী পার্টির পুরানো বন্ধু অনাদি সেনগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে দমদম গ্লাস ফ্যাক্টরীতে নিরঞ্জন ঘোষালকে নিয়ে অতি সাবধানে দিনের বেলায় দেখা করতে সমর্থ হলাম। তিনি আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। সেন-মহাশয় ছিলেন ভাবপ্রবণ, দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ, উদারচেতা লোক। তাঁর চরিত্রে ছিল আন্তরিকতার সঙ্গে সাহসিকতার সহজ সংমিশ্রণ। তাই বৈপ্লবিক কাজে ছিলেন তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। যুরোপ প্রবাসের অভিজ্ঞতার ফলে পাশ্চাত্য আন্দোলনের ধারার বিচার করে তিনি ১৯২০ সালের পর জাতীয় আন্দোলনের কর্ম্মধারার মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সূত্র বেঁধে দেবার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মুজাফ্‌ফর আহম্মদ, কালী সেন, প্যারী দাস ও নীরোদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বন্ধুদের সাথে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর গোপন কক্ষে বসে অনেক বিষয়ে আলোচনা হবার পর তিনি আমাদের হাতে একটি রিভলভার গুলি ভর্ত্তি অবস্থায় উপহার তুলে দিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, গ্লাস ফ্যাক্টরীর অনেক শ্রমিক, তাঁর সহোদররা এবং তখনকার ফ্যাক্টরী-ম্যানেজার আমাদের গতায়াত সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, কিন্তু সেন মহাশয়ের চরিত্রগুণে

ঐ সময়ে কোনও সংবাদই পুলিশ পেতে সমর্থ হয় নেই—এটা তখনকার দিনে কম গৌরবের কথা ছিল না। বাংলার প্রত্যেক জীবন-কেন্দ্রে বিপ্লববাদের ব্যাপকতা বাড়বার সাথে সাথে পুলিশের গোপন চরদেরও উৎপাত বৃদ্ধি পেয়েছিল, একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি।

ঢাকার বিশিষ্ট বিপ্লবী কর্ম্মী ধনেশ ভট্টাচার্য্য দেউলী বন্দী নিবাস হতে কুষ্ঠ রোগ সন্দেহে চারিপাশের সংস্পর্শহীন নজরবন্দী হয়ে সিউড়ী কুষ্ঠ-হাসপাতালে মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে প্রেরিত হয়েছিল। রাজনৈতিক পরিবারে তার জন্ম হয়। তার বড় ভাই দীনেশ ও ছোট ভাই দুর্গেশ বিপ্লবী দলের বিশিষ্ট সভ্য ছিলো। ধনেশ ছিল ব্যায়ামবীর ঢাকার বিখ্যাত ব্যায়ামবীর পরেশ নাথের শিষ্য। ১৯২০-২১ সাল থেকেই বিপ্লবদলে দীক্ষিত হয়ে সম্পূর্ণ ভাবে বিপ্লবের কাজে নিজেকে নিয়োগ করেছিল। কুষ্ঠের করাল আক্রমণেও সে নিজেকে বিপ্লবের পথ থেকে সরিয়ে নিতে চায়নি। আমাদের পালাবার খবর পেয়েই ধনেশ কুষ্ঠাশ্রম থেকে পালিয়ে এসে ঢাকার এক কেন্দ্রে অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত হলো। চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে কেন সে চলে এলো?—আমরা অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করি। ধনেশ হাসি মুখে উত্তর দিল, 'আসন্ন বিপ্লব সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য এসেছি, কুষ্ঠ রোগে ধুকে ধুকে মরবার জন্য হাসপাতালে যেতে চাই না।' ধনেশের প্রিয় শিষ্য শ্যামবিনোদ পাল চৌধুরী এর পূর্ব্বেই অন্তরীণ থেকে পালিয়ে এসে আমাদের সাথে যোগদান করেছিল।

দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত খবর পেয়ে ভাটপাড়ায় চলে এসেছে। বহুদিন থেকেই ফেরারী জীবন সে যাপন করে এসেছে এবং পার্টির বহু গোপনীয় ও জরুরী কাজের সঙ্গে সে যুক্ত ছিল। স্বভাবে অমায়িক, ব্যবহারে মার্জ্জিত, নিঃস্বার্থ, বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ, তরুণ শিক্ষিত যুবক—অভিজ্ঞতা তার বৈপ্লবিক কাজের ভিতর শৃঙ্খলা এনেছে। দেবপ্রসাদ সেন গুপ্তের সাথে তার ঘনিষ্ঠ ফেরারী বন্ধু দেবব্রত রায়ও সিলেট থেকে ভাটপাড়ায় এসে হাজির হলো।

ধনেশ ভট্টাচার্য্য সাংগঠনিক দুর্ব্বলতা, বিশেষ করে অস্ত্রশস্ত্রের এবং অর্থের স্বল্পতা অনুভব করে সিদ্ধান্ত করলো, যে, সে তার রাজনৈতিক কর্ম্মস্থান ঢাকায় চলে যাবে এবং সেখান থেকে অর্থ ও অস্ত্রের আংশিক ব্যবস্থা করে আবার ফিরে আসবে। ব্যবস্থামত সে রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঢাকায় চলে গেলো এবং সেখানকার সংগঠনের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হলো।

ঢাকার গোয়েন্দা পুলিশ ইতিমধ্যেই খবর পেলো যে ধনেশ ঢাকায় এসেছে এবং সংগঠনের আশ্রয়ে রয়েছে। অতি তৎপরতার সঙ্গে পুলিশ তার জাল বিস্তার করতে স্থুরু করলো এবং পার্টি সভ্য ও গোয়েন্দা পুলিশের চর হীরালাল চক্রবর্ত্তীর সাহায্যে ঢাকার বুড়ীগঙ্গা নদীর ওপারে স্থবুড্যা গ্রামে ধনেশকে অতর্কিতভাবে রিভলভার সহ গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হ'লো। দুর্ঘটনার সংবাদ আমাদের নিকট শেলের মত এসে পৌঁছোলো।

ঢাকার কর্ম্মীরা ক্ষেপে গেলো। বিশ্বাসঘাতককে চরম দণ্ড দেবার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হলো। হীরালাল জানতো না, যে তার

বিশ্বাসঘাতকতা পার্টির সভ্যরা জানতে পেরেছে। অনায়াসে তারা তাকে ডেকে নিয়ে গেল, ঢাকা সহরের টীকাটুলী রেল-লাইনের পাশে এবং সেখানে ছুরির আঘাতে বিশ্বাসঘাতকতার চরম দণ্ড দিল। পুলিশ এসে পেলো, মরণোন্মুখ হীরালালকে—মরবার আগে সে অমূল্য রায় ও পরেশ সেনের নাম বলে গেল। বিশেষ আদালতের বিচারে উভয়েরই প্রাণদণ্ডের আদেশ হলো। পরে হাইকোর্টে আপীলের বিচারে বয়স কম বলে তাদের ফাঁসীর আদেশ যাবজ্জীবন দণ্ডে পরিণত হলো।

রিভলভার রাখার অভিযোগে ধনেশের সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হলো। আমরা হারালাম পার্টির নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে একজন বন্ধু ও সাহসী যোদ্ধা। ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচারের জবাব দেবার মুখেই বিপর্য্যয় ঘটে গেলো। দুইজন তরুণ বিপ্লবী যাবজ্জীবন দণ্ড নিয়ে দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হ'লো।

১৯৪৬ সালে মুক্তির পর অমূল্য রায় ঢাকাতেই বাস করছিল। ১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক মুসলমান গুণ্ডার দল তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করলে সে একখানি বস্ত্রমাত্র সম্বল ক'রে অতি কষ্টে কলকাতায় চলে আসতে সক্ষম হয়। সহায় সম্বলহীন অবস্থায় কঠিন টিউমার রোগে আক্রান্ত হয়ে একরকম বিনা চিকিৎসায় কলকাতার লেক হাসপাতালে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে দেশকে স্বাধীন করবার কল্পনা নিয়ে ঘর ছেড়ে যে বাইরে এসেছিল, দেশকে স্বাধীন দেখেও অবহেলিত এবং উপেক্ষিত হয়ে চরম দুঃখের ভিতর দিয়ে সে চলে গেলো অমরলোকে।

আঠার

একদিন বিকালের দিকে বেলা গড়িয়ে যাবার একটু আগেই ভাটপাড়া রেল-ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটি সরু পথ ধরে চলবার সময় সামান্য দূর হ'তে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলাম বাংলার গোয়েন্দা বিভাগের একজন বিশিষ্ট অফিসার পথের ওপর দাঁড়িয়ে পার্টির বিশিষ্ট সভ্য চারু বিকাশ দত্তের সাথে আলাপ করছে। অফিসারটি ছিল আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। তাকে ঘিরে রয়েছে তার দুইজন সশস্ত্র দেহরক্ষী। বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলন দমনের কাজে অফিসারটির কুখ্যাতি বিপ্লবী মহলে ছড়িয়ে পড়েছিল।—নিষ্ঠুর দলন ক্রিয়ার মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় করা ছিল তার বৈশিষ্ট্য এবং তার জন্য সরকারী মহলে সে বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। জীবন রক্ষার প্রয়োজনে তার দেহরক্ষীর ব্যবস্থা। আর কয়েক পা এগোলেই তার সঙ্গে আমাদের শুভদৃষ্টির মিলন হবে অনিবার্য্য। সাক্ষাৎ সময়ে আমরা কি করব ভাবছি—নিরঞ্জন অস্ত্র-সমেত তৈরী। এমন সময় মনে হলো, চারু বিকাশ আমাদের চিন্‌তে পেরে সঙ্গীন অবস্থা উপলব্ধি করেছে—সে সমস্ত সত্ত্বা তার ঢেলে দিল অফিসারটিকে সামনের দিকে ঠেলে নেবার জন্য। অজস্র কথার জাল বুনে অফিসার ও তার দেহরক্ষীদের একটিবারও পিছন দিকে তাকাবার ফুরসৎ না দিয়ে অন্য এক পথে সে তাদের

নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। উপস্থিত বুদ্ধি ও চতুরতায় চারু বিকাশ দত্তের দোসর মিলা এক সময় কঠিন ছিল, তারই পরিচয় সে আবার নূতন করে দিল। ভুজঙ্গের দংশন অথবা মরণ-আলিঙ্গন থেকে অব্যাহতি, কে বলতে পারে ? কিছুক্ষণ পর চারু বিকাশ দত্ত আবার সেই পথে ফিরে এসে আমাদের সম্বর্দ্ধনা জানালো। ভাটপাড়া সহরে তাকে সবেমাত্র অন্তরীণ করা হয়েছে এবং অন্তরীণের জায়গা ঘিরে পুলিশের আনাগোনাও সুরু হয়েছে। আমরা সে খবর জানতাম না বলেই তোপের মুখে হঠাৎ গিয়ে পড়েছি। অবস্থা বুঝে অবিলম্বে ভাটপাড়া কেন্দ্র ছেড়ে দিলাম।

অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টার সাথে বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুতির আয়োজন আমরা সুরু করেছি। "টি, এন, টি" বোমা, বিষ-গ্যাসের বোমা এবং ধোঁয়া-বোমা বানাবার প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে হ'লে বিশ্বস্ত ও বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক দরকার। বৈজ্ঞানিক দ্বিজেন রায় তো জেলে! পালাবার সময় তার মৌখিক নির্দ্দেশ ও ফরমুলা জেনে নিলেও তাকে কার্য্যকরী করতে অথবা তার ত্রুটি সংশোধন করতে বৈজ্ঞানিকের সাহায্য প্রয়োজন। ঐ সময় আগ্নেয়াস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য রাখ্‌বার, প্রস্তুত অথবা সংগ্রহ করবার জন্য যাবজ্জীবন দণ্ড থেকে ফাঁসী পর্য্যন্ত দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই কঠিন সময়ে যাঁদের ওপর ভরসা করা হয়েছিল, তাঁরা কেউ এগোতে রাজী হল না। আমরা আবার নূতন করে বৈজ্ঞানিকের খোঁজে বের হ'লাম। এ ব্যাপারেও অনাদি সেন মহাশয় পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং আশ্বাস দিলেন যে তিনি একাজের উপযুক্ত একজন বৈজ্ঞানিককে শীঘ্রই নিয়ে আস্‌বেন।

সেন মহাশয় ছিলেন ভাবের উন্মাদ—বাঞ্ছিত মানুষটিকে সত্বরই নিয়ে এলেন।

বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান সাধনা সমাপ্ত হয়েছে—ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে। তাঁর বিজ্ঞান সাধনার নির্লিপ্ত স্তরে অনুপ্রবেশ করেছে পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক কোলাহলের সুর,—বিদেশী দাম্ভিক রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রের শাসকবর্গের গ্লানিকর অবিচ্ছিন্ন লুণ্ঠন, অবহেলা ও অবমাননার রাশি রাশি ঘটনার কল্লোল! বিজ্ঞান সাধনার ওপর ছড়িয়ে ছিল, তাঁর মনের ক্ষুব্ধ হুঙ্কার। কলকাতার উপকণ্ঠে উল্টাডাঙ্গায় রাত্রির তমিস্রার ভিতর উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে সেন মহাশয়ের উপস্থিতিতে বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আলাপ হ'লো। সক্রিয় সাহায্য করতে তিনি রাজী হলেন এবং তাঁকে সাহায্য করবার জন্য বিজ্ঞান ক্লাসের একজন মেধাবী ছাত্রের আবশ্যকতার কথা তিনি জানালেন।

রাসায়নিক দ্রব্যসম্ভার ও প্রাথমিক আয়োজনের জন্য টিটাগড় রেল-ষ্টেশনের অনতিদূরে ভদ্রপল্লীর মাঝে ছোট্ট একখানা বাড়ী ভাড়া করা হ'লো। বৈপ্লবিক আন্দোলনের গতিবেগ বাড়বার সাথে সাথে দরদী পরিবারের নিভৃত আশ্রয়ের গণ্ডীর বাইরে অনেক কাজই সম্পন্ন করতে হতো; কারণ বিপজ্জনক রাজদ্রোহ বা ষড়যন্ত্রমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট আশ্রয়-দাতাদের পরিচয় পেলে যেসব কঠিন সাজার ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে সম্পূর্ণ পরিবারই 'জবাই' হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। এই অবস্থায়ও বাংলার পল্লীতে বা সহরে যাঁরা আশ্রয় দিতেন, তাঁদের সংখ্যা কম ছিলনা।—তাঁরা নিজেদের বিপদের কথা জেনেও পার্টির সভ্য বা সভ্যাদের নিরাপদ

আশ্রয় দিয়েছেন, সংগোপনে অস্ত্রশস্ত্র রেখেছেন, অর্থ সাহায্য করেছেন, এবং বিপ্লবী দলের জরুরী খবর পুলিশের নজর এড়িয়ে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে বা সহরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। ভদ্র পল্লীর মাঝে এই ঘরটীকে পল্লীস্থ লোকের চক্ষে সন্দেহমুক্ত করবার জন্য সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের মুখোস পড়ান দরকার বিবেচনা করে পার্টি সভ্যা পলাতকা শ্রীমতী পারুল মুখার্জ্জিকে খুলনা হতে টিটাগড়ের বাসায় আনবার ব্যবস্থা হলো।

অনুশীলন দলের কুমিল্লা জেলার সংগঠক অমূল্য মুখার্জ্জি ছিলেন পারুলের বড় ভাই। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সাথে সাথে অমূল্য মুখার্জ্জি অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার হয়ে বিনা বিচারে বক্সা প্রভৃতি ক্যাম্পে বন্দী অবস্থায় থাকেন। পারুল মুখার্জ্জিও তখন হ'তে কুমিল্লা সহরে পুলিশের নজরবন্দী ছিল। ১৯৩৩ সালে নজরবন্দী অবস্থা এড়িয়ে পারুল ফেরারী জীবন যাপন করতে সুরু করে এবং উত্তর বাংলার রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাংলার ফরিদপুর, কুমিল্লা, বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি জেলায় সংগঠনকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। প্রফুল্ল সেনের নির্দ্দেশে পারুল টিটাগড়ের বাসায় এসে হাজির হলো। পারুলের উপস্থিতির ফলে টিটাগড় বাসাকে সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের মতই দেখালো।

জনৈক প্রফেসার বন্ধুর সাহায্যে এক বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মারফত বহুবিধ রাসায়নিক দ্রব্য ও উপকরণাদি জোগাড় করে এনে টিটাগড় বাসায় রাখা হলো। বিস্ফোরক বিজ্ঞানের পুস্তকাদিও এনে জড়ো করা হ'লো। আরও আনা হ'লো—বোমার খোল

বা মিলস্ বোমার ছাঁচ্। বোমার খোল বা দেহটির গায় ৩২ খণ্ডে খাঁজ কাটা ছিল যাতে ফাটবার সাথে সাথে ৩২টী খণ্ড টুকরাই চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়ে ধ্বংসের কাজকে ত্রুটিহীনভাবে সম্পূর্ণ করতে পারে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে "টি, এন, টি" বোমাই ছিল ধ্বংসের কাজে অগ্রণী। এর পূর্ব্বে বাংলাব বিপ্লবীরা "অ্যামন পাইক্রেট" জাতীয় বোমাই ব্যবহার করে এসেছে। ১৯১৩ সালে রাজাবাজারে প্রাপ্ত বোমা, (অমৃত বা শশাঙ্ক হাজরাই ছিলেন এই মামলার প্রধান নায়ক), ১৯১৩ সালে শ্রীহট্ট, মৌলবি বাজারে গর্ডনের ওপর নিক্ষিপ্ত বোমা, (ঘটনাস্থলে যোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মারা যান এবং অমৃত সরকার ও তারাপ্রসন্ন বলকে গুরুতর আহত অবস্থায় লালমোহন দে মহাশয় ঢাকায় নিয়ে আসেন), ১৯১২ সালের ডিসেম্বরে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ এর ওপর নিক্ষিপ্ত বোমা, (বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু এই বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন)— এ.সবই ছিল "অ্যামন পাইক্রেট" তৈয়ারী বোমা। একমাত্র কল্‌কাতা ডালহৌসী স্কোয়ারে ১৯৩০ সালে পুলিশ কমিশনার টেগার্টের উপর নিক্ষিপ্ত বোমাই ছিল "টি, এন, টি" জাতীয়। কিন্তু বোমার খোল ছিল, এলুমিনিয়াম ধাতুতে তৈরী। শোনা যায়, ধাতুর এই অসম্পূর্ণতার জন্যই বোমা·বিদীর্ণ হবার সময় একদিক দিয়ে বের হয়ে যায় এবং তার ফলে পুলিশ কমিশনার টেগার্টের প্রাণ রক্ষা হয় ও নিক্ষেপকারী বিপ্লবী অনুজা সেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে মারা যান এবং বোমার টুকরাতে আহত হয়ে দীনেশ মজুমদার ধৃত হন। বোমার রাসায়নিক মসলা তৈরী

হবার সময় মেকানিজম-এর জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন না হলেও তৈরী হয়ে যাবার পর বিস্ফোরক দ্রব্যের শক্তি অনুযায়ী বোমার খোল ও তার ধাতব গঠন এবং বোমাকে বিদীর্ণ করবার ফিউজ প্রভৃতির জন্য দরকার হবে—একজন উপযুক্ত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। এখানে হরিপদ দে'র অভাব আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছি।

বৈজ্ঞানিককে সাহায্য করবার জন্য বিজ্ঞান ক্লাসের উচ্চশ্রেণীর একজন ছাত্র দরকার হবে জেনে প্রফুল্ল সেন বরিশাল জেলা সংগঠনের ভিতর থেকে বিজ্ঞান ক্লাসের মেধাবী ছাত্র, সন্তোষ সেনকে কলকাতা সহরের উপকণ্ঠে কোনও একটি মিলন কেন্দ্রে (V কেন্দ্রে) আনবার নির্দ্দেশ দিল এবং তদনুযায়ী অচিরেই সন্তোষ এসে হাজির হলো। সন্তোষের সঙ্গে পরিচয়ে মনে হলো, সন্তোষ হালকা মনের তৈরী মানুষ। তার মনের কাঠামোতে গুরু গম্ভীর ছন্দের অভাব। সমিতির প্রারম্ভিক কালে লাঠিখেলা, অসি ও ছোরা চালনা, দৈহিক ব্যায়াম ও কায়িক পরিশ্রম করবার যে সুনিপুণ ব্যবস্থা ছিল, যার ফলে বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনে সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্ত্তিতার ভিতর দিয়ে সামরিক নিয়মে অভ্যস্ত একদল সবল গোষ্ঠিগত মানুষ তৈরী হয়েছিল, পরবর্ত্তীকালে তার অবসান ঘটেছিল নানা কারণে। জানবার ও বুঝবার প্রাথমিক উপাদান চলে যাবার পর "মানুষ" বাছাইএর কাজ মনের অসম্পূর্ণ পরিচয়ের ভিতর দিয়েই সম্ভবপর ছিল। দুর্ব্বল ও সবল মানুষের ভেদাভেদ জানবার আর কোন সঠিক নির্দ্দেশ ছিলনা।

ডুবুরী সংগঠক ভিন্ন মানুষ বাছাই শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। একমাত্র ভবিষ্যৎ ঘটনার অবলম্বনেই মানুষটিব সঠিক পরিচয় মিলতে পারে। আমাদের তখন প্রয়োজনের তাগিদ রয়েছে, তাই ভাণ্ডারের তল্লানী থেকে সন্তোষকে বিজ্ঞানীর সাহায্য-কারী হিসাবে নেওয়াই স্থিব হলো। তবুও ভবিষ্যতের আশঙ্কার কথা ভেবে বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে যাতে তাব চাক্ষুষ দেখা না হয় অথবা সে যাতে তাঁকে চিনতে না পারে তাব জন্য ঠিক হলো যে আপাদ-মস্তক বহিবাসে ঢেকে বৈজ্ঞানিক তাব নিজস্ব ঘরে কাজ করবেন এবং অতি বিশ্বস্ত কাবও মাধ্যমে "কাউণ্টাবেব" একপাশ হতে সন্তোষ সেনেব সঙ্গে বাসায়ণিক দ্রব্য বিনিময় অথবা নির্দ্দেশ বিনিময় করবেন। এই উদ্দেশ্যে কলকাতা সহরে কালীঘাটের নিকটে ঘর ভাড়া নেবাব ব্যবস্থাও প্রায় সম্পূর্ণ হলো।

বাংলাদেশে বৈপ্লবিক সংগঠনগুলি যাবা বাঁচিয়ে বেখেছিলেন বা বাংলার বাইবে যাঁবা বৈপ্লবিক সংগঠনগুলি বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কবেছেন তাঁবা পবস্পবের মধ্যে যোগাযোগ কববার জন্য খোঁজ করে বেড়াচ্ছিলেন। উত্তব ভারতে বিপ্লবী নেতা শচীন্দ্র নাথ সান্ন্যাল ও যোগেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েব নেতৃত্বে যে সংগঠন গড়ে উঠেছিল, সেই সংগঠন ফাঁসী বা দ্বীপান্তবে বহুসংখ্যক সদস্য হারিয়েও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি এবং পববর্ত্তী কালে ধীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, সীতানাথ দে, জগবন্ধু ভট্টাচায্য ও সুশীল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি তারই সূত্র ধরে তা পুনর্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছিল; কিন্তু আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র উদঘাটনের ফলে জিয়ান সংগঠন আবার 'মার' খেয়ে গেলো। ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের উপর

লাহোর দুর্গে অকথ্য অত্যাচারের ফলে তার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা গেলো এবং ষড়যন্ত্রের মূল আসামী হিসাবে তাকে এবং সীতানাথ দেকে দাঁড় করানো হলো। তবুও শক্ত মানুষগুলি বারবার মার খেয়েও হাল ছেড়ে দেয়নি। সেখান থেকে কেশব প্রসাদ শর্ম্মা এলো সীতানাথ দেকে নিয়ে যাবার জন্যে, আবার যাতে উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা সফল করে তোলা যায়। উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবেব সংগঠনের ভার নিয়ে তার যাবার সিদ্ধান্ত হলো।

যুগান্তব দলেব নাম ও পবিচয় দিয়ে শান্তি সেন ফরিদপুর থেকে এসে দেখা করলো। তারা 'কাজ' চায়, কাজের তল্লাসে ব্যাকুল হয়ে ঘুবে বেড়াচ্ছে এবং আমাদের সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ কবতে তাবা ইচ্ছুক। দলের কৃত্রিম ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আমরাও তখন একত্রে চলতে প্রস্তুত। শান্তি সেনের সঙ্গে ঠিক হলো, কাজ বা ঘটনাকে (নির্দ্দিষ্ট বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাকে ইংরাজীতে action বলা হতো) সম্পূর্ণ করতে যে নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সামরিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা দরকার হবে, তার শিক্ষা দেবার ভার সে নেবে। অস্ত্র চালনা শিক্ষার ভারও সে নেবে।

ইতিমধ্যে নিরঞ্জন ঘোষাল ও দেবব্রত রায় জামসেদপুর, রাঁচী প্রভৃতি জায়গায় অস্ত্রের সন্ধান ও সংগঠনের কাজে বের হয়ে গেলো। রাঁচীতে তখন পার্টির পুরাণো বিশিষ্ট সভ্য দক্ষিণ কলকাতার সুশীল ব্যানার্জ্জি অন্তরীণ ছিলেন। সুশীলের সঙ্গে অতি সংগোপনে নিরঞ্জন দেখা কবতে সক্ষম হ'লে সুশীল তাকে বৈপ্লবিক সৌহার্দ্দ্য জানালো এবং অর্থ ও আশ্রয় দিয়ে সাহায্য

করলো। যুগান্তর দলের নায়ক শ্রদ্ধেয় যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মূল্যবান উপদেশও সুশীল নিরঞ্জনকে জানিয়ে দিল।

কলকাতার নিকটে বেলঘেরিয়া কেন্দ্রে অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা ও শিক্ষাকার্য্যের জন্য সবেমাত্র একটি আশ্রয়-কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সিলেটের ফেরারী প্রীতিরঞ্জন পুরকায়স্থ ভাটপাড়া কেন্দ্র থেকে এখানে এসেছে, শান্তি সেনও এখানে রয়েছে। একদিন গভীর রাত্রে শান্তির সাথে একটি রিভলভারের পরীক্ষা চলেছে। রিভলভারটির ভিতর হতে টোটাগুলি বের করে "ট্রিগার" টেনে পরীক্ষা করবার সময় পল্লীর নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রচণ্ড শব্দে শান্তির কপাল ঘেঁসে একটি গুলি বের হয়ে গেল। রিভলভারটির ভিতর যে একটি টোটা রয়ে গিয়েছিল, তা লক্ষ্য করা হয়নি বলেই এই অনর্থের সৃষ্টি হল। রাত্রির নিস্তব্ধতায় পল্লীর ভিতর গুলির প্রচণ্ড আওয়াজ সবাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং এই ঘটনার অবলম্বনে পুলিশ অচিরেই যে এসে যাবে তাও নিঃসন্দেহ। আমরা তখনই বাসা ছেড়ে যেতে মনস্থ করলাম; কিন্তু ফেরারী বন্ধু মাখন লাল কর সেখানে অতি প্রত্যুষে মাল সমেত আসবে বলে আমরা প্রীতিরঞ্জনকে রেখে অন্যান্য কেন্দ্রগুলিতে ছড়িয়ে পড়লাম। মাখন লাল করকে বাঁচাবার প্রচেষ্টায় প্রীতিরঞ্জনকে বলি দিতে হলো। প্রীতিরঞ্জন তাঁর বৈপ্লবিক কর্ত্তব্য পালন করবার জন্য একাকী রইল। আমরা প্রীতিরঞ্জনকে হারালাম।

রাত্রির অন্ধকার মিলিয়ে যাবার আগেই শ্যামবিনোদ, দেবপ্রসাদ সেন ও আমি সাইকেল চালিয়ে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড

ধরে বেলঘরিয়ার রাস্তায় ঢুকে পড়লাম। চারদিকেই লক্ষ্য করে চলেছি—শীতের কুয়াশায় দূরের দৃষ্টিপথকে খানিকটা অপরিচ্ছন্ন করেছে—সন্দেহজনক কিছুই পথে দেখা গেলনা। অনতিদূরেই বেলঘরিয়ার বাসা। অতি সাবধানে এগোচ্ছি। তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে, বাসাখানা ভিতর হতে অস্বাভাবিকভাবে অর্গল-বদ্ধ—বাইরে কোথাও পুলিশের চিহ্ন মাত্র দেখা যাচ্ছেনা। কিন্তু সংলগ্ন প্রতিবেশী-গৃহের জানালার ধারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একটি কুলবধূ—উৎকণ্ঠিত তাঁর মুখমণ্ডল। আমাদের দেখে ভিতর দিকে এক পা পিছে হেঁটে হাত নেড়ে বারবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে- সামনে এগোতে বারণ করার ইঙ্গিত। বুঝতে দেরী হলো না, যে পুলিশ রাত্রিতেই এসে বাসা ঘেরাও করে প্রীতিকে ধরেছে এবং তারপর দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে ভিতরেই ওত পেতে বসে রয়েছে, আরও শিকার ধরবার আশায়। যদিই কেউবা আঙ্গিনা পার হয়ে দরজা ধাক্কা দেয় বা প্রীতিকে ডাক দেয় তবে সঙ্গীন চড়িয়ে ও গুলি ভর্তি রাইফেল নিয়ে ভিতরে যারা অপেক্ষা করছিল—বাঙ্গালী, গুর্খা, পাঠান বা হিন্দুস্থানীর দল —তারা সবাই ছুটে এসে তাকে "সামরিক" অভ্যর্থনা জানাবে।

অভ্যর্থনার পূর্ব্বেই আমরা সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়েছি। কুলবধূর ইঙ্গিত ব্যর্থ হলো না। তাড়াতাড়ি পল্লীর ছোট্ট একটি রাস্তা ধ'রে এগিয়ে যেতেই মাখন করকে পথের ধারে ক্লান্ত দেহ ও মন নিয়ে বসে আছে, দেখতে পেলাম। মাখন করের নিকটও একই অভিজ্ঞতার বর্ণনা পেলাম—সংলগ্ন গৃহের জানালা

ধবে দাঁড়িয়ে কুলবধূর ইঙ্গিত। প্রায় এক বৎসর পর পুলিশ গুপ্তচরের মুখে জান্‌তে পেরেছিলাম যে বেলঘরিয়া-ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের সংযোগ স্থলে সশস্ত্র এক পুলিশের দল আমাদের জন্য আড়ালে অপেক্ষা করছিল কিন্তু ধার্ম্মিক মুসলমানের মত গোঁফ ও দাড়ি রেখে এবং মাথায় পট্টি বেঁধে দ্রুত বের হয়ে যাবার জন্য তারা চিনতে পারে নি এবং সাথের অপর বন্ধুদের—শ্যাম বিনোদ ও দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তকে চিনবার লোক নাকি সেখানে ছিল না। ঘটনার পর বাইশ বছর কেটে গেছে, কিন্তু সেই বাংলা মায়ের কুলবধূর গৃহের জানালা ধবে দাঁড়িয়ে তাঁর কর্ত্তব্য পালন করার ছবিখানি আজও মন থেকে মুছে যায়নি।

বোমা তৈরীর ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অস্ত্রের জন্যও জোর সন্ধান করে বেড়াচ্ছি। যে-সব পরিকল্পনা করা হয়েছে, পর্য্যাপ্ত অস্ত্রের সংস্থান ভিন্ন তা কার্য্যকরী করা সম্ভব নয়। একটি বিশেষ পরিকল্পনায় তখন আমরা মন দিয়েছি।

বৈপ্লবিক আন্দোলন বাংলা ও ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিহত হয়েছে, অধিকাংশ সময়ই বিশ্বাসঘাতকতার বালুচরে। বাংলার গোয়েন্দা-বিভাগ নিখুঁত নিপুণতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকের দল সৃষ্টি করেছে। পার্টির ভিতরকার এই বিভীষণদের খোঁজ রাখত— বাংলার গোয়েন্দা-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তারা। এদের গোপন খাতায় অথবা এদের মনের চোরা-কুঠরিতে বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীদের নামের ফিরিস্তি থাকত। এই সময় বিপ্লব আন্দোলনের শায়েস্তাকারী নায়েব ছিল, রায় বাহাদুর নলিনী মজুমদার। রায় বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে যাঁরা এই পদ

অলঙ্কৃত করে গেছে তাদের অনেকেই বিপ্লবীদের অগ্নি-নালিকার মুখে প্রাণ হারিয়েছে। গোয়েন্দা-কর্ত্তা বসন্ত চাটার্জ্জি ১৯১৬ সালে কলকাতার সদর রাস্তার ওপর বিপ্লবীদের আক্রমণে নিহত হয় (কুমিল্লার শ্রীঅতীন্দ্র মোহন রায় আক্রমণকারীদের মধ্যে অন্যতম বলে পরিগণিত)। গোয়েন্দা-কর্ত্তা ভূপেন চাটার্জ্জি দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দীর্ঘ দণ্ডাদেশ-প্রাপ্ত চট্টগ্রামের প্রমোদরঞ্জন, নদীয়ার অনন্তহরি, বীরেন বানার্জ্জি ও তাদের অন্য দুই বন্ধু কর্ত্তৃক কলকাতা আলিপুর জেলের অভ্যন্তরে ১৯২৫ সালে নিহত হয়। প্রমোদ-অনন্ত দেশদ্রোহিতার প্রতিশোধে জীবন দানের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রেখে গেলো।

গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্ত্তাদের অনেককেই তখন জ্যোতিষী ও গুরুর আশ্রয় নিতে দেখা যেতো। জ্যোতিষী ও গুরুতে মিলে তাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনকে ভাগ করে নিত। বিপ্লবীদের আক্রমণে তাদের জীবন-দীপ হঠাৎ নিভে যেতে পারে এই ভয়ে প্রচুর সিপাহী শাস্ত্রীর ব্যবস্থা করেও তারা নিরাপদ বোধ করত না—তাই গুরু গৃহে তাদের আগমন ও আশীর্ব্বাদের ব্যবস্থা। পার্টির কোনও সভ্য মারফত খবর এলো, দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে গুরুর কোনও এক বিশেষ আস্তানায় গোয়েন্দা-কর্ত্তার গোপন যাতায়াত রয়েছে। স্থানটিরও সন্ধান পাওয়া গেল এবং সশরীরে তাকে ধরে আনবার প্ল্যান হলো। তাকে পেলে বাংলার দেশদ্রোহীদের অনেক বড় চাঁইদের খবর পাওয়া যাবে। দরকার হলো, যথেষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র এবং উপযুক্ত ও সাহসী লোক। আমরা তার জন্য উঠে পড়ে লাগলাম।

উনিশ

বেলঘরিয়ার ঘটনা আসন্ন দুর্যোগের ইঙ্গিত। শক্তি সমাবেশের মাঝখানেই বুনিয়াদের ভিত্ যেন খসে যাচ্ছে। সংগঠকরা কোনও না কোনও ভাবে ধরা পড়ে যাচ্ছে। ধনেশ ও প্রীতিকে হারালাম।

টিটাগড় বাসাটি একান্ত পল্লীর মধ্যে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। তবুও সন্দেহ এসেছে। বন্ধুরা একদিন সন্দেহজনক একটি লোককে দেখতে পেয়ে তাকে অনুসরণ করলো, কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারল না। বাসাখানি ছেড়ে দেবার কথা হলো কিন্তু অনেকের ধারণা সন্দেহ তেমন গুরুতর নয়।

প্রফুল্ল সেন সবে মাত্র কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সংগঠনের ভার নিয়েছে। গঙ্গার ধারে খড়দহ আশ্রয়-কেন্দ্রের অদূরে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের নিকট পল্লী-বাসীদের একটি খেলার মাঠকে রাত্রিবেলায় কিছুদিন যাবত মিলন-কেন্দ্র হিসাবে আমরা ব্যবহার করে আসছি—সেখানে সেদিন দু'এক জন বন্ধুর আসবার কথা। শ্যামবিনোদকে সঙ্গে নিয়ে আমি ও প্রফুল্ল রওনা হয়ে গেলাম। রাত আটটার সময় আমি ও শ্যামবিনোদ খড়দহ আশ্রয়-কেন্দ্রে ফিরে এলাম—মাখন কর, সুধাংশুবিমল এবং আরও দু'এক জন ফেরারী বন্ধু সেখানে আছে। প্রফুল্ল রাত দশটার মধ্যেই মিলন-কেন্দ্র থেকে খড়দহ বাসায় চলে আসবে।

আমরা সবাই প্রফুল্লর আশায় বসে আছি। রাত দশটা বেজে গেল প্রফুল্ল এলো না। সওয়া দশটার সময় চিন্তিত হয়ে শ্যামবিনোদ প্রফুল্লর খোঁজে বের হয়ে গেল। এক ঘণ্টা পর হতাশ হয়ে ফিরে এলো—প্রফুল্লর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

প্রফুল্ল ধরা পড়েছে। পার্টির নিয়মানুযায়ী কেউ ধরা পড়ে গেলে তখনই সংগঠনকে বাঁচাবার জন্য জরুরী সাবধানী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয় যেন সদস্যের গ্রেপ্তারজনিত কোনও খবরের বলে সংগঠনকে বানচাল করবার সুযোগ পুলিশ না পেতে পারে। সদস্যের গ্রেপ্তারের জন্য দুঃখ অথবা আফ্‌শোষ করবার সময় কোথায়! তখনই জরুরী কর্তব্য হিসাবে খুলনা গ্রামে চারুবালা দেবীর কাছে সুধাংশুবিমল দত্তকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত হলো। চারুবালা দেবী (ওরফে কাকীমা) প্রফুল্লের নির্দ্দেশমত একটি বন্দুককে তারই ঘরের মাটির তলায় গোপনে রেখে দিয়েছেন; কাউকেই তিনি এ বিষয় জানতে দেন নি—এমন কি তাঁর স্বামী বিজয়বাবুও জানতেন না যে তারই ঘরে একটি বন্দুক রয়েছে। সুধাংশুকে কাকীমা জানতেন এবং তাকে তিনি বিশ্বাস করতেন। সুধাংশু চাঁটগা'র ছেলে, পার্টির মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ কিন্তু বৈপ্লবিক চরিত্রের গুণে সে সবাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বহুদিন থেকেই পালিয়ে পালিয়ে সংগঠনের কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে সে করে যাচ্ছে। চারুবালা দেবীর কাছে গচ্ছিত বন্দুকটি আনবার জন্য রাত্রেই সুধাংশু একটি লম্বা পাশ-বালিস বিছানার মধ্যে নিয়ে রওনা হয়ে গেল—

বালিশটির মধ্যে বন্দুকটি ভরে সে দু'তিন দিনের মধ্যেই খড়দহ চলে আসবে।

সুধাংশু চলে যাবার পর বোঝার ভারে যেন মনটা স্থানু হয়ে রইল। একে একে সাথীর দল অন্তর্ধান হয়ে যাচ্ছে, সেই পাষান পুরীর মধ্যে যার বক্ষ চিরে আমরা বের হয়ে এসেছি। প্রতিটি সজাগ-মুহূর্ত্ত আমরা ভরে দিতে চেষ্টা করেছি—বিদ্রোহের আয়োজনে। তাকে সম্পূর্ণ করতে প্রাথমিক অনেক কাজ এখনও বাকী পড়ে আছে কিন্তু আয়োজনের পুরোহিত যাঁরা তাদের সীমিত ভাণ্ডার নিঃশেষ হ'তে চলেছে।

রাত বারেটা—খড়দহ বাসা। সেখানেই রাত কাটাব স্থির করেছি। শ্যামবিনোদকে টিটাগড় বাসায় চলে যেতে বললাম, পারুল সেখানে একাকী রয়েছে। বন্ধুরা আপত্তি জানালো—খড়দহ-বাসার মালিক আমাদের আনা গোনা দেখে সন্দেহ প্রকাশ করেছে—কোনও মেয়ে না থাকবার কারণ বারবার করে জিজ্ঞাসা করেছে। বিশেষ করে প্রফুল্ল সেন নিকটেই ধরা পড়ায় নিরাপত্তার দিক থেকে খড়দহের বাইরে থাকাই শ্রেয় মনে করে তারা আমাকে টিটাগড় যেতে অনুরোধ করলো। প্রত্যূষে সুধাংশুর বন্দুকটি নিয়ে আসবার কথা বললেও বন্ধুরা রাজী হলনা। অগত্যা আমি ও শ্যামবিনোদ টিটাগড় যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

শীতের রাত—তাই আঁট সাট করে পোষাক পরে সাইকেল নিয়ে দুই জনই বের হয়ে পড়লাম। শীতের কন্ কনে হাওয়া গঙ্গার বুক থেকে হিমশীতল স্পর্শ নিয়ে এলো—ওপারের বিজলী বাতিগুলো যেন কুয়াসার ঘন আবরণে বন্দী। নদীর বুকে নিঃসীম

অন্ধকারের ছাউনী কুয়াসার ওড়নাকে আপন বক্ষে জড়িয়ে আছে। আমরা সাইকেল বেয়ে চলেছি। গভীর রাত। মাঝে মাঝে দু'এক জন বিরল পথযাত্রীকে আনমনা হয়ে চলতে দেখা যায়।

টিটাগড় রেল ষ্টেশনের নিকট এসে রেল লাইন পার হয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে পল্লার ভিতর পৌঁছে গেলাম। শান্ত পল্লীখানা শীতের নৈশ-নিস্তব্ধতার পরিপূর্ণ ছবি নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। পল্লী কুটিরগুলির মাঝ দিয়ে অতি সাবধানে আমরা বাসার নিকট পৌঁছতেই পারুল দরজা খুলে দিল— পারুল জেগেই ছিল। পারুল সন্দেহজনক কোনও লোকের যাতায়াত সেদিনও লক্ষ্য করেনি। আমরা খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম— তখন রাত একটা।

সকাল চারটায় উঠেছি। দেবপ্রসাদ ও নিরঞ্জনের সঙ্গে জগদ্দলে ছয়টার সময় দেখা হবার কথা। রোজকার মতই স্নানাদি সেরে তৈরী হয়ে আমি ও শ্যামবিনোদ সাইকেল হাতে নিয়ে দরজা খুলতে গিয়ে মনে হলো, বাইর থেকে সজোরে দরজা ঠেলে ঢুকবার জন্য কারা যেন চেষ্টা করছে আগন্তুকরা পুলিশের দল। শ্যামবিনোদ বুঝতে পেরেই তাদের ঠেলে দিয়ে সজোরে দরজা বন্ধ করে দিল। গোলমালের শব্দ কানে যেতেই পারুলও এসে হাজির হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও শ্যামবিনোদ গৃহের একতলা ছাদে লাফ্ দিয়ে উঠে পড়লাম। পারুল ও লাফ্ দিয়ে ছাদে উঠে পড়েছে। অন্ধকারের ঘোর তখনও কাটেনি। কুয়াশা ও অন্ধকারের আবছায়ার ভিতর দেখতে পেলাম, বাসাখানাকে চারদিক হতেই পুলিশ ঘেরাও করে রেখেছে তিল মাত্র ফাঁক

তার কোথাও নেই—আর অদূরেই কৌতূহলী পল্লীবাসী জনতার ভিড়। শ্যামবিনোদ রিভলভার হাতে নিয়ে দুর্ব্বল স্থানের সন্ধান করে বেড়াচ্ছে, এবং পারুল তাকে সাহায্য করছে। গুলি করবার অনুমতি চাইলো। সব দিক দেখে সিদ্ধান্ত করলাম—গুলির ব্যবহার এখানে কৌতুক মাত্র। পুলিশের বেষ্টনা ও মূর্খ জনতার ভিড়কে চূর্ণ করে দিতে রিভলভারের গুলি অসমর্থ—যাবার পথ নেই। আমরা বন্দী হয়ে পড়েছি। রিভলভারটি এখন আমাদেরই জীবন নাশ করতে উদ্যত। সঙ্গে পেলেই অনিবার্য্য ফাঁসীর দড়ি নেমে আসবে একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টার জন্য। শ্যামবিনোদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে রিভলভারটি দূরে নিক্ষেপ করে দিলাম। তারপর অন্ধকারের মধ্যে, শত্রু-ব্যূহের মাঝখানে ছাদ থেকে লাফ্ দিয়ে পড়লাম—আমি ও শ্যামবিনোদ। পারুল ইতিমধ্যে কি যেন ভেবে ছাদ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে—উঠোনে লাফ্ দিয়ে পড়ে সে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

আমরা বাইরে পড়বার সাথে সাথে অসংখ্য লোক যেন আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পুলিশের হাতে আমরা বন্দী—জনতার উল্লসিত সুর কানে বাজছে।

ইতিমধ্যে দরজা ভেঙ্গে পুলিশ ঘরে ঢুকে দেখতে পেল, প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সামনে দাঁড়িয়ে—এক বিদ্রোহী নারী। পারুল মূল্যবান কাগজগুলোকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আগুনে নিক্ষেপ করে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। পারুল গ্রেপ্তার হলো। বোমার রাশিকৃত মালমসলা, সামরিক কিতাবাদি, অর্দ্ধ-দগ্ধ কাগজ, ভস্ম সবই পুলিশ সংগ্রহ করলো। প্রতিবেশী

মেয়ে পুরুষের সাক্ষ্য সাবুদ সংগ্রহ করে পারুলকে নিয়ে বের হয়ে এলো ব্যারাকপুরের ইংরেজ পুলিশ-সাহেব। টুপী উঁচু করে পারুলকে সম্মান দেখিয়ে, সে চলে গেলো। বিদ্রোহী নারীর প্রতিও সম্মান দেখাতে এঁরা কুণ্ঠিত হয় না—পদানত জাতির নিম্ন-মানদণ্ডের অপকৃষ্ট অংশের সাহায্যে অত্যাচারের ব্যবস্থা ক'রে নিজেদের শালীনতা এঁরা রক্ষা করে।

সকাল সাতটা —টিটাগড় থানায় আমরা বন্দী। শ্যামবিনোদ ও পারুলকে থানার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় রেখেছে। টিটাগড় থানা সরগরম হয়ে উঠেছে - পুলিশের অফুরন্ত আনাগোনা। তিন তিনটি ফেরারী আসামীকে একযোগে ধরবার জন্য বাংলার পুলিশের বাহাদুরীর অংশীদার জুটেছে টিটাগড় বাসাখানার প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীর দল।

বিদ্রোহীর জীবন ইংরেজ রাজশক্তির নিকট প্রতি মুহূর্ত্তেই সংশয়াকুল! তবুও তা গৌরবের—অপমানের জ্বালাবোধ তাতে নেই। কিন্তু দেশী লোকের হাতে বন্দীদশা—অপমানের ও দুঃখের। মনে হলো, যেন সীতা দেবীর আকুল প্রার্থনার মত ধরনী দ্বিধা হলে এ মর্ম্মান্তিক জ্বালাবোধ থেকে মুক্তি পেতাম অথবা কোনও অশরীরী শক্তির সাহায্যে এই নিকৃষ্ট অংশকে সমূলে উৎখাত করে দিতে পারলে জাতির বীর্য্যবান অংশকে জিইয়ে রাখতে পারতাম। কবির মানস কল্পনায় জেগেছিল স্বপ্ন—"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি—এ আমার জন্মভূমি"। সেই দেশ তখনও জন্মায়নি।

কলকাতা থেকে অফিসারদের আগমন সুরু হলো। রায়বাহাদুর নলিনী মজুমদার ও বনবিহারী মুখার্জ্জি গরাদের বাইরে থেকে আমাদের দেখতে এলো। চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল অসংখ্য অফিসারদের আনাগোনা। শুধু যেন চোখটাই খোলা ছিল, মনটা কোথায় যেন পালিয়ে গেছে। আমি নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হয়ে গরাদের ভিতরে বসে রইলাম, সারাদিন একই অবস্থায় কেটে গেলো। কেউ কোনও প্রশ্ন করেনি। থানার দারোগাটি ছিল মার্জ্জিত রুচির। গভীর প্রশান্তি দেখে বোধ করি আমার মনের আলোড়ন বুঝতে পেরেছিল—প্রশান্তি ভাঙ্গবার চেষ্টা সে করলো না।

সন্ধ্যার সময় পর পর খান তিন চার সশস্ত্র গাড়ী এসে হাজির হলো, নিয়ে যাবার জন্য। বাছাই-করা গোয়েন্দা অফিসারের দল গাড়ীর সঙ্গে এসেছে। গারদের সামনে এসে দাঁড়াতেই আমার যেন সম্বিত ফিরে এলো। মনের ক্লৈব্য ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালাম—দারোগা যাবার জন্য আহ্বান জানালো। পারুলকেও নিয়ে এসেছে, শ্যামবিনোদও এলো। গাড়ীতে উঠবার সময় পারুল বলল, দারোগাটি এ পর্য্যন্ত ভাল ব্যবহারই করেছে—স্নান ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল।

একই গাড়ীতে আমরা যাচ্ছি—সশস্ত্র সিপাহী আর গোয়েন্দা-অফিসার দিয়ে গাড়ীখানা ভর্ত্তি—প্রত্যেকের দুই পাশেই দুইজন করে সিপাহী। অন্যান্য সশস্ত্র গাড়ীগুলি পিছু পিছু অনুসরণ করছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই শত্রুর শিবিরে আমরা উপস্থিত হব। শিবিরের পরীক্ষা আমার বহুবার হয়েছে কিন্তু

শ্যামবিনোদ ও পারুলের পক্ষে তা নূতন, তাই এদের সাবধান করা দরকার। চেষ্টা করতেই পুলিশ অফিসারটি প্রাণপণে বাধা দিল, চেঁচামিচি স্থরু করলো, শেষ পর্য্যন্ত মারের ভয় দেখালো, কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। বলে যেতে লাগলাম--"এরা যাই বলুক না কেন, যত প্রলোভন দেখাক না কেন, এদেব একটি কথারও জবাব দেবেনা। এদের হাজার উৎপীড়নের মুখে, এদের বর্ব্বরতার চাপে, এদের কৃত্রিম ভালবাসার কথায় বা দেশাত্মবোধের প্ররোচনায় একমাত্র নিজের পরিচয় ভিন্ন আর কোন খবরই দেবেনা।" অনেকবার বাধা পেলেও কথাগুলি বলে যেতে সমর্থ হলাম। আমার কথায় উৎসাহিত হয়ে আমার বন্ধুরা পুলিশের অত্যাচারের কাছে কোমর বেঁধে যেন দাঁড়াতে পারে। পারুল ও শ্যামবিনোদের মনের ভিতর ঝড় বইছে! অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় তাদের সকল আশা-আকাঙ্খা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে—এই হতাশার স্থযোগ পুলিশ নেবার জন্য উঠে পড়ে লাগবে পুলিশ বীজাণুর মত মনের মধ্যে প্রবেশ করে তাদেরই হাতের 'পুতুল' বানাবার চেষ্টা করবে। আমার সাবধান বাণী শেষ হতেই গাড়ী চলে এলো কলকাতা---লালবাজার থানায়। আমাকে লালবাজার রেখে, পারুল ও শ্যামবিনোদকে নিয়ে গাড়ীখানা অন্যত্র চলে গেল।

গাড়ী থেকে নামবার সাথে সাথে হাত দুখানায় শিকল পরিয়ে দিল! সারিবদ্ধ সার্জ্জেন্ট ও সিপাহী বাহিনীর মধ্য দিয়ে লালবাজার কয়েদখানার দ্বিতল গৃহে আমাকে নিয়ে গেলো। পরিচিত সার্জ্জেন্টের দল আশে পাশে, তারা অনেকেই আমাকে

শুভেচ্ছা জানালো। কিন্তু একদল সার্জেন্ট মনের ঝাল মিটাবার জন্য বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় (ইতর ভাষার গালিকে আমরা 'বিশুদ্ধ' বলে নিজেদের মধ্যে বর্ণনা করতাম) গালি দিতে স্থুরু করলো। তাদের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য আমি প্রতি-গালিবর্ষণ সুরু করলাম। আমাকে মারবার জন্য ওরা এগিয়ে আসতেই সার্জেন্ট-ইন্-চার্জ্জ ইন্সপেক্টরটি দৌড়ে এলো এবং ইতরগুলিকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই আমার দরজার কাছে বসে রইল। এক পেয়ালা গরম চা ('ব্ল্যাক-টি') দিতে চাইলো ; ধন্যবাদের সাথে তা ফিরিয়ে দিলাম।

হাতের শিকলটি খুলে দিয়েছে। দ্বিতলের বৃহৎ কামরাটির মধ্যে আমিই একক লালবাজারের বাসিন্দা। মেঝের ওপর একখানি কম্বল পাতা ছিল। নিজের গরম চাদরখানা গায়ের ওপর টেনে দিয়ে নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ, জড়পিণ্ডের মত ভাবেই ওপর পড়ে রইলাম।

মাঝে মাঝে দরজা খোলার শব্দ কানে ভেসে আসছে। পরিচিত গোয়েন্দা অফিসার দুই এক জন এসে নিঃশব্দেই চলে গেলো। প্রাণের ভিতর চলেছে ঝড়ের দোলা। ব্যর্থতা ও পরাজয়ের দুঃসহ গ্লানিবোধ যেন পৌরুষকে খর্ব্ব ও চুর্ণ করে দিয়ে অট্টহাস্যে বিদ্রূপ করছে। অপরাজেয় আদর্শের বাহক আমরা। আমাদের বীর্য্যবান পূর্ব্ব পুরুষরা পর্ব্বত প্রমাণ ব্যর্থতার ভিতর দিয়েও ভারতকে স্বাধীন করবার আশা আকাঙ্খাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন, গভীর অন্ধকারের ভিতর। তাঁদেরই পদাঙ্ক আমরা অনুসরণ করে চলেছি। মন আবার শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। পরাজয়ের সোপান বেয়ে সার্থকতায় পৌঁছবার চেষ্টা করবো।

কুড়ি

পরাধীনতার শৃঙ্খল যারা ভাঙ্গতে চায়, জেলের শৃঙ্খল বরণ করে নেবার জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে হয়। লালবাজারের পুলিশ হেফাজত থেকে পরের দিন সকাল বেলায় আমাকে প্রেসিডেন্সী জেলে পাঠান হলো। সেখানে সঙ্গে সঙ্গে এলো—শৃঙ্খলের সুনিবিড় বন্ধন। লোহার বেড়ি পরিয়ে পা দুটোকে এঁটে দেওয়া হলো। দীর্ঘ কয় বছর তারা আমার পায়ে জড়িয়ে ছিল। বন্ধনের কদর্য্য-কাদায় এর আগেও গতি হারিয়েছি, সে বন্ধন ছিল সাময়িক। এবারের এই বন্ধন হলো দীর্ঘস্থায়ী—পীড়নের ক্ষেত্র শুধু মন নয়, সারা দেহটাকে ঘিরে।

থাক্‌বার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হলো—জেলের সুরক্ষিত '৪৪' ডিগ্রী। নানাপ্রকার সতর্কতার ব্যবস্থা হলো। ডিগ্রীর হিন্দুস্থানী সিপাহীদের উপর নূতন করে আরও এক প্রস্থ হিন্দুস্থানী ডবল গার্ডের সঙ্গে ইংরেজ সার্জেন্টদেরও গার্ড বসলো। ডিগ্রি ও উপ-ডিগ্রীর ছোট আঙ্গিনাটুকুর ভেতরেই স্নান খাওয়া প্রভৃতির বন্দোবস্ত হলো এবং তত্ত্বাবধানের জন্য যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত বিশালকায় ও বলিষ্ঠ এক পাহাড়ী পেশোয়ারী কয়েদী পাহারাদারকে আমদানী করা হলো। সকাল থেকে সুরু করে গভীর রাত পর্য্যন্ত ডিগ্রী ও আমার দেহটিকে ঘিরে তল্লাসী যেন লেগেই রইল।

ভারতের পশ্চিম প্রান্তে আফগান সীমান্ত রেখায় দুর্ভেদ্য "ডুরাণ্ড লাইন" ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তারকে রুখে দিয়েছিল। ডুরাণ্ড লাইনের কোলে গিরিমালার বুকে পর্ব্বতের মত দেহ ও মন নিয়ে যার জন্ম হয়েছিল তার পক্ষে হুকুমের তাঁবেদার হয়ে নিরীহ মেষ-শাবকের মত জীবন যাপন করা দুঃসাধ্য। একদিন সার্জ্জেণ্ট-জমাদারের হুকুম মাফিক কাজ করতে পেশোয়ারী পাহারাদারটি অস্বীকার করলো। তাকে ওরা তিরস্কার করে মারের ভয় দেখাতেই সে ডিগ্রীর সামনেকার ছোট আঙ্গিনাটুকুতে দাঁড়িযে পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিযে আল্লাহ্‌র নাম জপ্‌তে সুরু করলো এবং প্রার্থনা জানালো "খোদা হামকো গোস্‌সাসে বাঁচাইয়ে। হামারা ছোটা ভাই গোস্‌সাসে আদ্‌মীকো মারকে কালাপানীমে ফাঁসী চলা গয়া।" এইভাবে সে তার মেজাজ ঠাণ্ডা করতে চাইলো, যেন সে ক্ষিপ্ত হয়ে তার দেহের প্রচুর শক্তির অপব্যবহার করে কোনও অঘটন না ঘটিয়ে ফেলে। কর্ত্তৃপক্ষ তখ্‌নি তাকে পাহারাদারীর কাজ থেকে বরখাস্ত করে জেলের অন্যত্র সরিযে দিল।

তারই জায়গায় এলো—বরিশাল নিবাসী দীর্ঘ দাংআজ্ঞা প্রাপ্ত একটি মুসলমান কয়েদী-পাহারাদার। মুসলমান পাহারাদারটি দূর থেকে সব রকম সাবধানী ব্যবস্থাগুলি লক্ষ্য করলো এবং যাতে সিপাহী সার্জ্জেণ্টরা তাকে কোনও ভাবেই সন্দেহ না করতে পারে তার জন্য ডিগ্রী থেকে দূরেই আমার স্নানের জল ও খাবারের থালা রেখে যেতে লাগলো। পাহারাদারটির চলাফেরার মধ্যে যেন একটি শক্ত মানুষের ইঙ্গিত পেলাম। অনুমানে মনে হলো,

ওর গলায় "খোপর"* বানানো রয়েছে এবং সতর্ক চলাফেরা এবং বিনয়-নম্র ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সে "খোপরটিকে" বাঁচাতে চাচ্ছে। একদিন সুযোগমত উপস্থিত সিপাহী সার্জেন্টদের অলক্ষিতে তার সঙ্গে চোখের ইশারায় ভাব বিনিময় হলো। সে সাহায্য করতে রাজী হলো। ইশারায় তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে চার পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণের সামান্য এক টুকরা সাদা কাগজ ও দুই ইঞ্চি পরিমাণের পেন্সিলের ভিতরকার এক টুকরা শীষ রাজবন্দী-বন্ধুদের থেকে এনে আমাকে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। বিনা বিচারে আবদ্ধ রাজবন্দীরা তখন প্রেসিডেন্সী জেলের একাংশ ভরে রেখেছিল। কড়াকড়ি ব্যবস্থার জন্য তাদের সাথে গোপন সম্পর্ক স্থাপন করা এক রকম অসম্ভব ছিল। তিন চারদিন পর খাবারের থালা রাখবার সময় একটি আঙ্গুল বাজিয়ে সে চলে গেল। সাবধানে খাবার খেলাম কিন্তু খাবারের ভিতর কোনও জায়গাই ঈপ্সিত জিনিষটি পাওয়া গেল না। কিন্তু গরাদের বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে থালা নেবার সময় দুটি আঙ্গুলের মাঝখান থেকে কালো সুতায় জড়ান এক টুকরা জিনিষ সবাইর অলক্ষ্যে সে গলিয়ে দিল। সিপাহী-সার্জেন্টদের প্রতি দৃষ্টি রেখে কিছুক্ষণ পর জিনিষ টুকরাটি উঠিয়ে আঙ্গুলের মাঝখানে চেপে রেখে দিলাম। কাগজ ও পেন্সিলের শীষ পাওয়া গেল। রাজবন্দী বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন হলো।

---

* গলনালীতে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে অথবা সূতায় বেঁধে শীষা দিয়ে কয়েদীরা নিষিদ্ধ জিনিষ তল্লাশীর বাইরে রাখবার জন্য যে ছোট গর্ত করে নেয়—তাকেই খোপর বলা হয়।

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের জন্য আবার সেই আলিপুর স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালের সামনে আমাকে হাজির করা হলো। বন্ধুরা ও আমাদের কৌশুলী সবাই আমার অপ্রত্যাশিত গ্রেপ্তারে মর্ম্মাহত। তাঁদের চোখ মুখে বেদনা পরিস্ফুট। পরাজয়ের গ্লানিবোধ তাদের অন্তরকে মথিত করে বিচারের আসন্ন রায়কে অর্থহীন করে তুলেছে। সামান্য মাত্র কথার বিনিময় হলো। পুলিশ ও পাবলিক প্রসিকিউটারের দল 'শিকার' দেখে মহাখুশি' যেন তারা আবার নূতন করে জীবন ফিরে পেলো। বিচারপতি জেমসন্ সাহেব আমাকে খানিকটা বিস্ময় ও আগ্রহের সঙ্গে দেখে বিচারে মন দিলেন। পুলিশের নির্দ্দেশের মাত্রা বেড়ে গেল।

ইতিমধ্যে নিরঞ্জন ঘোষালও ধরা পড়ে কোর্টে হাজির হলো। নিরঞ্জনকে বিশ্বাসঘাতক পার্টিসভ্য বাঁকুড়ায় ধরিয়ে দিয়েছে। তাঁর সঙ্গে ধরা পড়েছে জীবন দে।

কিছুদিন পর সীতানাথ দেও প্রায় একই অবস্থায় এসে হাজির হলো।

আমাদের গ্রেপ্তারের পর সারা দেশব্যাপী যে ব্যাপক তল্লাশী সুরু হলো, তাতে আশ্রয়-কেন্দ্রগুলি সরাসরি ত্যাগ করে ফেরারী বন্ধুরা দরদী পার্টি-সভ্যদের নিকট আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু সংগঠকদের অনেকেই ধরা পড়ে যাওয়ায় ভালমন্দ বিচার করবার সুবিধা তাদের ছিল না। সহজেই তারা পুলিশের খপ্পরে পড়ে গেল। নিরঞ্জনকে যে ধরিয়ে দিয়েছিল, তার

নাম ধাম সহ রাজবন্দীদের জানিয়ে দিলাম যেন তারা ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হতে পারে।

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শেষ হ'তে চলেছে। অনুশীলন সমিতির সারা ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক গুপ্ত-সংগঠনের কথা উল্লেখ করে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ষড়যন্ত্রের কথা, বিভিন্ন ঘটনাবলীর উল্লেখ, সাক্ষ্য সাবুদের দীর্ঘ ফিরিস্তি, প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদির বিবরণ, বিভিন্ন প্রদেশের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সাথে সম্পর্ক এবং ষড়যন্ত্রের জন্ম-রহস্য সব একে একে উদ্‌ঘাটন করে ষড়যন্ত্রের গভীরতা ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে পাবলিক প্রসিকিউটার ট্রাইব্যুনালকে বোঝাবার চেষ্টা করলো।

ষড়যন্ত্রের জন্মস্থান,—কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেল ও বক্সাদুর্গ, ১৯৩০-৩১ সাল। বিদ্রোহীরা বন্দী অবস্থায় সেখানে জমায়েত। প্ল্যান-মাফিক পলায়ন-পরিকল্পনা রচনা—প্রভাত চক্রবর্তী ও পরেশ গুহের অন্তরাল থেকে পলায়ন, বক্সাদুর্গ হতে জিতেন গুপ্ত ও কৃষ্ণপদ চক্রবর্তীর পলায়ন, অনিল দাশগুপ্তের অন্তরীণের পথে পলায়ন - ষড়যন্ত্রের প্রথম অধ্যায়।

ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশের প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করলো—

ঝরিয়া ডিনামাইট মামলা—বহু সংখ্যক ডিনামাইট "ষ্টিক্" সেখানে পাওয়া যায় এবং পার্টির বিশিষ্ট ও পুরানো সভ্য শ্রীপ্রমথ নাথ ঘোষ ও জ্যোতির্ম্ময় রায় সাত বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

কলকাতার মির্জ্জাপুরে ডিনামাইট প্রাপ্তির মামলা—এখানে আনুমানিক বারো শত ডিনামাইট "ষ্টিক" ও ফিউজ প্রভৃতি

পেয়েছিল। পার্টির বিশিষ্ট সভ্য ফরিদপুরের শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বানার্জি এই মামলায় সাত বৎসর কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

কলকাতায় "ছোট খাট একটি অস্ত্রাগার আবিষ্কারের" ফলে মামলা—বহুসংখ্যক অস্ত্র (চৌদ্দটি রিভলভার সমেত অন্যান্য জিনিষ) এখানে পাওয়া যায় এবং পার্টির পুরানো সভ্য শ্রীরাধাবল্লভ গোপ এই মামলায় চৌদ্দ বৎসরের কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

চরপাড়া ডাকাতির মামলা—এই মামলায় নরেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, সত্য রঞ্জন ঘোষ ও শশী ভট্টাচার্যাকে দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

আগরতলা ডাকাতির মামলা—কৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তী বক্সা দুর্গ থেকে পালিয়ে এসে এই মামলায় সাত বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

জলপাইগুড়ি অস্ত্র-প্রাপ্তির মামলা এই মামলায় প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর সাত বৎসর কারাদণ্ড হয় কিন্তু জলপাইগুড়ি জেল থেকে রাজসাহী জেলে স্থানান্তরিত করবার সময় পথের মাঝখানে চলন্ত ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়ে সে পালাতে সমর্থ হয় কিন্তু পরে সে হিলি-ডাকাতির মামলায় ধরা পড়ে।

টুটি-ব্যাঙ্ক লুটের মামলা (মাদ্রাজ) এই মামলায় রোশন সিং, হাজারা সিং, খুসীরাম মেহতা ও শম্ভু নাথ আজাদের দশ বৎসর করে সাজা হয়।

এরা সবাই পাঞ্জাব ও দিল্লীর সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিল।

মাদ্রাজ বোমা বিস্ফোরণের মামলা— এই বিস্ফোরণে পার্টি সভ্য ভেঙ্কট রমণ মারা যায় এবং একজনের দণ্ড হয়।

বম্মার ডাকাতি— বীরেন্দ্র চন্দ্র দে ধৃত হয়। প্রাথমিক বিচারে তাঁর চৌদ্দ বৎসর সাজা হয় (পরে আপীলে খালাস পেয়ে বিনা বিচারে বন্দী থাকে)।

লিউক-শুটিং মামলা—ভোলা রায় সাত বৎসর কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

হিলি ডাকাতির মামলা এই মামলায় বিশেষ আদালতের বিচারে চারজনের ফাঁসীর হুকুম হয়, তিন জনের যাবজ্জীবন দণ্ড, তিন জনের দশ বৎসর, তিন জনের সাত বৎসর কারাদণ্ড হয়। পরে হাইকোর্টে চারজনের মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবন দণ্ডে পরিণত হয়েছিল। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য, সত্য চক্রবর্ত্তি, সরোজ বসু ছিল ফাঁসীর আসামী, এবং আবদুল কাদের, প্রফুল্ল সান্ন্যাল, কিরণ দে ছিল যাবজ্জীবন দণ্ডের আর বিজয় বানার্জি, রামকৃষ্ণ সরকার, হরিপদ বসু ছিল দশ বৎসরের জন্য দণ্ডিত আসামী।

সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা বহু চিঠিপত্র—অর্থ উদ্ধারের ফলে ষড়যন্ত্রের ব্যাপকতার প্রমান আবিষ্কার সহজসাধ্য হয়েছিল।

প্রেসিডেন্সী জেল হ'তে পলায়ন প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত কাঁকুরগাছির ফেরারী আড্ডায় প্রাপ্ত বিশেষ ভাবে তৈরী সিঁড়ি, মোটর গাড়ী প্রভৃতি।

প্রেসিডেন্সী জেল গেটে প্রাপ্ত সঙ্কেত লিপি—। বহু জরুরী খবরে চিঠিখানা ভর্ত্তি ছিল।

দেউলী বন্দী নিবাসে লেখকের স্যুটকেসে প্রাপ্ত চিঠি--সঙ্কেত-লিপি সম্পর্কিত এই চিঠিখানার বলে লেখককে প্রত্যক্ষ-ভাবে মামলায় জড়ান সম্ভব হয়ে ছিল।

বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমার মাল মসলা এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত।

রাজসাক্ষী ও বিভিন্ন সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও অন্যান্য আরও অনেক দলিলপত্র।

সত্যেন মজুমদারের নিকট এক হাজার টাকার একখানা নোট প্রাপ্তি--অন্তরীনে যাবার পথে বাক্স তল্লাসী করে নোটখানা পুলিশ পেয়েছিল।

আমাদের কৌঁসুলী ব্যারিষ্টার শ্রী জে, সি, গুপ্ত ও শ্রীশেখর বসু এবং উকীল বন্ধুরা, শ্রীসুকুমার দাশগুপ্ত, শ্রীপূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী ও শ্রীশিশিব মৈত্র সাধ্যমত গবর্ণমেন্টের চুক্তি খণ্ডন করতে চেষ্টা করেন—বিশেষ করে শ্রী জে, সি, গুপ্ত মহাশয়ের হস্তাক্ষর সম্বন্ধে প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার যোগ্য হয়েছিল।

এবার রায় দেবার সময় হলো।

প্রধান আসামী হিসাবে প্রভাত চক্রবর্ত্তী ও জিতেন গুপ্ত পেলো – যাবজ্জীবন দণ্ড (পঁচিশ বৎসর)। অন্তরীণ আইন ভাঙ্গার অপরাধে তাদের পূর্ব্বেই পাঁচ বৎসর করে দণ্ড হয়েছিল—মোট তাদের সাজার পরিমাণ হলো ত্রিশ বৎসর।

সীতানাথ দে, ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, নরেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ও আমাকে একই সাজায় গেঁথে দিল। (যাবজ্জীবন দণ্ড—পঁচিশ বৎসর)। নরেন্দ্র ঘোষের চরপাড়া মামলার দণ্ড মিলিয়ে মোট

সাজা হলো ত্রিশ ছাড়িয়ে। নরেন্দ্র ঘোষের বর্মার কার্য-কলাপের সাক্ষ্য ও প্রমাণ এনে তার দণ্ড বাড়িয়ে দিয়েছিল।

কিশোরী দাশগুপ্ত পেলো-দশবৎসর। পার্টির বিশ্বস্ত সভ্য নোয়াখালী নিবাসী ভূপেন মজুমদার ছিল, এই মামলার একজন ফেরারী আসামী। তার হস্তলিখিত একখানা চিঠি প্রভাত চক্রবর্ত্তীর ফেরারী আড্ডায় পাওয়া যায়। পুলিশ উক্ত চিঠিখানা হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞদের দিয়ে কিশোরীর লেখা বলে প্রমাণ করে এবং ট্রাইব্যুনাল কিশোরীকে সেই চিঠির বলে দীর্ঘ দণ্ড দেয়। ইতিমধ্যে ভূপেন মজুমদার পলাতক অবস্থায় কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে ফরিদপুর, পালং আশ্রমে (স্বর্গীয় জীবন ঠাকুরতা ও শ্রীআশুতোষ কাহিলী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান) দেহান্তর করে। পুলিশ সে-খবর তখন জানতে পারেনি।

পরেশ গুহ ও মণীন্দ্র চৌধুরীকেও দশ বৎসর করে সাজা দিল। পরেশ ছিল রংপুরের বিশিষ্ট সভ্য এবং বক্সা ক্যাম্পে থাকাকালীন পার্টির উৎসাহী কর্ম্মী। মণীন্দ্র চৌধুরী একখানা চিঠি ক্যাম্প থেকে লিখে বাইরে পাঠিয়েছিল, তাতে একটি অস্ত্রের উল্লেখ ছিল। সেই চিঠিখানা প্রভাত চক্রবর্ত্তীর ফেরারী আড্ডায় পাওয়া গিয়েছিল।

জ্যোতিষ মজুমদার ও বিমল ভট্টাচার্য্যকে দিল ছয় বৎসর করে। এর পূর্ব্বে স্বতন্ত্র আইনে তাদের ও সুরেন দত্ত চৌধুরীকে পাঁচ বৎসর করে সাজা দিয়েছিল।

তারপর এলো, পাইকারী হিসাবে সাত বৎসরের সাজার তালিকা। তাতে ছিলো—হরিপদ দে, অমূল্য সেন, নিরঞ্জনঘোষাল,

হেম ভট্টাচার্য্য, প্রভাত মিত্র, সুরেন ধর চৌধুরী, দ্বিজেন তলাপাত্র, অমিয় পাল, যতীন চক্রবর্ত্তী ও সত্যেন মজুমদার।

তিন হতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে ছিল,—মেদিনীপুরের অল্প বয়স্ক সুধীর ভট্টাচার্য্য, প্রবোধ ঘোষ, শ্যাম বিহারী শুক্লা ও কুমিল্লার সুধীর ভট্টাচার্য্য, ইন্দু মজুমদার, সুশীল রায়, অবনী ভট্টাচার্য্য ও ভোলানাথ দাস।

খালাস পেলো—অজিত বসু, লক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মা (একফে পণ্ডিতজী), জ্যোতির্ময়কুল ঘোষ ও সঞ্জীব মুখার্জ্জি ও বৈজ্ঞানিক দ্বিজেন রায়।

গবর্ণমেণ্টের ঝানু প্রসিকিউটারের দল - নগেন ব্যানার্জ্জি, গুণেন সেন, বি, সি, নাগ প্রভৃতির এবং কুটিল চক্রান্তকারী পুলিশ দলের মন্মথ সেন প্রভৃতির নীতি ও চক্রান্তকে খণ্ডন ও বানচাল করবার জন্য আমাদের কৌশুলীরা তাঁদের মনীষা উজার করে দিয়েছিলেন—পারিশ্রমিকের উপযুক্ত মূল্য না নিয়ে। বিদেশী শাসকের অন্যায় প্রচেষ্টার মুখে তারা সাহসের সঙ্গে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন। ঐসময় পুলিশের কোপানল থেকে কেউ বড় একটা রক্ষা পেত না।

আমাদের মামলায় অর্থ সাহায্য ও তদবীর করবার জন্য আমাদের অনেকেরই পরিবারস্থ লোকদের যথেষ্ট ভুগতে হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমার ছোট ভ্রাতা ধীরানন্দ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবিমলানন্দ দাশগুপ্তকে হয়রানি করবার ফলে আমি বিশেষ আদালতের শরণাপন্ন হ'তে বাধ্য হয়েছিলাম।

হিলি মামলার আসামীদের সমর্থন করবার জন্য দিনাজপুরের শ্রীনিশীথনাথ কুণ্ডু ও হিলির উকীল শ্রীবরদা চক্রবর্ত্তীকে শুধু হয়রাণি ভোগ করতে হয়নি, পুলিশ তাঁদের শেষ পর্য্যন্ত বিনা বিচারে আবদ্ধ করে রেখেছিল।

আন্তঃপ্রাদেশিক মামলা শেষ হলো। দীর্ঘ দুই বৎসরের মিলন-স্থান ছিল---বিচারালয়ের এই কাঠগড়া। আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

একুশ

এবার সাজা খাট্‌বার পালা।

বাংলার সেন্ট্রাল জেলগুলো বিশেষ করে মেদিনীপুর, ঢাকা ও রাজশাহী তখন হয়ে উঠেছিল—কসাইখানার নামান্তর। একবার এই জেল ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় ঘট্‌লে আন্দামান কেন, জাহান্নামে যাবারও আগ্রহ এবং অধীরতা সঙ্গে সঙ্গেই এসে যেতো। এ সব জায়গায় বিপ্লবী-বন্দীদের ওপর যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হতো, তাতে নরকের বর্ণনাও ছোট হয়ে যেতো। বাংলার পুলিশ ও জেল কর্তৃপক্ষের সেই হীন অত্যাচারের ও মৃত্যুর চেয়েও অধিক যন্ত্রণাদায়ক ব্যবস্থার কাহিনী আজও লিপিবদ্ধ হয়নি। অপমানে, লাঞ্ছনায়, বর্ব্বরতার সীমাহীন বিস্তারে বিপ্লবী বন্দীদের জীবন হয়ে উঠেছিল মূল্যহীন। প্রতিটি দিন ছিল—অজানা-আশঙ্কায় ভরা; প্রতিটি মুহূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল—জল্লাদের মুহূর্ত্ত।

শীঘ্রই একদল বন্ধুকে পাঠিয়ে দিল, মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে—কসাইখানা গুলোর অন্যতম প্রধান-কেন্দ্র। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের প্রসিদ্ধ "দুইশত ডিগ্রী" নামে পরিচিত প্রকোষ্ঠগুলির মধ্যে বিপ্লবীরা বন্দী—ডিগ্রীগুলি সারিবদ্ধ ভাবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আলো-বাতাসহীন গুমোট অন্ধকারের

ভিতর মনের আলো জ্বালিয়ে বিপ্লবী বন্দীরা চরম নির্য্যাতনের ভিতর দিয়ে দিন গুনছে। কুখ্যাত জেলার হরেন সেন ও ডেপুটি জেলার অবণী রায় ও ভারতীয় আই, এম, এস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গুলা ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষকে খুসী করবার জন্য সদা-তৎপর। নামমাত্র সুযোগের অছিলায় মাঝে মাঝে লাঠি-সোটা নিয়েও তারা আক্রমন করছে, আবার কাউকে বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করে দিয়ে বিপ্লবীদের তাজা খুনের ফোয়ারা দেখিয়ে প্রভু-ভক্তির পরিচয় দিচ্ছে। তবুও বিপ্লবীদের জীবন চলেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন তাদের প্রাণের ওপর ও আক্রমণ হবে।

আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র ও অন্যান্য বিভিন্ন মামলার অমূল্য সেন, হরিপদ দে, জ্যোতিষ মজুমদার, ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিজয় বানার্জ্জি, পরেশ গুহ, কালী বানার্জ্জি, কালী চক্রবর্ত্তী (ময়মনসিং) সুরেশ দে, দুর্গা সিং, ভবেশ তালুকদার, ননী মুখার্জ্জি প্রভৃতি অত্যাচারের মরসুম ভোগ করছে। আলিপুর জেল থেকে পালাবার পর সারা বাংলার জেলগুলিতে যে অত্যাচারের বন্যা সুরু হয়ে গেলো, তাতে দল নির্বিবশেষে প্রতিটি বিপ্লবী সভাই তার ভাগীদার হয়েছিল—প্রত্যেকের পায়ের সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া হয়েছিল ন্যূন্যতম এক জোড়া করে লোহার-বেড়ী। বেত্র দণ্ডের সদ্য অভিজ্ঞতা লাভ করে প্রাচীন বিপ্লবী শ্রীননী মুখার্জ্জি ও সুরেন সরখেল সেখানে আছে। সুর্য্য সেনের তখন ফাঁসী হয়ে গেছে। তাঁকে আশ্রয় দেবার অপরাধে মাতা ও ছেলে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে সাত বৎসরের কঠোর কারাদণ্ড নিয়ে বন্দী। ছেলে রামকৃষ্ণ যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়ে জেলের

হাসপাতালে নাম মাত্র চিকিৎসাধীন আছে। তাঁর পা দু'খানাতে ডাণ্ডাবেড়ী পরিয়ে দেওয়া হয়েছে—দুর্ব্বল শরীর লোহার ডাণ্ডা বইতে পারছে না। মা রুগ্ন ছেলেকে একবার দেখবার জন্য জেলের ছোট বড় সাহেবদের নিকট আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছে, কিন্তু তারা পাষান-প্রাচীরের মতই অটল।

ক্রম বর্দ্ধমান অত্যাচারের মাত্রা দেখে বন্ধুরা বুঝতে পেরেছে যে খুব শীঘ্রই তাদের জীবনের ওপর আক্রমণ হবে, তাই তারা নিজেদের প্রকোষ্ঠের বাইরে যেতো না যাতে ওরা বাগরে পেয়ে কোনও অছিলায় আক্রমণ করতে না পারে। তবুও ওরা সুযোগ করে নিল। আক্রমণ হলো। জেলের সিপাহীর দল নির্ব্বিচারে মাথা সই করে লাঠি চালাতে সুরু করলো। আক্রমণ প্রতিরোধ করা ছাড়া উপায় রইল না। অমূল্য সেন তার বলিষ্ট হাত দিয়ে নিজের মাথা বাঁচিয়ে লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে জবাব দিতে সুরু করলো—দু'চার জনকে ধরাশায়ী করলো কিন্তু সমগ্র সিপাহী বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। অমূল্য সেনের সংজ্ঞাহীন দেহ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রইল—অপরাপর বন্ধুরাও সবাই গুরুতর আহত। অমূল্যর সংজ্ঞাহীন দেহ নিয়ে গেলো জেলের হাসপাতালে মৃত্যু-কালীন জবান বন্দী লিখবার জন্য যেন আইনের কাছে জল্লাদদের সঠিক পরিচয় সে দিয়ে যেতে পারে। জল্লাদদের দল তার শেষ কথা শোনবার জন্য সংজ্ঞাহীন দেহটিকে ঘিরে রয়েছে। কিন্তু "মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী?"—অমূল্য সেন বেঁচে গেলো। দীর্ঘ কাল পর তার জ্ঞান ফিরে এলো। সে দেখতে পেলো, তার পাশে বসে আছে শীর্ণ দেহ নিয়ে যক্ষ্মা

রোগাক্রান্ত রামকৃষ্ণ—ড্যাণ্ডাবেড়ীর ভারে সোজা হয়ে দাঁড়াতে অক্ষম। ক্ষীণ কণ্ঠে অমূল্য সেনকে ভরসা দিয়ে সে আবার চলে গেলো তার নির্দ্দিষ্ট শয্যায় হামাগুড়ি দিয়ে, পায়ের শিকল টেনে-টেনে। মৃত্যুপারের যাত্রী—সান্ত্বনা দিতে এসেছিল তারই সতীর্থকে। অমূল্য সেন রক্ষা পেলো ভাঙ্গা-হাত ও ভাঙ্গা মাথা নিয়ে, কিন্তু রামকৃষ্ণের জীবন-দীপ শেষ হয়ে এলো। কাটারিয়া তখন জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। বিপ্লবী বন্দীরা সবাই তাকে অনুরোধ করলো--মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্রকে জীবন্তে দেখবার জন্য মাতার আকুল প্রার্থনা যেন সে মঞ্জুর করে এবং তার পা'দুখানাকে ডাণ্ডাবেড়ী থেকে মুক্ত করে দেয়। আবেদন না-মঞ্জুর হলো। রামকৃষ্ণের জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হলো। শোকাতুরা মাতাকে মেয়েদের "ডিগ্রী" থেকে নিয়ে এলো সন্তানকে দেখাবার জন্য- সন্তান মৃত কিন্তু ডাণ্ডাবেড়ীর বন্ধন তখনও জীবন্ত হ'য়ে রয়েছে। জেল ও পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের নারকীয় ব্যবহারের একটি মাত্র উৎকট দৃশ্য।

নিরঞ্জন ও আমাকে মফঃস্বলের অত্যাচার-কেন্দ্রে পাঠাবার সুযোগ কর্ত্তৃপক্ষ পেলো না। টিটাগড়কে কেন্দ্র করে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম ও ষড়যন্ত্রের দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় আর এক দফা আমাদের আসামী হ'তে হবে।

নিরঞ্জনের পায় ডাণ্ডাবেড়ী পরান হয়েছে। তারও মাথায় লাল টুপী চড়েছে (পলাতক আসামীদের পৃথক করে দেখাবার ব্যবস্থা)।

অস্ত্র-আইনের অপরাধে আমাদের সাথে রাখবার জন্য নিয়ে এলো, আরও দুইজনকে—রমেশ ও তারাপদ। সে-সময় অস্ত্র পেলেই সন্ত্রাসবাদী বলে গণ্য হ'তো, অন্য কোনও বিচার করতো না। তাদেরও বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হলো কিন্তু তা' ছিল অনেকটা হালকা ধরণের শিকল-বেড়ী—চলাফেরা তাতে অনেকটা সহজ।

এবার এলো, বিদেশী পাঁচজন চৈনিক নাবিক। তারা কলকাতার ডকে চড়া দামে রিভলবার বা পিস্তল বিক্রী করতে চেয়েছিলো—মাল সহ পুলিশ নাকি তাদের ধরেছে। লর্ড সিংহার পুত্র—এস, কে, সিংহ ছিল তখনকার কলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট (১৯২২ সালে রেল ও ষ্টীমার ধর্ম্মঘটের সময় স্বর্গীয় জে, এম, সেন গুপ্ত পরিচালিত সত্যাগ্রহীদের ওপর গুলি চালিয়ে 'নাম' করেছিলেন)। সন্ত্রাসবাদীদের বিচারে বা অস্ত্রপ্রাপ্তির মামলায় তার নিকট কোনও উদারতা বা ক্ষমা ছিল না। বিচারে দেশী-বিদেশী বা অজ্ঞতা-বিজ্ঞতার কোনই প্রভেদ তিনি করতেন না। "কলোনিয়েল" (ঔপনিবেশিক) জজের ম্যাগনা-কার্টা বিবর্জ্জিত মেজাজ দিয়ে হতভাগ্য চৈনিকদের তিনি বিচার করলেন। অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে সাত বৎসর কারাদণ্ড নিয়ে তারা আমাদের প্রতিবেশী হ'য়ে এলো।

আমাদের কড়াকড়ি ব্যবস্থাগুলো সবই বজায় আছে, তবুও তার মধ্যে খানিকটা শিথিলতা এসেছে। আধ ঘণ্টা করে ডিগ্রী ও উপ-ডিগ্রীর বাইরের আঙ্গিনায় বেড়াবার অনুমতি হয়েছে। আঙ্গিনার এক ভাগ নিরঞ্জন, রমেশ ও তারাপদের জন্য আর এক ভাগ আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। আমাদের পরস্পর কথাবার্ত্তা

ও মেলামেশা নিষিদ্ধ। Equator বা বিষুব রেখার মত এই ভাগকে মনে রাখতে হতো। Equator আছে অথচ দাগ নেই, তেমনি আঙ্গিনার মাঝখানটা আছে কিন্তু চিহ্ন নেই। দু'দল প্ল্যান করেই হোক্ বা স্বাভাবিক ভাবেই হোক্ দু' দিক হতে এসে মিলে যেতাম। পাশের ডান-বায়ের সিপাহীরা সঙ্গে সঙ্গে চলতো, তারা খট্ করে বুটের আওয়াজ দিয়ে জানিয়ে দিত—আর এগোবেন না অর্থাৎ আমরা সীমানায় এসে পড়েছি। আমরাও ঝন্ ঝন্ ঝন্ শব্দ করে ডাণ্ডাবেড়ী নিয়ে ঘুরে যেতাম। এই সময় চীনা নাবিকদের সঙ্গে দেখা হতো। তারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে তাদের মনের কথা প্রকাশ করতো যাকে Pigeon English বলা হয়। তাদের বয়স অনুমান করা কঠিন ছিল তবুও একজনের কথায় বুঝে নিলাম যে তার বয়স প্রায় ষাটের মত হবে।

সে-সময় প্রেসিডেন্সী জেলে বিপ্লবী বন্দীদের আরও বেশী সায়েস্তা করবার জন্য সুদূর সিন্ধুদেশ থেকে আরউইন ষাড়ের মত (Irwin Bulls) এক জোড়া আই, এম, এস পর পর আনবার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রথমটির নামের পদবী ছিল, কাটারিয়া আর দ্বিতীয়টির পদবী ছিল, বালিগা। ইংরেজ সার্জেন্টগুলি নিজেদের গলা দেখিয়ে কাটারিয়ার বর্ণনা দিত—Cutter অর্থাৎ গলা-কাটা আদমী। তার নিত্য নতুন অত্যাচারের স্বরূপ দেখে একজন সাধারণ প্রবাসী বাঙালী কয়েদী (পশ্চিমের জেল থেকে বাংলায় মেয়াদের অবশিষ্ট অংশটুকু খাটবার জন্য তাকে তখন এনেছিল) অনুমান করে বলল যে কাটারিয়া সাহেব নিশ্চয়ই সিন্ধুর

অধিবাসী কারণ তার অভিজ্ঞতায় ভারতে নিষ্ঠুরতম অপকার্য্যের স্থান হলো সিন্ধু প্রদেশ—সে তারই উপযুক্ত সন্তান। জেলের সমস্ত কয়েদী এমন কি অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত তার অত্যাচারে অস্থির হয়ে পড়েছিল।

দৈনন্দিন কাজের চাপ এমনিই অসহনীয় হ'য়ে উঠেছিল কিন্তু কাটারিয়ার আগমনে তা একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো। সকাল ছয়টা থেকে স্বুরু করে বিকেল পাঁচটা পর্য্যন্ত খেটেও আমরা কেউ নির্দ্দিষ্ট কাজ সম্পুর্ণ করতে পারতাম না। নিরঞ্জন আমার চেয়ে কাজ বেশী দিতো কিন্তু আমি তো অর্দ্ধেকটার বেশী দিতে পারতাম না। কাজ কম হলেই, রাত্রির জন্য শাস্তির ব্যবস্থা হতো - হাত দু'খানায় শিকল পরিয়ে দিত। অর্থাৎ হাত পা বাঁধা অবস্থায় ঘুমোতে হতো। তা' ছাড়াও জেলে হরেক রকম সাজা দেবার ব্যবস্থা ছিল। দিনের বেলায় যে সব রকমারী সাজার ব্যবস্থা ছিল, তার মধ্যে একটি হলো-দেয়ালের গায় লাগানো লোহার কড়ার সাথে হাত দু'খানাকে শিকল দিয়ে এঁটে ডাণ্ডাবেড়ী সহ সারাদিন দাঁড় করিয়ে রাখা। আর এক রকম হলো, ডাণ্ডাবেড়ী খুলে নিয়ে দু'পায়ের পাতার ওপরকার গাঁটে দুইটি লোহার কড়া পরিয়ে এক ফুট পরিমাণের একটি লোহার ডাণ্ডা কড়া দুইটির সঙ্গে এঁটে দেওয়া, যেন পা দু'খানার মধ্যে এক ফুট ফাঁক থাকে এবং যাতে চলবার সময় তিন চার ইঞ্চির বেশী একবারে এগোতে না পারে। শোবার সময় বা মলমূত্র ত্যাগ করবার সময় এই ধরণের

বেড়া খুবই কষ্টকর হতো—এর চলতি নাম, 'আউলা বেড়ী, ইংরেজী নাম—cross-fetters।

ডাণ্ডা বেড়া, আউলা বেড়ী বা হাতের শিকলে মানুষটির চেহারা বা "শকলের" পরিবর্ত্তন তেমন হতো না কিন্তু তাকে পরিবর্ত্তন করে অদ্ভুত দেখাবার ব্যবস্থাও ছিল। কতগুলি চটকে সেলাই করে জাঙ্গিয়া, টুপী, কোর্ত্তা বানিয়ে দিত এবং তা পরতে হতো। গরমের দিনে এই পোষাক একেবারেই অসহনীয় ছিল। খাবারের ব্যবস্থার ভেতরেও সাজা দেবার বন্দোবস্ত ছিল। প্রত্যেক কয়েদীর জন্য চাল, ডাল, তেল, নুন, কয়লা ও তরকারীর সরকারী বরাদ্দ রয়েছে। সেই বরাদ্দ চাল, ডাল, তরকারী ইত্যাদি সাজা-প্রাপ্ত কয়েদীকে অনেক সময় আলাদা করে পাক করে খেতে বলা হতো এবং পাক করবার জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ এক ঢেলা কয়লাও তাকে দিত। তার ওজন হতো আধপোয়া। আর সিগারেটের কৌটার মত একটি ছোট্ট কৌটাকে চুলার মত করে ব্যবহার করবার জন্য দিয়ে যেতো যাতে কয়েদী নিজের বাটিতে সব রান্না করে খেতে পারে (একটি বাটি আর একখানা থালা তার বাসন পাত্রের যা'কিছু সম্বল) কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ক্ষুধার জ্বালায় সবই কাঁচা বা অর্দ্ধ-সিদ্ধ তাকে খেতে হতো। এই সাজাগুলি সবার ওপর না এলেও বিপ্লবী বন্ধুদের অনেককেই তা ভোগ করতে হয়েছে।

চীনদেশীয় লোকেরা সাধারণতঃ খাটুনিতে পরাজিত হয় না। এবার তারা ও পরাজিত হলো। আমাদের মতই চরকা ঘুরিয়ে

তাঁতিনী [illegible] দেওয়ান কাজ [illegible] দিয়েছে [illegible] তারা [illegible] [illegible] ডেপুটি [illegible] [illegible] কেন [illegible] থেকে [illegible] কাটালো। [illegible]

[illegible] ভাগো [illegible] কথা মনে হলে, [illegible] Catch Police Magis ten years India dog. Her work all finish. [illegible] ম্যাজিস্ট্রেট [illegible] দিয়েছে, [illegible] (অর্থাৎ [illegible]) [illegible] কাজ সাব মৃত্যু।

ইংরেজ সার্জেন্টদের আমাদের সঙ্গে [illegible] দেখলেই সাবধান করে দিয়ে বলতো, ‘No Talk English Eat India, Eat China, Eat All. ইংরেজ দেখলেই বলতো— ভারত খেয়েছে, চীন খেয়েছে, সবই খেতে চায় ওদের সঙ্গে কথা বলবে না।

বুড়োর লণ্ডনে এক ইংরেজ-পত্নী ছিলো, আর ছিলো চীন দেশে তার চৈনিক-পত্নী, নাবিকের জীবনের আলোক-স্তম্ভ।

তাঁদের কথা আমাদের বলবার সময় সে চোখের জল ফেলত। মাঝে মাঝে তাদের খবর পাবার আশা নিয়ে চীয়াং-কাই-সেখের কলকাতার দূত (কন্সাল) এর সঙ্গে জেলের গেটে দেখা করতো। ফিরে আসতো, বিমর্ষ হয়ে আর বলতো—No News China London Give News How get Pistol--Dog-Dog-Dog—কন্সাল চীনদেশের বা লণ্ডনের কোন খবরই দেয় না—কেবল সে জানতে চায়, কোথা থেকে পিস্তল পেয়েছি, কুত্তা, কুত্তা, ইত্যাদি! হাড় ভাঙ্গা খাটুনি, নিকৃষ্টতম খাবার, নির্য্যাতন, ও আলো-বাতাসহীন সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠের মধ্যে বাস করার ফলে বুড়োর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ল এবং গুরুতর পীড়িত অবস্থায় তাঁকে জেল হাসপাতালে নিয়ে গেলো। একদিন খবর পেলাম, বুড়ো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। চীয়াং-এর রাষ্ট্রদূতের ওপর ভার—তাঁর পত্নীদের নিকট খবর পাঠানো। দীর্ঘকাল ধরে তারা হয়তো তাঁর খবরের আশায় অপেক্ষা করেছে,—সমুদ্রের পারে বা মাঠের দিকে চেয়ে।—কিন্তু তারই দেশের রাষ্ট্রদূত যে ব্রিটিশের গুপ্তচর! পথ চেয়ে চেয়ে চোখ অন্ধ হয়ে গেলেও তাঁরা খবর পেয়েছিল কিনা, সন্দেহ!!

বাইশ

টিটাগড়ে ধরা পড়বার পর গভর্ণমেণ্টের পক্ষে মামলা চালাবার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ-কর্মচারী মন্মথ সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য চিঠি দিলাম। মন্মথ সেন জেলে এসে দেখা করলো। তার সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্য ছিল--টিটাগড়ে প্রাপ্ত জিনিষপত্র ও সাক্ষ্য সাবুদের বলে নূতন করে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধোদ্যমের প্রচেষ্টার মামলা যখন সুনিশ্চিত তখন দলকে বাঁচাবার জন্য মামলাকে সংক্ষেপ করে দেওয়া। তাকে প্রস্তাব দিলাম, যদি বেশী লোককে না জড়িয়ে প্রাপ্ত জিনিষপত্র ও সাক্ষ্য সাবুদের বলে টিটাগড়ে ধৃত তিনজনকে নিয়েই মামলা করাবার জন্য সে গবর্ণমেণ্টকে রাজী করাতে পারে তবে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম ও ষড়যন্ত্রের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি স্বীকার করে নেব এবং তার জন্য মৃত্যুদণ্ডও নিতে আমি প্রস্তুত থাকব। পারুল ও শ্যামবিনোদকে যথাক্রমে দশ বৎসর ও যাবজ্জীবন দণ্ড নেবার জন্য আমি রাজী করাতে চেষ্টা করবো। মন্মথ সেনের কথায় মনে হলো, সরকার পক্ষ মামলা সাজাবার কাজে অনেকখানিই অগ্রসর হয়েছে। বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র মামলায় গোড়ার কথা হ'লো, স্বীকারোক্তি। সে দিক দিয়ে পুলিশ হয়তো বিশেষ সুবিধা করতে পেরেছে, যার জন্য সে প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হলো না।

কিছুদিনের মধ্যেই সনাক্ত করবার হিড়িক পড়ে গেলো। বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক এনে সনাক্ত-করণ অভিনয় সুরু হলো। সনাক্ত করবার সারিতে কিছু সংখ্যক ভদ্রবেশ-ধারী লোকের মধ্যে আমাকে এক জায়গায় দাঁড়াতে হতো। বাইর থেকে যারা আসতো তারা সারির সামনে এসে আমাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিত। পুলিশ তাদের আগে থেকে ফটো দেখিয়ে অথবা চেহারার বর্ণনা দিয়ে বা অন্য কোনও ইঙ্গিত দিয়ে এমন করে প্রস্তুত করতো যে তারা ভুল করতো না। কিন্তু একদিন একটি লোক ভুল করে বসল। সামনে এসে ও আমাকে সঠিক ভাবে ধরতে না পেরে, আমার নিকটস্থ দুইজনকে ছাড়িয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলো আমাকে দেখাবার জন্য (বোধ হয় কোন ইঙ্গিত পেয়ে)। কিন্তু পাহারায় নিযুক্ত সার্জেন্ট এডওয়ার্ড দৌড়ে এসে তাকে সরিয়ে নিয়ে গেল এবং সনাক্ত করবার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলল যে এটা সম্পূর্ণই বে-আইনী কারণ দ্বিতীয়বার কেউ সারিতে ফিরে আসতে পারে না। ম্যাজিষ্ট্রেট ও তার কথা মেনে নিতে বাধ্য হলো।

আবার আলিপুরে কোর্টেই টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা সুরু হলো। ট্রাইব্যুনালের বিচারক ছিলেন তিনজন—প্রেসিডেন্ট কে, সি, দাসগুপ্ত, আই, সি, এস (বর্ত্তমানে হাইকোর্টের জজ্), মিষ্টার বিভার আই, সি, এস ও মিষ্টার এন, কে, বসু, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। সরকার পক্ষে পাবলিক প্রোসেকিউটার, জে, সি, মুখার্জি (নগেন বানার্জি ইতিমধ্যেই মারা গেছে), বি, সি, নাগ প্রভৃতি, আর আমাদের পক্ষে ছিলেন, ব্যারিষ্টার জে, সি, গুপ্ত ও

শেখর বসু, এডভোকেট শ্রীমন্মথ নাথ দাস, পূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী, সুকুমার দাশ গুপ্ত ও শিশির মৈত্র।

মামলাকে সাজিয়ে গুজিয়ে যাতে চরম শাস্তির ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য ছিলো, সরকার পক্ষে কুটিল চক্রান্তকারী পুলিশ-উপদেষ্টা মন্মথ সেন।

বত্রিশ জনকে আসামী করা হলো। বেলঘরিয়া বাসায় ধৃত সিলেটের প্রীতি রঞ্জনই ছিলো, প্রধান আসামী। তারপর আমরা সবাই— প্রফুল্ল সেন, ধনেশ ভট্টাচার্য, পারুল মুখার্জি, শ্যামবিনোদ পাল চৌধুরী, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শান্তিরঞ্জন সেন, প্রভাংশু বিমল দত্ত, নিরঞ্জন ঘোষাল, মাখন লাল কর, নরেন্দ্র ঘোষ, বিভূতি ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ বানার্জি, জগদীশ ঘটক, কালীপদ ভট্টাচার্য, হরেন্দ্র মুন্সী, ধীরেন্দ্র ধর, কার্ত্তিক সেনাপতি, অজিত মজুমদার, দেবব্রত রায় (সিলেট) জীবন দে, জুড়ান গাঙ্গুলী, ভাবন খুশী, বীরেন বসু, সীতানাথ দে, সন্তোষ সেন (রাজসাক্ষী), বিজয়পাল চৌধুরী (রাজসাক্ষী), সুনীল বসু (রাজসাক্ষী)।

বিপজ্জনক রাজসাক্ষী হ'য়ে দাঁড়ালো, সন্তোষ সেন। তার স্বীকারোক্তির ফলে দক্ষিণ বাংলার সংগঠন, বিশেষ করে বরিশাল ও খুলনার, প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং বহু পার্টি-সভ্য ও দরদী ধরা পড়ে গেল। পার্টির দরদী সভ্য ও শিক্ষক শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্যকে আসামী শ্রেণী ভুক্ত করলো এবং খুলনার কাকীমা এবং তাঁর স্বামী বিজয় বসু ও গ্রেপ্তার হলেন। কাকিমার ছেলে সুনীল ছিল, পার্টি সভ্য। পুলিশের চাপে এবং মা ও

বাবাকে বাঁচাবার জন্য সে শেষ পর্য্যন্ত রাজ-সাক্ষী হ'য়ে দাঁড়ালো। সন্তোষ সেনের স্বীকারোক্তির ফলে লুকোন বন্দুকটির সন্ধান করতে গিয়ে তাদের বাড়ীখানার মাটি নাকি পুলিশ চষে একাকার করে দিয়েছিল। ফরিদপুরের বিজয়পাল চৌধুরী ও রাজসাক্ষী হ'য়ে দাঁড়ালো।

বিপ্লবীদের পক্ষে সামান্যতম স্বীকারোক্তি ও দোষনীয়। শুধু যে বৈপ্লবিক চরিত্রের দৃঢ়তার অভাব তাতে প্রকাশ পায় তা নয়, তাতে সংগঠনের যে ক্ষতি হয় তা পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। মারের চোটে, অথবা মারের ভয়ে বা নিজের শাস্তিকে লঘু করবার আশায় স্বীকারোক্তি করার উদাহরণ সকল বিপ্লবী মামলাতেই ছিল তা' থেকে আমাদের ও অব্যাহতি পাবার কথা নয় কিন্তু প্রধান অথবা দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যে রাজ সাক্ষী তো দূরের কথা সাধারণ স্বীকারোক্তিও আশা করা যায় না। সন্তোষ সেন ছিলো সংগঠনের সঙ্গে অনেকটা পরিচিত, তাই তার রাজসাক্ষী হবার ফলে বিষম ক্ষতি হলো।

রাজসাক্ষীদের বাদ দিয়ে আমাদের সবাইকে ডেকে একত্রে রেখেছে। সেখানে জানা গেলো, পুলিশের অত্যাচারের হাত থেকে কেউ বড় একটা রেহাই পায় নি। এমনকি নারী আসামী ও বাদ যায় নি। ধরা পড়ার পর পুলিশ হেড্-কোয়ার্টারসএ নিয়ে গিয়ে কুখ্যাত গোয়ান্দা অফিসার সন্তোষ গুপ্তের হাতে তাকে ছেড়ে দেয়। অকথ্য বর্ব্বর ভাষার তূণগুলি নিক্ষেপ করেও যখন সে কোনও স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারল না তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে পারুলকে উৎপীড়নের জন্য

ছুটে গেল। পারুল চীৎকার করে ও জুতা ছুড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে কিন্তু রুখতে পারছে না। এমনি সময় চীৎকার শুনে পার্শ্বস্থ জনৈক গোয়েন্দা অফিসার ছুটে এসে অবস্থা দেখে সন্তোষ গুপ্তকে সাবধান করে বলল "আপনি আপনার পরিণাম বুঝতে পারছে না --আপনার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে"। ভয় পেয়ে সে নিরস্ত হলো— পারুল জানোয়ারের হাত থেকে রক্ষা পেলো।

বৈপ্লবিক আন্দোলন বিস্তারের সাথে সাথে মেয়েরা ও পুরুষের মতই স্বাধীনতার সংগ্রামে সক্রিয় ভাবে যোগ দিতে সুরু করে যার ফলে শান্তি, সুনীতি, প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার, উজ্জ্বলা ও বীনা দাসের কর্ম্ম-কীর্ত্তিতে বিপ্লব-ভূমি মুখর হয়ে উঠেছিল। বৈপ্লবিক আন্দোলনের এই সম্মিলিত সংগ্রামকে বাধা দেবার কোনও সহজ পথই পুলিশের ছিলনা। একমাত্র হীন-প্রচার ও পাশবিক অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে আন্দোলনকে তারা ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছিল।

আমাদের দুইজনকেই ছুটির দিনগুলোতে পূরা খাটুনি দিতে হচ্ছে। মেদিনীপুর জেলকে সায়েস্তা করে কাটারিয়া তখন সবেমাত্র প্রেসিডেন্সী জেলে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হ'য়ে এসেছে। কলকাতার জেলে, এই তার প্রথম-পদার্পণ। অল্পদিনের মধ্যেই জেলখানা গরম হয়ে উঠল।

প্রেসিডেন্সী জেলে (পুরানা জেল নামে পরিচিত) বাংলার ও ভারতের বহু জায়গা থেকে কয়েদীদের এনে রাখবার ব্যবস্থা ছিল। জেলের কড়া নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়েও তারা তাদের জীবন

যাত্রার উপযোগী ব্যবস্থা করে নিত। নিষিদ্ধ জিনিষ যথা, চরস, আফিং, তামাক, বিড়ি, কোকেন সবই সেখানে পাওয়া যেতো কিন্তু বাজার দরের উঠানামা ছিল—তামাকের দর ছটাক এক টাকা হতে দুই টাকাও হতে পারত। কাটারিয়া সাহেব আসবার পর থেকেই দর বেড়ে গেল, এমনকি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠল। নানা অছিলায় জেলখানার শাস্তিমূলক কুঠরীগুলি ভরে গেলো। কয়েদীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। এমনকি স্বভাব-দুর্বৃত্ত কয়েদীদের গলার ভিতরকার থোপরটি তল্লাসী করে নিষিদ্ধ জিনিষ বের করবার চেষ্টায় হতো - গলা টিপে শ্বাস রোধ করে। যদি সফল না হতো, তবে কম্বল-ধোলাইর ব্যবস্থা করতো অর্থাৎ কম্বল দিয়ে কয়েদীর দেহকে জড়িয়ে নিয়ে উপর হতে পিটোন হতো যেন গায়ে কোনও দাগ না পড়ে। এ সব দেখেই সার্জেন্টরা ওর নাম দিয়েছিল, 'কাটার' (Cutter).

চুয়াল্লিশ ডিগ্রীর উঠে নীল খালি জান গাটুলুর মধ্যে বিকেল বেলায় নিয়ম মত একদিন আধ ঘন্টা বেড়াবার জন্য নিয়ে এলো—সিপাহীরা দুইজন আমার দুই পাশে রয়েছে। গরমের দিন। নিরঞ্জন রমেশ, ও তারাপদকে নিয়ে প্রাচীরের সংলগ্ন জলের কলটিতে স্নান করতে যাচ্ছে দেখে সিপাহী আপত্তি করলো কিন্তু ওরা কেউ তার আপত্তিতে কান দিল না। গালি দিচ্ছে দেখে, সিপাহীটিকে সংযত ভাষায় কথা বলতে বললাম কিন্তু সে তাতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সিপাহীটি ছিল পাঠান, তাকে ধমক দিতেই সে যেন বর্বরতার উদ্দাম বন্যা ছেড়ে দিল। তার গালি আমার অন্তরাত্মাকে বিদ্রোহী করে তুলল এবং ডাণ্ডা-বেড়ী

নিয়েই আমার সিপাহীদের বেষ্টনী ভেঙ্গে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে ভিজে জামা কাপড় নিয়ে নিরঞ্জন, রমেশ এবং তারাপদও এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কয়েক ঘা মেরে বর্ব্বরতার জবাব দিতেই আমার পার্শ্বস্থ সিপাহীরা পাগলা বাঁশি বাজিয়ে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে জেলের চার দিক হতেই বাঁশি বেজে উঠল। সঙ্গীন অবস্থা উপলব্ধি করে নিরঞ্জনকে তার সেলের ভিতর ঠেলে দিয়ে আমি ও আমার সেলের দিকে দৌড়ে গেলাম। ভারপ্রাপ্ত সার্জ্জেন্ট-ওকশট-অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে দৌড়ে এসেই আমাকে ধাক্কা দিয়ে সেলের ভিতর ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে কাটারিয়াও তখুনি এসে হাজির হলো—উন্মত্ততার ছাপ তার চেহারায়। আমাকে সেলের ভিতর অর্গল-বদ্ধ অবস্থায় দেখতে পেয়ে, সে ক্ষিপ্ত হয়ে সার্জ্জেন্ট ওকশটকে ভৎ‍‍র্সনা করে বলল, "ওকে মেরে ফেলবার সুবর্ণ সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম। ওকে যদি ঢুকতে না দিতে তবে বাইরেই অনায়াসে আজ আমরা গুলি করে মেরে ফেলতাম, তাতে এক কলম মাত্র লাল কালি আমার খরচ করতে হতো"। কথাগুলি শুনে আর ওর অসভ্যতা দেখে চুপ করে থাকতে পারলাম না। সেলের ভিতর থেকেই বুক পেতে দিয়ে বললাম,— "সাহস থাকে তো গুলি করে এখুনি আমাকে হত্যা করো— চেঁচামেচি আর অসভ্যতা করো না"। তবুও খানিকক্ষণ ধরে সে চেঁচামেচি করলো এবং ভয় দেখাবার জন্য বন্দুকের কতকগুলি ফাঁকা আওয়াজ করে সে প্রস্থান করলো। জেলখানা আরও গরম হয়ে উঠল।

ওরা চলে যাবার পর মনে হলো, যেন মনের স্থৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছি। সামান্য কারণে আজ আমরা প্রাণ হারাতে বসেছিলাম—শত্রুকে সুবর্ণ সুযোগ দিয়েছিলাম। প্রেসিডেন্সী জেলের ইটের লাল মাটির ওপর আমাদের নিঃসার দেহ পড়ে থাকত, আর ওরা লিখত, ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদীরা সিপাহীকে মেরে জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করছিল, কেবল ত্বরিত হস্তক্ষেপে তা ব্যর্থ হয়েছে এবং দুইজন মাত্র সন্ত্রাসবাদী মারা গিয়েছে। রাজকীয় ঘোষণার সময় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়তো এর জন্য কোনও সম্মানজনক পদবী ও পেতে পারতো। বিদ্রোহী মন ভাবে, বেঁচেই যখন গিয়েছ একবার ঐ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে দেখাও না—কেমন করে সে আস্ত আস্ত কথাগুলি বলে সেরে যায়! কোর্ট তো এখনও শেষ হয় নি, শেষ হবার কিনারায় শুধু এসেছে।

ইংরেজের শাসন পরিচালন ব্যবস্থায় সর্ব্বত্রই সবলতার ছাপ রয়েছে। পরের দিন কোর্টে উপস্থিত হয়ে বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিচারকদের কাছে ঘটনাটি বিবৃত করে প্রতিকারের দাবী জানালাম। তাঁদের জানালাম, প্রেসিডেন্সী জেলে আমাদের দু'জনেরই জীবন-সংশয়। জেল থেকে পালিয়েছিলাম বলে জেল-কর্ত্তৃপক্ষের আমরা বিরাগভাজন হয়েছি, তাই ওরা প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ছুতা পেলেই সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তার বাহিনী নিয়ে ছুটে আসে ও খুন করবার ভয় দেখায়। কাটারিয়ার অমূল্য কথাগুলি জুড়ে দিয়ে বললাম যেন বিচারের সময়টা আমাদের জেল থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে রাখা হয় যেমন রেখেছিল, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের লাহোর-দুর্গে।

বিচারক কে, সি, দাশ গুপ্তের নিরপেক্ষতার সুনাম ছিলো। পুলিশের কথা বা কারসাজিতে তিনি বিশ্বাস করতেন না। মনোযোগ দিয়ে তিনি সব শুনলেন এবং তার সহকারী বিচারক-দের সঙ্গে পরামর্শ করে জরুরী নির্দ্দেশ জেলে পাঠিয়ে দিলেন এবং আমাদের আশ্বাস দিলেন যে যাতে এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন।

কোর্টের নির্দ্দেশ পেয়ে কাটারিয়ার টনক নড়ে গেলো। কেমনতর কয়েদী এরা!—একেবারে কোর্টের পরওয়ানা এনে হাজির করেছে! কাটারিয়ার সুর বদলে গেলো এবং আমাদের অভাব অভিযোগ জানতে চাইলো। কাটারিয়া বিলেত ফেরৎ ডাক্তার। ডাক্তারী আইনগুলি নিশ্চয়ই তার পড়া ছিলো, কিন্তু পড়া ছিলো না—শাসন-ইতিহাসের পাতাগুলো যেখানে ওয়ারেণ হেষ্টিংসকেও কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের নিকট নাজেহাল হ'তে হয়েছিল।

তেইশ

টিটাগড় মামলার শেষ অধ্যায় ঘনিয়ে এলো।

রাজসাক্ষী সন্তোষ সেন সনাক্ত করবার সময় ডকের সামনে এসে কেঁদে ফেলল কিন্তু সনাক্ত করতে সে একটুও ভুল করলো না। তার পার্টি-প্রধান প্রফুল্ল সেন থেকে সুরু করে, অন্তরঙ্গ বা পরিচিত কাউকেই সে বাদ দিল না—ধীরেন্দ্র মুখার্জ্জি, কালীপদ ভট্টাচার্য্য, বীরেন্দ্র বসু, দেবপ্রসাদ বানার্জ্জি, জগদীশ চক্রবর্ত্তী, পারুল মুখার্জি, লেখক এবং আরও অনেককেই সে দেখিয়ে গেল।

বৈপ্লবিক সংগঠনে রাজসাক্ষীর স্বীকারোক্তি বৈপ্লবিক দলকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। দল ও পার্টি-সভ্যদের নিশ্চিহ্ন ও হনন্, যত সম্পূর্ণভাবে সে করবে, ততই তার নিজের নিরাপত্তা বাড়বে এবং ভবিষ্যতের পথও সহজ হবে। আলিপুর বোমার মামলা, ১৯০৮ সাল, বাংলা—বাংলা কেন, সমগ্র ভারতের বৈপ্লবিক প্রেরণার বাহ্যিক অগ্নিস্ফুরণ। শ্রীঅরবিন্দ—বারীন—উল্লাসকর—উপেন্দ্রনাথ—হেমচন্দ্র—বিভূতি—কানাই—সত্যেন—প্রভৃতি সবাই আসামী। শ্রীরামপুরের জমিদার তনয় বা বংশোদ্ভব আসামী নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী। সত্যেন দত্ত ও কানাই বসু সত্যেন দত্তের বোনের সাহায্যে খাবারের ভিতর বাইরে থেকে রিভলভার নিয়ে এসে প্রেসিডেন্সী জেলে নরেন গোঁসাইকে গুলি

করে হত্যা করলেন—তাঁরা দলকে বাঁচালেন, নিজেদের জীবনের বিনিময়ে। সত্যেন দত্ত ও কানাই বসু জাতির নমস্য হয়ে রইলেন—বৈপ্লবিক দৃঢ়তার গ্রেনাইট-কঠিন প্রস্তরে বাঁধা রইল, তাঁদের ছবি।

স্বদেশ-প্রেমিকরা বিশ্বাস-দ্রোহীদের কখনও ভোলে না। আলিপুর জেল থেকে পালাবার পর পুরাণো পার্টি বন্ধু ঢাকার হরিশচন্দ্র সরকার একটি বিশ্বাসঘাতকের কথা লোক পাঠিয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। হরিশ তখন বিলেত থেকে এসে নামী কোনও ব্যাঙ্কের ম্যানেজার কিন্তু তার অতীত দিনে যখন সে বিপ্লবকে সার্থক করে তোলবার জন্য কাজ করতো সে সময় দলের একজন সভ্য যে পার্টির বিশেষ গোপন খবরগুলি—রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ, অবনী মুখার্জি ও নলিনী গুপ্তের গোপনে ভারতে আগমন এবং প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে পার্টির আশ্রয়ে থেকে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থা প্রভৃতির খবর—পুলিশকে পৌঁছে দিয়ে তার বিনিময়ে বিলেত চলে গেল, নিজের ভবিষ্যৎ বানাবার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সেখান থেকে ফিরে এসে কোনও এক বড় কোম্পানীর বড় চাকুরীতে বা ডিরেক্টার বোর্ডে যোগদান করল, তা হরিশের মন থেকে কিন্তু মুছে গেল না।

আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে এই মামলা জড়িত—একই দলের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মাত্র—আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের মানস-সন্তান। তাই সরকার পক্ষকে আন্তঃ-প্রাদেশিক মামলার অনেক সাক্ষ্যও প্রমাণ আবার এই মামলায় এনে হাজির করতে হলো।

টিটাগড়-ষড়যন্ত্র মামলার ব্যাপ্তি কাল মাত্র চার মাস—১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৩৫ সালের পয়লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত। এই অল্পকালের মধ্যে ষড়যন্ত্র গভীর ও ব্যাপক রূপ ধারণ করতে পারে না। তাই পুলিশের ভরসা ছিল,—প্রধান রাজসাক্ষী সন্তোষ সেনের ও অপর রাজসাক্ষীদের সাক্ষ্য, টিটাগড়ে প্রাপ্ত জিনিষ পত্র, খান কয়েক চিঠি ও সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত একটি তালিকা এবং সাক্ষীদের দিয়ে সনাক্তকরন। এই মামলাকে সাজিয়ে ভয়ঙ্কর রূপ না দিতে পারলে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ অ-প্রমানিত হ'য়ে যেতে পারে। বিশেষ আদালতের বিচারে ন্যায়ের মর্যাদা রাখবার লোক তখনও দু'এক জন মাঝে মাঝে দেখা যেতো। যদি কোন বিচারক গভীরভাবে সত্যানুসন্ধীই হয়ে পড়ে, তার জন্য পুলিশ চেষ্টা করছে যেন সাক্ষী-সাবুদের কোনও দুর্ব্বলতা না থাকে। অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার মন্মথ সেন সরকার পক্ষের দুর্ব্বলতার পাহারাদার, আর আইনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিসর্জ্জন দিয়ে জল্লাদের ছুরি হাতে নিয়ে পাবলিক প্রসিকিউটারের দল। সরকার পক্ষ ষড়যন্ত্র প্রমানের দুর্ব্বলতা জেনে বিশেষ করে জোর দিল, টিটাগড়ে প্রাপ্ত জিনিষ গুলোর ওপর—বোমার মাল-মসলা, বা বোমার প্যাটার্ণ, সামরিক কিতাবাদি এবং বিশেষ করে কুড়িয়ে-পাওয়া অস্ত্রটি। এই সব মূল উপাদানের মধ্যে আবার বিভলভারটিই হ'লো—ব্রহ্মাস্ত্র। ঐ-টিকে যদি ঠিকমত কারু ওপর চাপিয়ে প্রমাণ করা যায়, তবে তার সুফল হবার সম্ভাবনা আছে। মুখার্জি, নাগ ও সেন মহাশয় খুবই চেষ্টা করলো, যাতে ক্ষুদ্র বস্তুটি আমার

ওপরই চাপান যায় কিন্তু ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট কে, সি দাশ গুপ্ত মহাশয় সঠিক প্রমাণ চাইলেন। শ্যামবিনোদ ও পারল যে দাবীদার ছিল না, তার প্রমাণ কোথায়? যা'হোক পুলিশ খুব সুবিধা করে উঠতে পারছেনা বলেই মনে হলো। বিশেষ করে নিক্ষিপ্ত রিভলভারটি অনেক দূর থেকে কুড়িয়ে পাওয়ায় ট্রাইব্যুনালের ধারণা হয়েছিল, হয়তো শ্যামবিনোদের বলিষ্ঠ হাতেই উহা নিক্ষিপ্ত হ'য়ে থাকবে। তবুও পুলিশ আশা ছাড়লোনা।

এখানে উল্লেখযোগ্য, মেদিনীপুরের কংগ্রেস-নেতা এড্-ভোকেট মন্মথ দাস মহাশয় গ্রেপ্তার সময়কার পুলিশ-তালিকাকে তার জেরার মুখে অনেক খানি ঘায়েল করে দিয়েছিলেন।

সওয়াল আরম্ভ হলো। প্রত্যেক আসামীর বিরুদ্ধেই একে একে অভিযোগের গুরুত্ব দেখিয়ে বলল যে এই বিপজ্জনক দলটির অনেককেই কঠিন দণ্ড দেওয়া উচিত কিন্তু দলের প্রধান নায়ক, পূর্ণানন্দ দাশ গুপ্তকে আইনের ব্যবস্থিত চরম দণ্ড দেওয়া উচিত। একটি মামলায় যখন সে একজন প্রধান আসামী তখন পালিয়ে গিয়ে দলের সভ্যদের নিয়ে আবার এক ষড়যন্ত্রে সে লিপ্ত হলো— ভারতে বৃটিশ রাজত্ব উচ্ছেদ কল্পে। এক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হয়েছে। আরও প্রমাণিত হয়েছে, যে নিক্ষিপ্ত অস্ত্রটি ছুঁড়্বার সময় তারই হাতে ছিল। অতএব চরম দণ্ড অর্থাৎ মৃত্যু দণ্ডই একমাত্র উপযুক্ত দণ্ড তাতে ন্যায় ও আইনের মর্য্যাদা রক্ষা হবে। আমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছি—কিন্তু ওদের আকুল আবেদনে বিচারকরা যেন সায় দিচ্ছে না অর্থাৎ কে, সি, দাশ-গুপ্তকে যেন এতটা বোঝাতে পারছেনা যদিও বিপ্লবী সভ্যদের

অপসারণের জন্যই অস্ত্র-আইন নূতন করে ঢেলে সাজা হয়েছে। সরকারী পক্ষের কথা শেষ হলে, আমাদের কৌঁশুলী আমাদের নির্দ্দোষিতার কথা বললেন— আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক হীনতার কথা তুললেন, টিটাগড়ে প্রাপ্ত জিনিষগুলি পুলিশ কর্ত্তৃক চাপিয়ে দেবার কথা উঠালেন, অস্ত্রটির প্রমাণ অভাবের কথা বললেন, হাতের লেখা বা সাঙ্কেতিক লেখাগুলি প্রমাণিত হয় নি বললেন এবং রাজসাক্ষীদের কথাগুলি পুলিশের বানানো বলে ব্যখ্যা করলেন।

রায় দেবার দিন। আমরা সবাই উপস্থিত। বিচারকদের রায় পড়া সুরু হলো। ফাঁসীর দণ্ড নেবার জন্য তৈরী হয়ে এসেছি। অনন্ত পথের যাত্রা—হয় ফাঁসীর মঞ্চে, জীবনের জয় গান গেয়ে, নয় তো পীড়নের রথচক্রে জীবনকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিয়ে। দেশকে স্বাধীন করবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঘর থেকে যখন বের হয়েছিলাম, দুঃখী-মায়ের অবুঝ কান্নার আবেগ যেন ঘরের জানালা বেয়ে আমার পিছু পিছু ধাওয়া করতো। সেই সুরের রেশ তখনও যে কানে না বাজত বা মনে না হতো তা নয়; কিন্তু তবুও কেমন করে তা' যেন ঝাপসা হয়ে গেছে। একমাত্র মায়ের মঙ্গল মূর্ত্তিখানিই মনের উপর ভেসে উঠত—মনে হতো, যেন জন্ম জন্মান্তরের আশীর্ব্বাদ নিয়ে মা শিয়রে বসে আছেন। শুধুমাত্র এ-জীবনের আশীর্ব্বাদ নয়—জীবন হতে জীবনান্তরে মঙ্গলকে পূর্ণ করবার আশীর্ব্বাদ। সেই মঙ্গল-কাজে হয়তো আমার ডাক এসেছে।

বিচারকরা যাদের দোষী সাব্যস্ত করলেন তাদের নাম, দণ্ডের

পরিমাণ ও দণ্ডের ধারা বলে যেতে লাগলেন। আমার নাম বলে আমায় দোষী সাব্যস্ত করলেন সকল ধারাতেই আমার দায় অখণ্ডনীয় কিন্তু দণ্ডের বেলায় আমাকে যাবজ্জীবন দণ্ড ঘোষণা করতেই বন্ধুরা সবাই আনন্দিত হয়ে উঠল। আমাদের কৌশুলীরাও খুসী কারণ তাঁরা জানত যে ফাঁসীর দণ্ড একবার দিলে তাকে আপীলে খণ্ডন করা কঠিন হবে।

তারপর একে একে দণ্ডের তালিকায় এলো—

১। প্রফুল্ল সেন—চৌদ্দ বৎসর। ৩। শ্যাম বিনোদ পাল চৌধুরী—দশ বৎসর। ৪। দেবপ্রসাদ সেন গুপ্ত—সাত বৎসর। ৫। নিরঞ্জন ঘোষাল—সাত বৎসর। ৬। ধীরেন্দ্র মুখার্জি—পাঁচ বৎসর। ৭। হরেন্দ্র নাথ মুন্সী—পাঁচ বৎসর। ৮। কার্ত্তিক সেনাপতি—পাঁচ বৎসর। ৯। জগদীশ চক্রবর্ত্তী—পাঁচ বৎসর। ১০। শান্তি সেন—পাঁচ বৎসর। ১১। জীবন ধুপী চার বৎসর। ১২। বিভূতি ভট্টাচার্য্য—চার বৎসর। ১৩। দেব প্রসাদ ব্যানার্জি—চার বৎসর। ১৪। জগদীশ টেক—চার বৎসর। ১৫। সুধাংশু বিমল দত্ত—তিন বৎসর। ১৬। প্রীতি রঞ্জন পুরকায়স্থ—তিন বৎসর, ১৭। পারুল মুখার্জি—তিন বৎসর।

প্রমাণ অভাবে যারা মুক্তি পেলো—

১। ধনেশ ভট্টাচার্য্য ২। সাতা নাথ দে ৩। মাখন লাল কর ৪। রবীন্দ্র ঘোষ ৫। কালীপদ ভট্টাচার্য্য ৬। অজিত মজুমদার ৭। জীবন দে (ওরফে নাবোদ বানার্জি) ৮। জুড়ান গাঙ্গুলী ৯। বীরেন বসু ১০। ধীরেন ধর ১১। যজ্ঞেশ্বর দে ১২। দেব ব্রত রায়।

ট্রাইব্যুনালের রায় হয়ে গেল। বিশেষ আইনে গঠিত ট্রাইব্যুনালের বিচারে একমাত্র পুলিশ ও বিচারকদের মর্জ্জির ওপরই ভাগ্য নির্ভর করতো। পুলিশের তখন একছত্র-রাজ—তারা মনের মত করে সাক্ষী বানিয়ে সাঁজি ভরে সরকারী উকীলদের হাতে তুলে দিত, এমন কি দণ্ডেরও পরিমাণ ঠিক করে দিত। কিন্তু টিটাগড় মামলায় এদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো না। ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট কে, সি, দাশ গুপ্ত পুলিশের সাক্ষ্য বা নির্দ্দেশের উপর নির্ভর করেন নি। আসামীদের পক্ষও তিনি দেখতে চেষ্টা করেছেন। আত্মপক্ষ সমর্থন করবার সুযোগ তিনি আমাদের দিয়েছেন। দণ্ড ব্যবস্থার মধ্যেও কাউকে ফাঁসী কাষ্ঠে না ঝুলিয়ে স্থায়ীভাবে জেলে রাখবার ব্যবস্থা করে আমাদের অভ্যস্থ জীবন যাত্রার পথকে অব্যাহত রেখেছেন, আর নতুনদের অনেককেই হালকা সাজা দিয়ে বা বোরষ্টাল জেলের ব্যবস্থা করে ভবিষ্যতে ভাববার সময় দিয়েছেন। মেয়ে-আসামী পারুলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ শ্যামবিনোদের চেয়ে কম ছিলনা, তবুও সেখানে তিনি উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। যাদের মুক্তি দিয়েছেন, তার মধ্যে ধনেশ ভট্টাচার্য্য ও সীতানাথ দেকে দণ্ড দিতে হলে প্রমাণের অভাব হতো না। ঐ সময় নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ড দেবার দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না। চট্টগ্রাম বাথুয়া ডাকাতিতে পার্টির পুরাতন সভ্য ৺যশোদা চক্রবর্ত্তীর দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও পার্টি-সভ্য মোক্ষদা ও প্রিয়দা এবং পার্টি-সভ্য মহেশ বড়ুয়ার সাথে সম্পূর্ণ নিরীহ ও নির্দ্দোষ তাদের দুজন গৃহকর্ম্ম-চারীকেও গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সাক্ষী বানিয়ে মোক্ষদা, প্রিয়দা

ও মহেশ বড়ুয়ার মতই তাদেরও যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনের দণ্ড দিয়েছিল। একবারও তারা ভেবে দেখেনি, এদের পক্ষে বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে দুঃসাহসিক কাজ করা সম্ভব ছিলো কি না!

রায় হয়ে যাবার পর হাইকোর্টে আমাদের আপীল দায়ের হলো। সেখানকার শুনানী শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সবারই আন্দামান-যাত্রা স্থগিত রইলো।

চব্বিশ

ভারতের সমুদ্রোপকূল থেকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ প্রায় আট শত মাইল দূরে—সমুদ্রের মাঝখানটায় যেন প্রহরীর মত জেগে রয়েছে। ব্রিটিশ রাজত্বের গোড়া থেকেই আন্দামান দ্বীপ নির্ব্বাসনের "দেশ" হিসাবে নির্দ্দিষ্ট ছিল। সারা ভারত থেকে যেমন দুর্দ্দান্ত স্বভাবের কয়েদীদের এনে সেখানে রাখত তেমনি রাজনৈতিক কারণে যারা বিপজ্জনক বলে গণ্য হ'তো তাদেরও সেখানে রাখবার ব্যবস্থা করতো। ওয়াহাবী আন্দোলনের অনেকেই সেখানে জীবন কাটিয়েছেন—ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড মেয়ো, ১৮৭৭ সালে ওয়াহাবী আন্দোলনের একজন নেতার হস্তে আন্দামানে নিহত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের নব-জাগরণ সূচিত হলো, মহারাষ্ট্রে ও বাংলায়। তাকে স্তব্ধ করবার জন্য আন্দামানের বন্দীশালা ভারতের প্রখ্যাত বিপ্লবীগণের আবাস ভূমি হয়ে উঠল। বারীন ঘোষ, পুলিন দাস, থেকে সুরু করে বাংলার ও ভারতের অন্যান্য স্থানের বিপ্লবীকদের পাদ চারণে আন্দামান হয়ে উঠল, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পুণ্য-তীর্থ—স্বাধীনতার উচ্চ শিখরে পৌঁছাবার দুর্গম রাস্তা। ১৯৩০ সালের পর বৈপ্লবিক আন্দোলন আবার যখন আগুনের মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তখন দলে দলে বিপ্লবী বন্দীদের আন্দামান

যাত্রা সুরু হয়ে গেলো। মাদ্রাজ, রেঙ্গুণ ও কলকাতা থেকে একখানা করে জাহাজ বন্দী ও খোরাক নিয়ে মাসে একবার যাতায়াত করতো। দ্বীপের আদিম অধিবাসীরা মানুষের সভ্যতার পরিচয় পেয়ে গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাই আন্দামানের কথা, সভ্য সমাজের নির্ব্বাসিতদের জীবন-কথা।

বাংলার জেলের মত আকাশ-চুম্বী দেয়াল দিয়ে আন্দামানের সেলুলার (celluler) জেলকে ঘিরে দেওয়া হয় নি। সেখান থেকে সাঁতার কেটে বা দেয়াল ডিঙ্গিয়ে পালাবার কোনও পথ ছিল না বলে। বাংলার জেলের নিকৃষ্টতম খাবার ব্যবস্থার মত সেখানকারও ব্যবস্থা, বরঞ্চ তার চেয়ে এক ধাপ নীচে। আবহাওয়া বাংলার চেয়েও খারাপ। দৈনন্দিন কাজকর্ম্ম বাংলার জেলের তুলনায় বেশী ছিল না। আন্দামানের শাসন ব্যবস্থা ছিল, ইংরেজ রাজত্বের প্রাথমিক যুগের চিহ্ন-স্বরূপ—চীফ্-কমিশনার শাসিত প্রদেশ। আইন কানুনের বালাই নেই—চীফ্-কমিশনারই শেষ পর্য্যন্ত দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা (সেখানকার অপরাধে ফাঁসী পর্য্যন্ত দেবার তার একতিয়ারের মধ্যে ছিল)। তবুও বিপ্লবী বন্দীরা বাংলা ছেড়ে আন্দামানে পালাতে চাচ্ছে। বাংলার জেলে তাদের জীবন অতিষ্ঠ। প্রতিটি পাহারাদার, প্রতিটি, অফিসার, পুলিশের নির্দ্দেশ মত অত্যাচারের নগ্ন কুড়াল হাতে বিপ্লবী বন্দীদের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে—ক্ষমাহীন ও নিষ্ঠুর দৃষ্টিপাতে। তাদের অত্যাচারে মথিত ছিন্নভিন্ন রক্তমাখা শরীর ও মনের তন্তুগুলো যেন বিশ্রাম নিতে চায় কোথাও কোন

নিভৃত আড়ালে, গভীর বনের অন্ধকারে বা স্বাপদ সঙ্কুল রাজ্যে-ক্ষণিকের বিশ্রামও উপভোগ্য। একেই আমরা 'আন্দামানের মন' বলতাম। ১৯৩০ সালের পর প্রথমকার যাত্রীদের মধ্যে ছিলো, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার ও মেছুয়া বাজার বোমার মামলার আসামীরা। বাংলা যত তেঁতে উঠলো, আন্দামান বন্দী নিবাস ততই ভরে উঠতে লাগল। বাংলার আগুণ ভারতের অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো — সেখানকার অগ্নি-পূজারীর দলকে দল আন্দামানে নির্ব্বাসিত হয়ে এলো। স্বাধীনতার দুর্গম পথ সার্থকতায় ভরে উঠলো। ভারতের দৃষ্টি বদল, আন্দামানের দণ্ডিত শৃঙ্খলিত সন্তানদের দিকে। চার' পাঁচশো দণ্ডিত বিপ্লবীর সমাবেশে নরক গুলজার হয়ে উঠলো—আন্দামান যেন আর আন্দামান রইলনা।

বাংলা জেলের অত্যাচার সুরু হলো, ১৯৩২ সালের পর থেকে। তাই প্রথমকার যাত্রী দলের মধ্যে আন্দামানে যাবার মন ছিল না। অত্যাচারের আকার প্রকার সম্বন্ধে দেহ ও মনে অনভ্যস্ত চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন মামলার অনেকেই ছিলেন, আন্দামানে। কর্তৃপক্ষের সহিত সংগ্রাম মূলক ব্যবহারে কদম কদম পা ফেলে তারা প্রথমে একত্রে চলতে পারেন নি। "জালিয়ান-ওয়ালা-বাগের" অত্যাচার যেমন ভারতকে নিবিড় বন্ধনে বেঁধে দিয়েছিল, তেমনি বিভিন্ন জেলের অত্যাচার বিপ্লবী-বন্দীদের দল নির্ব্বিশেষে বেঁধে দিয়েছিল—যার মূল্য ছিলো মনোরাজ্যে।

এক টানা জেল খাটা সুরু হলো। হাইকোর্টে বিচারের জন্য কোর্ট-কাছারীতে আমাদের আর যেতে হবে না। উভয় পক্ষের

কৌঁসুলী ও বিচাবকবাই তাব সমাধান কববেন। কিন্তু তবুও আবাব এক বিচাবেব প্রহসনে দাঁড়াতে হলো। সিপাহীদেব মাববাব অভিযোগে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট, অনাবেবল সুশীল সিংহ বিচাব কববাব জন্য জেল-গেটে এসে হাজিব হলো। আসামীদেব মধ্যে আমবা দুইজন, নিরঞ্জন ও লেখক। ভাবলাম —এ আবাব কি ধবনেব বিচাব, আব আবাব সাজাই বা কি হবে? শুনেছিলাম, আমাদেব বেত মাবাব পানিশমেন্ট দেবাব জন্য কাটাবিয়া লিখেছিলো কিন্তু পুলিশ কমিশনাব নাকি এত সহজ বাস্তায় প্রতিশোধ নিতে বাজী হন নি। এক নম্বরের ঝানু লোক। কলকাতা সহবেব ওপব বাজত্ব ও বন্দীদেব অত্যাচাবেব ফলে জেলেব ইনসপেক্টব-জেনাবেল সিমসন সাহেব গভর্ণমেন্টেব খাস দপ্তবে বিপ্লবীদেব (বিনয়-বাদল-দীনেশ) আক্রমণে প্রাণ হাবালো —সে তো মাত্র, সেদিনকাব কথা। 'শাপে-বব' বলে একটা কথা আছে। কাটাবিয়া সাহেবেব উৎসাহ-প্রস্তাব নাকচ হলো। তাই এই বিচাব বা বিচাবেব প্রহসন, আইনেব মর্যাদা বাখবাব জন্য। আমবা পোষাক পবিচ্ছদ পবে (অর্থাৎ কুর্ত্তা-জাঙ্গিয়া-গামছা এবং ডাণ্ডাবেড়ী ও গান্ধীটুপী সম্মিলিত পোষাকেব ঐশ্বর্য্য) সিপাহী-সান্ত্রীদেব সঙ্গে জেল গেটেব সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে কতকটা আসামীব কায়দায় দাঁড়িয়ে গেলাম। জানালাব ভিতব দিয়ে দেখতে পেলাম বিচাবক একটি কাঠেব চেয়াবে তাব মসনদে আসীন। তাব পাশে বয়েছে প্রতাপান্বিত কাটাবিয়া সাহেব, জেলের অফিসার বৃন্দ, পুলিশেব লোক আর সরকাবী প্রসিকিউটার। বাইরে আমাদেব প্রতি

হাকিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রসিকিউটার ঘটনার বর্ণনা দিতে লাগল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাদের দিকে চেয়ে পুলিশের বর্ণনা শুনছেন—তাঁর মনে যেন কিসের খট্‌কা বেঁধেছে। আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "ডিফেণ্ড" করবার উকীল কোথায়? নিষ্প্রয়োজন, বলে আমরা উত্তর দিলাম। সরকার পক্ষকে জিজ্ঞাসা করে আমাদের দণ্ডের পরিমাণ জানতে চাইলেন। কাটারিয়া সাহেব আমাকে দেখিয়ে উৎসাহ ভরে বলে উঠল, শীর্ণদেহ লোকটির মোট সাজা হয়েছে, পঁয়তাল্লিশ বৎসর আর তার পাশের আসামীটির হয়েছে, চৌদ্দ বৎসর। ম্যাজিষ্ট্রেট মুখে কলম গুঁজে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে একটি কথা মাত্র কথা উচ্চারণ করলেন, "Useless" অর্থাৎ দণ্ড দেবার কোনও অর্থই হয় না। তবুও প্রত্যেকেরই দুই বৎসর করে দণ্ড দিলেন। আগের দণ্ড গুলি খাটবার পর এ দণ্ড চলবে অর্থাৎ মোট সাত চল্লিশ বৎসর দণ্ড খাটতে হবে, যদি আবার কিছু পরে যোগ না হয়।

অত্যাচারের যে দিন গুলি চলে যেতো, তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন। নিঃসঙ্গ সেলবাস, কাজের খাটুনি এবং চারদিকে কড়াকড়ির ব্যবস্থার মধ্যে একটা নিঝুম পৃথিবী আপনা হতেই নেমে আসত বর্তমান পৃথিবীর আলো-বাতাস, জীব-জন্তু, জীবনের আশা-আকাঙ্খা সবই যেন মহাশূন্যে মিলিয়ে যেতো, একমাত্র থাকত কয়েদ-জীবন আর তার নিষ্ঠুরতার পরিবেশ। এই গহন তমিস্রার ভিতর নিজের মনের ভিতর থেকে পথের সন্ধান করে বেড়াতাম আর গুণগুণ করে কবির কথা উচ্চারণ করতাম, "জীবনের যত পূজা হয় নি সারা"। মনের এই নিঃসীম শূণ্যতার মাঝে পথ টেনে টেনে চলতে অনেকে

হয়ে যেতো পথ ও দিশে-হারা -মানুষ বিকৃতির লক্ষণের প্রাথমিক উপাদান। ফরিদপুরের বন্ধুবর সুরেন কর, ঢাকার তরুণ বিপ্লবী ভূপেশ বানার্জি, বরিশালের যুগান্তর দলের বিশিষ্ট কর্মী ফণী দাশ গুপ্ত ও ঢাকার বিমল ঘোষ সহজ রসিকতা হারিয়ে ফেলল—জীবনের গুরুভার টানবার যে লেভার তা বিকল হয়ে গেছে।

জেলখানায় বন্দীদের বই দেওয়ার যে ব্যবস্থা তা আমাদের বেলায় নিষিদ্ধ ছিলো। বই, পত্র দিলে পরে হাত বদল হবে। বদল-করা বইখানা আবার অন্যের হাতে পড়বে সারা জেলে ঘুরে বেড়াবার সম্ভাবনা ছিলো। বিশেষ করে বইখানাকে সাঙ্কেতিকে পরিণত করলে সরকার পক্ষের লোকেরা শুধু তার বাহক হবে অর্থাৎ সরকার বিরুদ্ধ কর্মে না জেনে সাহায্য করবে—তার জন্য কোনও বইই আমাকে দেওয়া বারণ ছিল; এমন কি কোনও থালা বাটি পর্য্যন্ত আমার কাছ থেকে অন্যত্র পাঠান নিষিদ্ধ ছিল। এই নির্দ্দেশের পিছনে একটি গুপ্ত রহস্য ছিল তারা যে খামখা করেনি তা' আমি বুঝতে পেরেছিলাম। জেলে আসবার পর খাবারের থালা ও বাটী আমার খাবার হয়ে গেলে আবার রন্ধন শালায় চলে যেতো। থালা ও বাটীর তলায় একটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন একে দিতাম যাতে সচেতন পার্টি সভ্যদের হাতে পরলেই থালাখানা উলটিয়ে সাঙ্কেতিক চিহ্নটি দেখতে পেলে বুঝতে পারবে যে এটা আমার ইঙ্গিত। সে তখন থালা খানার পিছনে অন্য চিহ্ন দিয়ে প্রাপ্তি স্বীকার বোঝাবে। এই ব্যবস্থা হবার পর আমার প্রয়োজন জানাব। এইভাবে কিছুদিন দেবার

পরও সভ্যদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই কিন্তু সরকারেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাই তারা আমার জন্য থালা ও বাটি নির্দ্দিষ্ট করে দিল এবং বইপত্র দেবার ব্যপারেও সাবধান হলো। পুস্তকাদি থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজের মনের ভিতরই পাদ চরণ করা ছাড়া উপায় ছিলনা। অনেক সময় দেওয়ালকে সামনে রেখে কথা বলতাম—দেওয়ালই হয়ে উঠত সঙ্গী। দেওয়ালের গায় চীনা নাবিকদের ছোট ছোট লাল-ইটের কুঁচি দিয়ে জাহাজের ছবি, নীলনয়না কোনও রমণীর ছবি আঁকা। সাময়িক ভেবে মন দেখতো সমুদ্র, তার উত্তাল তরঙ্গ বেয়ে বিদেশী বণিকের পণ্যভরা জাহাজ গুলো ওপারে বণিকের ঐশ্বর্য্য ও বৈভবের লীলাভূমি আর এপারে নিঃস্ব ভারতভূমি।

মনের এই নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ হতো, বুটের খট্ খট্ শব্দে, পাহারা ওয়ালাদের পায়েব তালে আর বাইরে থেকে প্রক্ষিপ্ত আলো দিয়ে আসামীকে দেখে নেবার মধ্যে, যেন শিক কেটে বা মন্ত্র বলে সে ভেগে না যেতে পারে। তালাগুলি মাঝে মাঝে খট্‌খটিয়ে উঠতো, আর শিকগুলি ঝন ঝন করে বাজ্‌তো—কি জানি, কেউ যদি বাইরে থেকে তালাগুলি খুলেই দিয়ে থাকে বা শিকগুলি কেটে দিয়ে থাকে !!

মনের খোরাক টেনে নিতাম অতীত স্মৃতির গহন গভীর থেকে, জীবনকে পেরিয়ে শত সহস্র বৎসর ইতিহাসের পিছন পাতায় যেখানে সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের কাহিনী জ্বলন্ত অক্ষরে ভবিষ্যতের অনিবার্য্য ইঙ্গিত হিসাবে লেখা আছে।

গ্রীষ্মের গরম যেন দাবানল জেলে রাখতো, ডিগ্রীর ভিতর।

গরাদের শিকের ভিতর দিয়ে নাক গলিয়ে বাইরে থেকে হাওয়া টানবার চেষ্টা করতাম।—নাকটা যদি আরো একটু বড় হতো—আমার মামাদের মত হতো।—তবে আরও বেশী করে হাওয়া টেনে নিতে পারতাম।

কিন্তু আলোতো টানতে পারছি না, সে তো দূরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

ছোট বয়সে মানুষ হয়েছি অনন্ত আকাশের তলে, সীমাহীন মাঠের পারে, আলো-বাতাসের ঐশ্বর্যাপূর্ণ সমারোহ ও আড়ম্বরের মধ্যে। ছুটে যেতাম—সূর্য্য ধরবার জন্য সন্ধ্যা বেলায় মাঠের ওপারে খালের ধারে আর সেখান থেকে গাঁয়ের দিদিমা সকালে "সূয্যি" শিয়রেই পৌঁছে দেবার ভরসা দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন, মায়ের কোলে। তখন তো সাতটা সাতটা দিন সূর্য্য পাঠিয়ে-ছিলেন। আর এখন তো দেখছি, সূর্য্য বন্দী হয়ে রয়েছে সাম্রাজ্য-দানবের কাছে।

পঁচিশ

কঠিন পরিবেশের এই শূন্যতার মধ্যে মাঝে মাঝে এসে দেখা দিতো, ফাঁসীর দণ্ড নিয়ে ফাঁসীর আসামীরা, আমাদেরই নিকট প্রতিবেশী হ'য়ে।

কেউ বা সুরাপানে মত্ত হয়ে, কেউ বা লালসার উন্মাদনায়, কেউ বা অন্যের দৌলতকে আত্মসাৎ করবার প্রবল আগ্রহে, কেউ বা মর্য্যাদা রক্ষার অনিবার্য্যতায়, কেউ বা নির্জ্ঞান মনের বিচারহীন ইঙ্গিতে খুনের দায়ে প্রাণ হারাবার আদেশ পেয়ে হাজির হতো।

প্রতিবেশী হয়ে এলো মামা ভাগ্নে দু'জন। চাষীর ছেলে তাড়ি খেয়ে নেশার মেজাজে খুন করেছিল কাউকে, তাই প্রাণ দণ্ডের আদেশ হয়েছে। মামার চেয়ে ভাগ্নে বলিষ্ঠ-তাজা ও নবীন যুবক—স্বাস্থ্য যেন উপচিয়ে পড়ছে—প্রাণের তেজ ফুটে বেরোচ্ছে। ফাঁসী যে তাদের হ'তে যাচ্ছে, এ ধারণা তখনও তাদের হয়নি। কথা-বার্ত্তা চাল চলনে অতি সহজভাব পরিস্ফুট, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কোনও লক্ষণ যেন নেই। লাটের নিকট প্রাণ-ভিক্ষার মার্জ্জনা জবাব না আসা পর্য্যন্ত তাদের ফাঁসী স্থগিত রয়েছে মাত্র।

কানে ভেসে আসছে, ডিগ্রীগুলির পিছন থেকে ফাঁসীমঞ্চের মহড়া—"লেভার" (Lever) টানার শব্দ। আসামীদের সমান

ওজনের দুইটি বালিপূর্ণ বস্তাকে মঞ্চের উপরকার ফাঁসীর দড়ির সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে লেভার টেনে দড়ির ও মঞ্চের একসাথেই পরীক্ষা চলেছে। লেভার টানার সাথে ফাঁসীর মঞ্চ (কাঠের তৈরী প্ল্যাটফরম্) সরে গিয়ে দড়ির সঙ্গে বাধা বস্তা দুটি মানুষের মতই ফাঁসার গহ্বরে ঝুলতে থাকবে। এতটা শেষ হ'লে অতি প্রত্যুষে এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে বস্তা দুটির জায়গায় এসে দাঁড়াবে, মামা-ভাগ্নে দু'জন—একই মঞ্চে—একই সময়ে। লেভার টানার সঙ্গে সঙ্গে গহ্বরে পড়ে তাদের গলার হাড়খানা ভেঙ্গে গিয়ে প্রাণহীন দেহ ঝুলতে থাকবে দড়ির ওপর পাশাপাশি। জীবনবায়ু বের হয়ে যাবে দূরে—বহুদূরে। যাতে আর জীবনের স্পন্দন না থাকতে পারে তার জন্য রয়েছে ডাক্তার। পরে দড়ি থেকে নামিয়ে গহ্বর থেকে টেনে এনে শিরা উপশিরাগুলি কেটে দেওয়ার ব্যবস্থা। তারপর শ্মশানে, কবরে, জলে বা বায়ুমণ্ডলে ধর্ম্মানুযায়ী তার শেষ পরিণতি।

রাণী ভিক্টোরিয়ার অনুশাসন রয়েছে—প্রত্যেক প্রজার ধর্ম্মাচরণ অলঙ্ঘনীয়। ফাঁসী যাবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ব্যবস্থার ত্রুটি নেই—গঙ্গাজল, গঙ্গামাটি, ফুল, স্নানাদি ও নূতন বস্ত্র পরিধান—জিলার ও জেলের মালিক শোভাযাত্রার মত জেল ও সাধারণ পুলিশের বাহিনী নিয়ে আগমন। যে জল্লাদরা মাথা ও মুখ ঢেকে দিয়ে এবং গলায় দড়ি পরিয়ে দিয়ে লেভার টানবে তারা পাবে একটি করে ভিক্টোরিয়ার গিনি ও তরল পানীয়। যারা ফাঁসীমঞ্চের গহ্বর থেকে দেহ টেনে আনবে, তারাও বঞ্চিত হবে না, পুণ্য কাজের পাওনা থেকে।

ওদের প্রাণ ভিক্ষার আবেদন না-মঞ্জুর হলো। বিকেল বেলায় মাথার টুপী বানাবার জন্য লোক এলো। তারা এতেও বুঝতে পারলো না যে রাত্রি শেষেই তাদের ফাঁসী হয়ে যাবে। রাত তিনটার সময় সার্জেন্টরা এলো—জেগেই ছিলাম। সার্জেন্ট তৈয়ার হ'তে বলল—এবার তারা বুঝতে পেরেছে। বুকফাটা কান্না সুরু হলো, কত অনুরোধ, কত উপরোধ, কত আক্ষেপ, কত বিলাপ যেন অসহায় দুটি মানব শিশু বন্য জানোয়ারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য সমগ্র মানব ও প্রকৃতির কাছে তাদের সকরুণ আবেদন জানাচ্ছে।

আর সময় নেই—ফাঁসীর নির্দ্ধারিত সময় আগত। সিপাহীর দল ওদের হাত দুখানায় পিছন দিক থেকে শিকল পরিয়ে ও দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে গেল, ফাঁসীর মঞ্চে। যাবার পথটুকু কান্নার রোলে ভরে গেলো। তারপর কাণে এলো, লেভার টানার শব্দ—"খট"! সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের কাঠ দুখানা দু'দিকে সরে গেল—দড়ির সঙ্গে বাধা ওদের দেহ পড়লো গহ্বরে। কান্নার রোল, বন্ধ হয়ে গেছে, চারিদিক নিথর-নিস্তব্ধ। সিপাহীরা নিঃশব্দে ফিরে এলো। চেয়ে দেখি, বুড়ো সার্জেন্ট "হাওড়া ব্রিজ"-হাওড়া ব্রিজের মত তার দেহ ছিলো উঁচু ও সেখানে পুলিশ সার্জেন্ট হিসাবে এক সময় পাহাড়া দিত বলে সে নামেই সে পরিচিত ছিল ও দুই তিনটি হিন্দু-মুসলমান সিপাহী আমার ডিগ্রীর সামনে বসে কাঁদছে—আমার চোখেও জল এসেছে।

সারাটা দিন যেন সমস্ত জেলটার উপর বিষাদের এক গুমোট

ভাব বিরাট ডানা মেলে বসে রইল। বেদনা বিধুর এই দিনগুলি মনের নিঃসাব নিঃস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে দিতো।

আবাব গতানুগতিক চললো দিনগুলো। স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙ্গে যাচ্ছে। জেলেব নিম্নতম তৃতীয় শ্রেণীব খাবাবেব ব্যবস্থা (বোধ কবি পুলিশ অফিসাব মন্মথ সেনেব কৌশলেই এ ব্যবস্থা হয়েছিলো) ভাত, ডাল ও তেতুল শাক যেন খেতে পাবছিনা। দেহ যদি চলতে না চায়, তবে ওবা কি মামা-ভাগ্নেব মত হাত পা বেঁধে সামনে টানবে নাকি ? জেলেব হাসপাতালে চিকিৎসার যে সামান্যতম ব্যবস্থা ছিলো, তাও এণ্ডাবসন লাট সাহেবেব কৃপায় উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে—সব আব বাচো চিকিৎসা যা কিছু হয় একমাত্র ডিগ্রীগুলিব মধ্যেই হবে, তাব কোথাও তা হ'তে পাববেনা।

এবই মধ্যে সবল পদক্ষেপে কলকাতাব প্রসিদ্ধ গুণ্ডা খেদাব আগমন হলো। ঝট্‌পট্ বিচাব হয়ে তাব ফাঁসীব হুকুম হ'লো। একদিন মাত্র কম্বল মুড়ে সে প্রকোষ্ঠে শুয়ে বইল, তাবপব খেদা-গুণ্ডাব মনে যেন আব কোন খেদই রইলনা। যাব কাছে মানুষ হয়েছিলো, পিসীমা বা মাসীমা ফাঁসীব আগে এসে ডিগ্রীব কোলে বসে কাঁদাকাটি কবলো। খেদাই তাকে সান্ত্বনা দিল—কাঁদো কেন ?—আবাব তোমাব কোলে ফিবে আসবো, নূতন মানুষ হ'য়ে।

পিসীমা চোখেব জল ফেলতে ফেলতে চলে গেলো। খেদা লাট-বেলাটেব আপীলে ভবসা বাখে নি—বলে ওটা নিরর্থক। তাব জামার মধ্যে বক্তেব সামান্য একটু দাগ পাওয়াতেই নাকি

তার ফাঁসীর হুকুম হ'য়ে গেছে। প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষটির মুণ্ড কেটে ঝড়ে বাওয়া রক্ত নিয়ে ও নাকি কোনও এক রমণীকে দেখাতে গিয়েছিল —সেইই হয়েছিল, ওর কাল। পুলিশ-সার্জেন্টের মুখে শুনতে পেয়েছিলাম যে পর পর পাঁচ ছয়টি হত্যার মামলা ওর বিরুদ্ধে ছিল কিন্তু প্রথম মামলাতেই ফাঁসীর দণ্ড হয়েছে বলে সরকার বাকীগুলোর বিচার করবার জন্য আর এগোয়নি।

ফাঁসার নির্দ্ধারিত দিন এসে গেলো। রাত চারটার সময় অফিসার-সার্জেন্ট ও সিপাহীরা এসে ওকে তৈয়ার হ'তে বলল—খেদা তৈরী হয়েই আছে। ফাঁসী-নামা বলে একটি শপথ জেল কর্ত্তৃপক্ষ পড়ে শোনালো। তাতে লেখা ছিলো, তাদের কোনও দোষ নেই, তারা সম্রাটের আজ্ঞাপরিবাহক—সম্রাটের আইন অনুযায়ী দণ্ডের ব্যবস্থা তারা কার্য্যকরী করছে মাত্র। খেদা স্নান করলো, নতুন জামা কাপড়, সহজভাবে পরে নিল। সবাইর সঙ্গে আলাপ করতে করতে মঞ্চের দিকে যাবার জন্য আপন ডিগ্রী হ'তে পা বাড়ালো। খানিকটা চলবার পর আমার ডিগ্রীর বরাবর এসে সে দাড়ালো এবং সুপারিণ্টেডেণ্ট পাটনী সাহেবকে অনুরোধ করলো, যাবার পূর্ব্বে সে একবার স্বদেশীবাবুর সঙ্গে দেখা করে যেতে চায়। সুপারিণ্টেডেণ্ট ছিলেন, হৃদয়বান লোক প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। খেদা আমার ডিগ্রীর কাছে এসে নমস্কার করলো—আশীর্ব্বাদ চাইলো যেন সে নূতন জীবনে আমাদের মতই সৎকার্য্যে অকুণ্ঠে প্রাণ ঢেলে দিতে পারে। চেয়ে রইলাম, আশীর্ব্বাদও করলাম। কোন গ্রহের ফেরে অন্যায়ের পথে পা বাড়িয়ে সে জীবন হারাতে চলেছে! খেদা চলেছে অচল

অটলভাবে—ফাঁসী-মঞ্চের দিকে। মঞ্চের কাছে এসে সে একটি পান চাইলো, সিপাহীরা তাকে একটি পান দিল। তারপর সবাইকে নমস্কার করে আপন থেকেই মঞ্চে উঠে গেল খোদার জীবন শেষ হলো।

সিপাহী-সার্জেন্ট সব ফিরে যাবার সময় বলে চলেছে—'বাহাদুর হ্যায়', 'শেরকা হিম্মত' 'জরাহ ভি ঘাবরায়া নেহি'। ফাঁসী হ'য়ে যাবার পর এমন স্বচ্ছ আবহাওয়া জেলে বড় একটা দেখা যেতো না—সমস্ত জেলখানা বিষাদের পরিগুঞ্জন থেকে মুক্ত অথচ সবাই খোদার বিষয় নিয়ে আলাপ করছে।

গতানুগতিক জীবন, বেগে বয়েছে। পায়ের শিকল যেন আর টানতে পারছিনা। পা'কেটে গাড়ী টানা মহিষের গলার চামড়ার মত শক্ত হয়ে গেছে—নিরঞ্জনের যেন নেশা কেটেছে বলে, মনে হলো। কাটিবার ব্যথা এখন আর নেই কিন্তু চলবার ব্যথা বেড়েছে কারণ আমাদের শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে।

আবার একদিন বিকেল বেলায় বেড়াবার সময় হঠাৎ রুদ্র-মূর্ত্তিতে এক পাঠান যুবক আসামী হিসাবে দেখা দিল। এসেই আমাকে চিনতে পেরে সেলাম ঠুকে হাসিমুখে হিন্দিতে বললো "আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি, কোর্ট থেকে আপনাদের গাড়ী দুখানা—মেয়ে ও পুরুষের গাড়ী—অনুসরণ করে চলতাম আবার পরের দিন কোর্টে অনুরূপ অনুসরণ করে যেতাম। আমি হলাম লালবাজার সশস্ত্র বিভাগ বাহিনীর লোক। অত্যাচারী প্লেটুন জমাদার এবং আরও কয়েকটাকে গুলি করে এসেছি, বোধ করি সবগুলি মরে গেছে—এখন ফাঁসীতে যাব। আমার মনস্কামনা

পূর্ণ হয়েছে! বহুদিন প্রতীকার চেয়েও ফল পাইনি, আজ তার প্রতীকার করেছি"।

সুগঠিত দেহ, ফর্সা রং, লম্বায় ছয় ফুটের ও বেশী জোয়ান পাঠান যুবকটি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তখুনি তাকে জেলের নিকৃষ্টতম খাবার দিলে, সে বাটিশুদ্ধ দূরে ছুড়ে ফেলে দিল, পরে ফাঁসীর প্রতীক্ষায় রাত কাটালো, যেন ভোর হতেই তার আকাঙ্খিত ফাঁসী তার শিয়রেই এসে যাবে।

তারই পাশে এলো, ফাঁসীর দণ্ড নিয়ে এক বিকৃত মস্তিকের এংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক—বয়স আঠার হবে।

নিজেরই আপন বোনের স্বামীর কটূক্তিতে ক্ষিপ্ত হয়ে খাবার টেবিলের ছুরিখানা নিয়ে তার বুকে মেরেছিল এবং অবস্থা বুঝতে পেরেই রক্তমাখা ছুরিখানা নিয়ে সে কাঁদতে কাঁদতে নিকটস্থ থানায় গিয়ে নিজের দোষ স্বীকার করেছিল। তারপর থেকে কেউই তাকে সুস্থ মস্তিষ্ক আর দেখেনি। হত্যা করবার সময় সুস্থ মস্তিষ্ক ছিল বলে হাইকোর্টের বিচারপতি কষ্টেলো সাহেব নাকি ওর পরবর্ত্তী মানসিক অবস্থার বিচার করেন নি।

পাটনী সাহেব জেলের কর্ত্তা হলেও ডাক্তার এবং তার উপর তার আবার হৃদয়ও রয়েছে। তিনি কখনও পাগলকে ফাঁসী দেন নি। আসামীকে প্রাণ ভিক্ষার জন্য আবেদন করতে বললে সে চাকুরীর আবেদন করে, যীশুখৃষ্টের মত হাত দুখানাকে চার পাঁচ ঘণ্টার মত শূন্যে তুলে রাখে। ঘুমের বালাই নেই, খাবারের তাগিদ নেই।

ফাঁসী দেবার দিন পড়ে গেছে। সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছে!

ফাঁসীর মঞ্চের পরীক্ষাও শেষ হয়েছে। কিন্তু শোনা গেল কলকাতার পাদরীর দল বড়লাটের কাছে আবেদন জানিয়েছে।

ফাঁসী হবার আগের দিন খবর এলো—ফাঁসীর দণ্ড মকুব হয়েছে। ছেলেটি রাঁচীর পাগলা গারদে চলে গেলো।

পাঠান সিপাহীটির সামরিক পেন্সনভোগী বৃদ্ধ বাপ ছেলের এই অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ পেয়ে ছুটে এসেই কলকাতার ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করলো। সে নাকি তাকে বলেছে—ছেলেকে পাগল 'বনতে' বলো তবেই সে হয়তো বাঁচতে পারে। এই ঘটনায় পুলিশের মর্যাদা ও শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হয়েছে, তাই তারা মামলা করতে চাচ্ছেনা। ছেলে রাজী হচ্ছেনা—শেষ পর্য্যন্ত বাবার চোখের জল দেখে সে রাজী হলো। কিন্তু পাগল 'বনবে' কি করে? তার জন্য সে উপদেশ চাইলো! তাকে বল্‌লাম,—খাবার খাবেনা—যা খাবে যেন অনিচ্ছায় বা লুকিয়ে—বেশী খাবারই ছুড়ে ফেলে দিবে। কাউকে সামনে পেলেই তেড়ে মারতে আসবে। রাতে কখনও ঘুমিওনা. একটুকু ঘুমাবে দিনের বেলায়। দিনের বেলায় ঘুমালে রাত জাগতে তোমার অসুবিধা হবেনা এবং তখন চোখ দুটো এমনই পাগলের মতন লাল দেখাবে। মলমূত্র যেখানে সেখানে ত্যাগ করবে ইত্যাদি। এই ভাবে সে দু'চার মাস চলার পর তাকে পাগল বলে কোর্ট সিদ্ধান্ত করলো, অবশ্য পিছনে নিশ্চয়ই কোনও ইঙ্গিত ছিল। তাকেও রাঁচী পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দিল।

ছাব্বিশ

একদিন একটি সার্জ্জেন্ট অতি সংগোপনে জানালো, ভারতে ফিরিয়ে আনবার জন্য এবং রাজনৈতিক উন্নত শ্রেণীভুক্তির দাবীতে আন্দামানের বিপ্লবী বন্দীরা অনেকদিন থেকেই অনশন সুরু করে দিয়েছে এবং তাদের দাবীর সমর্থনে দেশব্যাপী প্রচার ও আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। দেশের বড় বড় নেতারা এমনকি রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত তাদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

বাইরের জগৎ থেকে ওরা আমাদের এমনি করে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল যে অনশনের কোনও খবরই আমাদের নিকট তখন পর্য্যন্ত পৌঁছায়নি। অনশন সম্বন্ধে কিংকর্ত্তব্য স্থির করবার জন্য নিরঞ্জনের সঙ্গে আলাপ করে আমরা সিদ্ধান্ত করলাম যে আরও সঠিক না জেনে অনশনে যোগ দেওয়া আমাদের পক্ষে সমীচীন হবে না। এরই মধ্যে সংবাদ এলো যে আন্দামান থেকে পশ্চিমের দু'চার জন বিপ্লবী বন্দীকে ফিরিয়ে এনে আমাদের সারিবদ্ধ ডিগ্রী গুলোর দূরপ্রান্তে রেখেছে—সেখানে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল না। তাদের আগমনের সংবাদ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, আন্দামানে অনশন সমাপ্ত হয়েছে অথবা সমাপ্তির অধ্যায়ে এসেছে। মাত্র কয়দিন পর পরিচিত একটি মুসলমান ডেপুটি জেলার নিঃশব্দে এসে জানালেন গবর্ণমেণ্টের চিঠিপত্র ও নির্দ্দেশ হতে মনে হয় আপনাদের দু'জনকেই

আলিপুর জেলে শীঘ্র স্থানান্তরিত করবে, আমরা তার নির্দেশের অপেক্ষায় আছি। তিনি আরও জানালেন অত্যাচারীদের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দৈনিক কাগজ গুলো জোর লিখছে। পরে জানতে পেরেছিলাম যে প্রেসিডেন্সী জেলের রাজবন্দীরা বাহিরে গোপনে সংবাদ পাঠিয়ে এই প্রচারে সাহায্য করেছিলেন। তার পর তিনি তার বড় ভাইএর মৃত্যুর এক মর্মন্তুদ সংবাদ দিলেন। তারই মুখের কাহিনী লিখছি। –

আপনি জানেন, আপনি ও আপনার বন্ধু ধীরেন বাবু (ধীরেন্দ্র কুমার মুখার্জ্জি) যখন বক্সার কমাণ্ডেণ্ট বোথাম সাহেবকে মারবার অভিযোগে জলপাইগুড়ি জেলে বিচারাধীন আসামী ছিলেন, সেই সময় (১৯৩১-৩২ সাল) আমার দাদা ছিলেন সেখানে ডেপুটি জেলার। দাদা ছিলেন নিতান্ত সাদাসিধে ও গোবেচারা প্রকৃতির মানুষ। আপনারা উক্ত মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করবার জন্য একখানা চিঠি ঢাকার প্রাচীন উকীল ও দেশ নেতা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট লিখে দাদার নিকট দিলে দাদা জেলের সাধারণ নিয়ম মত সেখানকার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ও সিভিল সার্জ্জন মেজর হুয়াংকে দিয়ে পাশ করিয়ে চিঠিখানা ডাকে দেবার জন্য নিজের টেবিলের ওপরই রেখে দেন। ইতিমধ্যেই জেলার বাঙালী গোয়েন্দা অফিসারটি কোনও উপলক্ষ্যে জেলের ফটকের ভিতরে এসে হাজির হয় এবং চিঠিখানা তার টেবিলের ওপর দেখতে পেয়ে দাদাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে যে আপনাদের লিখিত চিঠিখানা জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কর্ত্তৃক পাশ হয়ে ডাকে দেবার

অপেক্ষায় মাত্র আছে। তখুনি সে দাদার বিনা অনুমতিতে চিঠিখানা নিয়ে যায় এবং জেলার পুলিশ কর্ত্তা হডসন সাহেবকে (যে ঢাকাতে দীনেশ, বাদল, বিনয় কর্ত্তৃক গুলিতে জখম হয়েছিল) দেখিয়ে দাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে সে বিপ্লবী বন্দীদের চিঠি পুলিশকে না দেখিয়ে ডাকে দেবার ব্যবস্থা করেছিল। ফলে দাদার চাকরিটি যাবার মতনই অবস্থা হয়। জে, এম, সেন গুপ্ত মহাশয় তখন জলপাইগুড়ি জেলে রাজবন্দী। তিনি ঘটনাটি জানতে পেরে জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিষ্টার ইয়ংকে বলে দাদার চাকরিটি অতিকষ্টে বজায় রাখতে সমর্থ হলেন কিন্তু দাদাকে সরাসরি ডেপুটির পদ হতে অপসারণ থেকে তিনি রক্ষা করতে পারলেন না।

দাদার সংসার ছিল বড়, কেরাণীর সামান্য আয়ে তার সংসার চালানো অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে দাদা বরিশাল জেলে বদলী হয়ে এলেন। সেদিন বাৎসরিক জেল পরিদর্শনের সময় কারাধ্যক্ষ মিষ্টার অনুপ সিং এর কাছে দাদা তার অতীত ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে নিবেদন করলেন যেন তিনি তাকে ক্ষমা করে তাকে পুরাতন পদে বহাল করেন কারণ তিনি স্বল্প আয়ে তার বড় সংসার চালাতে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। কারাধ্যক্ষ মিষ্টার সিং দাদাকে মুখের ওপরই জবাব দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে তার গুরুতর অপরাধের কোনও ক্ষমা হতে পারে না এবং তাকে চিরকালই কেরাণীর পদে থাকতে হবে। দাদা সেই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে নিজের দুঃখের অবসান করলেন।

চোখের জল ফেলে সে চলে গেল। সাম্রাজ্যবাদীর জীঘাংসার জঠরে নিরীহ আমানুল্লার প্রাণ দিতে হলো। স্মৃতির পাতায় অলিখিত শহীদের তালিকায় আমানুল্লা এসে যোগ দিল। আমানুল্লাকে ভোলা যায় না।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আমরা স্থানান্তরিত হলাম। আন্দামানের অনেক বন্ধুরা সেখানে এসেছেন। বহুদিন পর তাদের সাথে আবার মিলন হলো।

কিন্তু বড় কর্তাদের নীতি বদলের সূচনা হলেও খুদে শাসন কর্তাদের আচার ব্যবহার বা মতি গতিতে তখনও কোন পরিবর্তন আসেনি। তিন চার দিন পর জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আন্নাস্বামী আয়েঙ্গার আই, এম, এস রোজকার মতনই জেল্ পরিদর্শনে বের হয়ে আমাদের রাজনৈতিক বন্দীদের সারিবদ্ধ প্রকোষ্ঠগুলির সামনে দলবল সহ উপস্থিত হলেন। তাকে আমি আমার অর্গলবদ্ধ প্রকোষ্ঠের ভিতর হতে আবেদন জানালাম যেন তিনি নিরঞ্জন ও আমার পা'দুখানাকে ডাণ্ডাবেড়ী থেকে মুক্ত করে দেন। তিনি সরাসরি অস্বীকৃতি জানালে কারাধ্যক্ষকে লিখবার জন্য আবেদন পত্র চাইলাম কিন্তু তাও তিনি প্রত্যাখান করতে মোটেই দ্বিধা করলেন না। তারপরে হাইকোর্টে টিটাগড় মামলায় আমাদের পক্ষ সমর্থনকারী এড্ভোকেট ও ব্যারিষ্টারদের নিকট চিঠি লিখবার জন্য অনুমতি চাইলে, তিনি তাও নিঃসঙ্কোচে অগ্রাহ্য করে প্রকোষ্ঠের বারান্দা থেকে দল বল নিয়ে অন্য প্রকোষ্ঠের দিকে এগিয়ে চললেন।

দীর্ঘ জেল অভিজ্ঞতায় বাঙলা বা বাঙলার বাইরে এযাবত

কোনও ইংরেজ বা ভারতীয় অফিসারের কাছ থেকে অভিযোগ করা নিয়ে এমনতর তাচ্ছিল্যকর জবাব পাইনি। জবাবের ওপর রূঢ় জবাব পেয়েছি, জবাবের ওপর লাঠি বা গুতোর ভয় পেয়েছি কিন্তু এ রকম তাচ্ছিল্যকর জবাব দেবার মত নীচতা কখনও দেখিনি। এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে তাই আমার মন রুখে দাঁড়ালো।

তাকে ধৈর্য্যের সঙ্গে আমার কথা শুনবার জন্য পিছন থেকে হেঁকে ডাক দিলাম ও আমাদের ন্যায্য দাবীকে অস্বীকার করবার কারণ জানতে চাইলাম। উত্তরে পেলাম রূঢ় জবাব, "shut up" (চুপ করো। পারিষদ দল "shut up" এর প্রতিধ্বনি তুললো। বন্দীর অভিযোগ বুঝবার বা শোনবার কোনও ইচ্ছাই এঁতে নেই—জেলখানায় জেলকর্ত্তার আগমন-নির্গমনের সাথে বন্দীদের অভিযোগ শুনে যে প্রতিকারের সামান্যতম ব্যবস্থা আছে, তার প্রয়োজন যেন সুপারিন্টেডেন্টের মন থেকে উঠে গেছে। উপরন্তু রূঢ় জবাব দিয়ে বন্দীর হাত পা বাধার মত মুখ বাধার প্রচেষ্টা যেন অসহনীয় মনে হলো। তাই তাকে এবার "shut up" (চুপ করো) এর জবাব দিতে সুরু করলাম। জবাব শুনে দলবল নিয়ে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ফিরে এলেন ডিগ্রী খুলে আমাকে সায়েস্তা করবার জন্য। তারপর কি-যেন-কি ভেবে বাইরে টাঙানো আমার কয়েদ পঞ্জীখানা—(History ticket) উলটিয়ে শাস্তি লিখবার জন্য কলম উঠালেন। তাকে বললাম, অনর্থক মূর্খের মতন শাস্তি দেবার বা ভয় দেখাবার কোনও মানে নেই কারণ আমার দেহে অথবা আমার কয়েদ পঞ্জীখানার মধ্যে শাস্তি দেবার কোনও জায়গা নেই।

জেলের বড় সাহেব যখন কলম ধরেছেন তখন নিজের মর্যাদার খাতিরে শাস্তি তার লিখতে হবে। নির্জন কারাবাসের হুকুম লিখে দলবল নিয়ে তিনি প্রস্থান করলেন। তখনি সার্জেন্ট সিপাহীরা আমাকে নির্জন কারাবাসে নিয়ে গেলো—আলিপুর জেল থেকে পালাবার সময়কার ডিগ্রীগুলির নিকটস্থ (চৌদ্দ নম্বর ডিগ্রীর) একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে।

ডাণ্ডাবেড়ী কাটাবার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে নির্জন কারাবাসে অনশন সুরু করে দিলাম। জেলের রাজনৈতিক বন্দী বন্ধুরা সে খবর পেয়ে আন্নাস্বামী আয়েঙ্গারের সাথে দেখা করলো এবং সঠিক অবস্থা জানবার জন্য আমার সঙ্গে নির্জন কারাবাসে দেখা করবার অনুমতি চাইলো। প্রতিনিধি স্থানীয় দু'জন বন্দীকে বন্ধুবর সুনীল চাটার্জ্জি (ষ্টেট্‌সম্যান সম্পাদক ওয়াট্‌সনকে গুলি করে হত্যার প্রচেষ্টায় যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত) ও পরেশ গুহকে (আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত) অনুমতি দিলে তারা এসে আমার সঙ্গে দেখা করলো। আন্নাস্বামী তাদের জানিয়েছিলেন যে আমি তাকে গালি দেবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি নির্জন কারাবাস থেকে মুক্তি দিয়ে আমাকে বন্ধুদের সঙ্গেই একত্রে রেখে দিবেন। আন্নাস্বামীই প্রথম দোষ করে ছিলো তাই সে নিজের অন্যায় ও ভুলের জন্য দোষ স্বীকার করলে, আমিও নিজের দোষ স্বীকার করতে পারি কিন্তু তার পূর্ব্বে কিছুতেই তা হতে পারে না—আমার একথা বন্ধুরা স্বীকার করলো এবং আন্নাস্বামীকে তারা তা জানিয়ে দিল। তাকে জানাবার পরও অবস্থা অপরিবর্ত্তিত রয়ে গেল। সেদিনমাত্র আন্দামানে জীবন পণ করে বন্ধুদের অনশন

করার কথা বিবেচনা করে আমি অনশন ত্যাগ করতে বাধ্য হলাম। আমার অনশন জানত অবস্থা দল নির্বিবশেষে সেখানকার সকল রাজনৈতিক বন্ধুদের বিচলিত করে তুলবে কারণ রাজনৈতিক দাবাতে আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

শীঘ্রই আন্নাস্বামী আয়েঙ্গার আলিপুর জেল থেকে অন্য জায়গায় বদলী হ'য়ে গেলেন। তার জায়গায় এলেন একজন বাঙালী-কর্ণেল এম, দাস আই, এম, এস,। মেদিনীপুর জেলে থাকার সময় রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ভাল ব্যবহারের জন্য তিনি সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন। একটি ঘটনাতে তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কয়দিনের মাত্র ছুটিতে তিনি তার স্ত্রীকে রেখে কোথাও কার্য্যোপলক্ষে গেলে মেদিনীপুর জেলের কুখ্যাত কাজী উপাধিধারী মুসলমান জেলার টি ও একজন বাঙালী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তাদের মনের ঝাল মেটাবার জন্য দুইজন রাজনৈতিক বিপ্লবী বন্দীকে মৃগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য (দাসপুর দারোগা হত্যা মামলায় দণ্ডিত) ও কৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তী (বক্সা ক্যাম্পের পলাতক ও আগরতলা ডাকাতির মামলায় দণ্ডিত) কে বেত মারবার চক্রান্ত করে।

বেত মারবার আয়োজন যখন সম্পূর্ণ তখন সেই খবরটা কর্ণেল দাসের বিদুষী পত্নী জানতে পারেন এবং জানতে পেরেই স্বামীকে তখুনি তারবার্ত্তা পাঠিয়ে দেন। তার পেয়ে কর্ণেল দাস বেত মারবার ঠিক পূর্ব্বেই পৌঁছে যান এবং কাজীর "পাজী" আয়োজন সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেন।

কর্ণেল দাস আলিপুর জেলে পৌঁছে নির্জন কারাবাসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি সব জানতে চাইলে তাকে সব খুলে বললাম। অনুপ সিং কারাধ্যক্ষ হিসাবে প্রেসিডেন্সী জেলে থাকাকালীন ডাণ্ডাবেড়ী ও তার কষ্টের কথা সম্বন্ধে নিরুদ্বেগ মন নিয়ে যখন কথা বলছিলেন তখন তাকে যেমন করে বলেছিলাম-- Escape from prison is the dream of every freedom fighters- shoot or kill we shall try it as long as our country is in bondage —দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক স্বাধীনতা-কামী বন্দীর পালানো একটা নৈতিক ধর্ম—তোমরা গুলিই করো অথবা মেরেই ফেলো, তাতে আমাদের অবস্থার কোনই পরিবর্তন হবে না কিন্তু তৎসত্ত্বেও জেলখানায় বন্দীদের মনুষ্যত্বের নিম্নতম উপযোগী খাবার দাবার ও থাকার ব্যবস্থা তোমাদের করতে হবে, তেমনি কর্ণেল দাসকেও বললাম যে ডাণ্ডাবেড়া থেকে স্বাভাবিক ভাবেই পা দুখানাকে মুক্ত করতে হবে। কর্ণেল দাস রাজী হলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে এক মাসের মধ্যেই তিনি ডাণ্ডাবেড়ী খুলে দেবেন। ইতিমধ্যে তিনি ডাণ্ডাবেড়ার জায়গায় হালকা শিকল-বেড়া পরিয়ে দেবার আদেশ দিলেন। একমাস পর তিনি ডাণ্ডাবেড়ী থেকে আমাদের পা দুখানাকে মুক্ত করলেন।

কঢ় জীবনের সঙ্গী হিসাবে দীর্ঘকাল যারা পায় জড়িয়ে ছিল এবার তাদের বিদায় দিলাম পীড়নের প্রধান আঙ্গিক-চিহ্ন দূর হলো। পীড়নের অধ্যায়ের ওপর যবনিকা পাত হলো। দেহের উপর দাগ কাটার মতই মনের মধ্যেও তারা অসংখ্য

ছোট বড় দাগ কেটে রেখে গেছে। নিকটতম বন্ধুর পাশে দূর বিদেশীর আত্মীয়তার কণ্ঠ এসে জীবনের আদর্শকে পূর্ণ করেছে—অগ্নির দাহিকায় কৃত্রিমতার মুখোস খুলে গেছে—সঙ্কীর্ণ গণ্ডি কেটে মানবিক বিচার বোধের মধ্যে আদর্শ বিস্তার লাভ করেছে। ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন আমাদের স্বপ্নের দুয়ার পার হয়ে বিশ্বের দরবারে হানা দিচ্ছে—সৈনিকের আত্মত্যাগের বাস্তব ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তার দাবী—"এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন-- আসিবে সে দিন আসিবে।"

সাতাশ

হাইকোর্টে টিটাগড মামলার আপীল চলেছে। বিচারপতি কষ্টেলো সাহেব ট্রাইব্যুনালের বিচারে সন্তুষ্ট হননি। দণ্ড বাড়াবার জন্য পুনর্বিচারের কথা তুলেছেন কিন্তু গভর্ণমেণ্টের আইন উপদেষ্টা নাকি বলেছেন যে ট্রাইব্যুনালের দণ্ড বাড়ান যাবে না বা পুনর্বিচারের জন্য আবার নতুন করেও ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যাবে না। তাই আমাদের দণ্ড যা ছিল তাই রয়ে গেলো।

কয়েদ-পঞ্জীতে আমার মেয়াদের সীমারেখা, ১৯৭১ সাল। ১৯৭১ সাল পেরিয়ে রয়েছে, পাশ্চাত্যের রাম সিং। বাংলায়ও ১৯৭১ সাল বা তার নিকট সময়ের দু'চারজন মেয়াদের দোসর আছেন—কুমিল্লার "ইটাখোলা মামলার" নিরাজ দের বরিশালের ফণী দাশগুপ্ত, "আন্তঃপ্রদেশিকের" প্রভাত চক্রবর্ত্তি ও জিতেন গুপ্ত ও "হিলির" প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী —সঙ্গীর অভাব নেই।

আদর্শবাদের বিচারে বিপ্লবী বন্দীদের ভিতর আভ্যন্তরিণ পরিবর্ত্তন সুরু হয়েছে। জাতীয়তাবাদের আদর্শের গণ্ডীর বাইরে অনেকের মন ছুটে চলেছে—মার্ক্সীয় দর্শনে, লেনিনবাদে বা ষ্টালিন পন্থায়। নিছক আদর্শের বিচারে জাতীয়তাবাদের গণ্ডীকেটে বের হয়ে গেলো এক দল, তাদেরই টানে আবার একদল। এমনি করে জাতীয়তাবাদের পুরাতন ভিত্ খসে পড়তে লাগল। দণ্ডিত

বিপ্লবীদের আমূল মানসিক পরিবর্ত্তনে পুরাতন দল ও সংহতির রূপান্তর ঘটলো। জাতীয়তার স্বপ্নে-গড়া বাংলা দেশ দীর্ঘকাল ভারত রাষ্ট্রীয় গগনকে উদ্ভাসিত করে রেখেছিল—সুদীর্ঘকালের এই বৈপ্লবিক পটভূমিকায় পরিবর্ত্তন হলো। ইংরেজ রাজশক্তি বিপ্লবী-দের সবল আঘাত থেকে মুক্তির সম্ভাবনায় নূতন পটভূমিকাতে প্রস্তুতি সুরু করলো।

বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তির দাবিতে দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। মহাত্মা গান্ধী বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তি প্রচেষ্টায় এগিয়ে এলেন। স্যার নাজিমুদ্দিন তখন ছিলো বাংলার প্রধান মন্ত্রী ও হোম্-মিনিষ্টার। মহাত্মা বন্দীদের মুক্তির জন্য মুক্তি—বিরোধী শক্তি গুলোর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে মুক্তিকে সহজ করার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীদের কাছ থেকে অহিংসার প্রতিশ্রুতি আদায়ের প্রচেষ্টা করলেন। অনেক হাঁটাহাঁটি ও ঘাঁটা-ঘাঁটির পর মহাত্মা গান্ধী শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন—বন্দী মুক্তির প্রচেষ্টায় মহাত্মার ব্যক্তিত্ব নাজিমুদ্দিন বা অন্যান্য রাজপুরুষদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হলো না। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের "ডিয়ার নাজিম" প্রভুদের নিকট বিশ্বস্ততার পরিচয় দিল।

গণ আন্দোলনকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তির বিষয় নিয়ে সরকার বন্দীমুক্তি পরামর্শ কমিটি নাম দিয়ে একটি কমিটি গঠন করলেন।

শ্রদ্ধাস্পদ শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়কে ও তার সভ্য পদে মনোনীত করলেন কিন্তু হাল চাল দেখে শরৎবাবু বুঝতে পারলেন

যে সরকার তাদের সুপারিশ মেনে নেবেনা তাই তিনি কমিটি থেকে সরে দাঁড়ালেন। কমিটির কাজ বেশী দূর এগোলনা। দু'চার জনকে তারা সর্তাধীনে মুক্তির সুপারিশ করলেন কিন্তু অনেকেই তা গ্রহণ করলোনা। সর্তাধীনে মুক্তি অগ্রাহ্য করলো মেদিনীপুর বাজ্জ-হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত, শান্তি সেন। বয়স অল্প বলে কমিটি তাকে মুক্তির সুপারিশ করেছিলো কিন্তু সর্তাধীন মুক্তি নামা সে অম্লান বদনে অগ্রাহ্য করে অন্যান্য সবাইর মত তার দীর্ঘ দণ্ড ভোগ করে যেতে লাগলো।

দণ্ডিত বিপ্লবীদের মধ্য থেকে নয়, বন্দীদের ও বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের বিভিন্ন ক্যাম্প ও জেল থেকে শেষ পর্য্যন্ত বাংলা সরকার মুক্তি দিতে বাধ্য হলো। নূতন শাসনতন্ত্র বলে গঠিত বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস মন্ত্রী সভা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের দণ্ডিত বিপ্লবী বন্দীদের জেল থেকে থেকে মুক্তি দিল। একমাত্র রয়ে গেল বাংলার ও পাঞ্জাবের দণ্ডিত বিপ্লবী বন্দীরা। জনমতের দাবীর কাছে শেষ পর্য্যন্ত অকংগ্রেসী পাঞ্জাব মন্ত্রীসভা ও তাদের জেল থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো। রইল শুধু বাংলার দণ্ডিত বিপ্লবী বন্দীরা—সংখ্যায় প্রায় আশীজন। তাদের দুই অংশে ভাগ করে, এক অংশকে আলিপুর সেনট্রাল জেলে, অপর অংশকে দমদম সেনট্রাল জেলে রেখে দিল। বাংলা সরকারের নীতিতে বোঝা গেল যে দণ্ডিত বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তি বিনা আন্দোলনে সম্ভব হবে না। অন্যান্য প্রদেশে এমনকি পাঞ্জাবে সম্ভব হলেও, বাংলার মুক্তি বিরোধী শক্তিগুলির গুরুত্ব ও সমাবেশ ছিলো বেশী। বাংলার এই কঠিন

প্রশ্নের সমাধান করবার জন্য নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা সুরু হলো।

আমাদের স্পষ্টই মনে হলো য়ুরোপীয় বণিক সভা ও লীগের সম্মিলিত বাধাকে শিথিল করবার ওপর একমাত্র দণ্ডিত বন্দীদের মুক্তি নির্ভর করে। আমরা বিচার করলাম যে ১৯৩৫ সালের আইনে গঠিত মন্ত্রীসভাকেও দেশবাসীর বিশ্বাস পেতে হলে রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির প্রশ্ন সমাধান করতে হবে।—তদুপরি ভারতের প্রতি ব্রিটিশের আন্তরিকতার প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে। এসব বিবেচনা করে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে যদি আমরা অনশন সুরু করে দেই তবে দেশের গণ আন্দোলনের প্রবল আঘাত ওদের সম্মিলিত বাধাকে ভেঙ্গে দিয়ে আমাদের মুক্তি ত্বরান্বিত করবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে স্বায়ত্ত শাসনের আসল পরিচয়টুকু সমগ্র দেশ উপলব্ধি করবে ও বিপ্লব-আন্দোলনের শক্তি তাতে বৃদ্ধি পাবে। এই বিচারের পর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে, ৭ই জুলাই, ১৯৩৯ সাল, আমাদের অনশন সুরু হয়ে গেলো। দমদম জেলের বন্ধুবাও খবর পেয়ে অনশনে যোগ দিল।

অনশন মেটাবার জন্য মহাত্মা গান্ধী তার সেক্রেটারী শ্রীমহাদেব দেশাইকে বাংলায় পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর সাথী হলেন ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়। মুক্তির প্রশ্নে তাঁরা অনশন মেটাতে পারলেন না। বন্দীরা যখন অনশনে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় এসে গেলো, তখন সুভাষ চন্দ্র নিজে এসে অনশন স্থগিত রাখবার জন্য সবাইকে অনুরোধ করলেন। সুভাষ চন্দ্র ছিলেন, কর্ম্মীপুরুষ।

সংগ্রামের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দাবী বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তি প্রবল আন্দোলন ও সংগ্রামের ভেতর দিয়েই একমাত্র সম্ভব। মুক্তি যতই জোরালো হোক না কেন, জনতার দাবী মাঠ পেরিয়ে তাদের গায়ে [illegible] না কেন প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থবাদী শক্তির নিকট যে তার কোনই দাম নেই—এদের নিকট একমাত্র মূল্য হলো শক্তির পরিচয় সে কথা সুভাষচন্দ্র জানতেন তাই তিনি শক্তি সমাবেশ করবার জন্য সময় চাইলেন—নেতৃত্বের উপযুক্ত দাবী। সুভাষ চন্দ্রের দাবী সবাই মেনে নিলো—তখন [illegible] ১৯৩৯ সাল।

এই সময় আমরা বাইরে থেকে লুকিয়ে এনে নিষিদ্ধ দৈনিক কাগজ পড়তাম। সংবাদ চুরির মহাবিদ্যায় আমরা পারদর্শী ছিলাম। মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় দণ্ডিত শচীন কর গুপ্ত ছিলেন আমাদের পত্রিকা পড়িয়ে শোনাবার মাষ্টার। গড়গড় করে তিনি পড়ে যেতেন, আমরা তার চার পাশে ঘিরে বসতাম শোনবার জন্য। আমরা প্রত্যেকেই ছিলাম শচীন কর গুপ্তের এক একটি প্রহরীর মত।

আটাশ

বাইরের রাজনৈতিক আকাশে মেঘ জমে উঠেছে—মেঘের গুরু গুরু ডাক কানে আস্‌ছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজিত জার্ম্মানী আবার নিছক জাতীয়তার বর্ম্ম পরে সমগ্র য়ুরোপের ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জার্ম্মান সামরিক অফিসার হিট্‌লার জার্ম্মান জাতির নায়ক। ফিল্ড মার্শাল ফন্‌ হিণ্ডেন বুর্গের সামরিক শক্তি ও কৌশলকে রূপদান করে জার্ম্মান জাতিকে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতম জাতি হিসাবে দাঁড় করতে সে বদ্ধ পরিকর। "ফুরার" হিটলার জার্ম্মান জাতির মধ্যে প্রেরণা জাগিয়েছে।—প্রেরণা, ফুরারের নেতৃত্বে বৃহত্তর জার্ম্মানী সৃষ্টির অভিযান, তা সে যেখানেই হোক না কেন। ফ্যাসিষ্ট মতবাদী ফুয়ার সাম্যবাদী রুশিয়াকে আঘাত হান্‌বে—তা অনিবার্য্য সত্যি, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ও গণতন্ত্রী ইংলণ্ড সেই আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার নিশ্চিত ভরসা কোথায়? জার্ম্মানীর চিরশত্রু ফরাসী দেশ তার আক্রমণের অন্যতম প্রধান ভাগ—তাই ফরাসীরা জার্ম্মান প্রান্তে "ম্যাজিনো লাইন" বানিয়ে দূর পাল্লার কামান বসিয়ে নিজের দেশ রক্ষা করছে, তার ওপারে জার্ম্মানরাও "সিগফ্রি" লাইন বানিয়ে ওঁত পেতে বসে আছে। ছোট ছোট সমুদ্র পারের দেশগুলো মায়ের অঞ্চল ধরে অসহায় ভাবে সম্ভাব্য

আক্রমণকারী জার্ম্মানীর দিকে ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। জার্ম্মান বলে বলীয়ান লৌহ ও ইস্পাতের স্তূপ পরে বাহাদুর উচ্চস্বরে ফ্রান্স-স্পেনের প্রলোভন জাহির করে মুসোলিনী জার্ম্মানীর হাতের পুতুল হয়েছে — আজকে রোমের সেই গৌরব সাম্রাজ্য স্থাপন করবার দুর অভিলাষ, তার ইস্পাত বর্শিকা বক্ষের নাচে। তবু সত্য কিন্তু স্বাধীন এ্যাবিসিনিয়ার স্বাধীনতাটুকু নিয়েছে কেবল তার স্বাধীনতার উপর বিষ-বাষ্প ছড়িয়ে দিয়ে এ্যাবিসিনিয়ার নিরীহ মানবের শক্তি দেখাবার হয়েছেন কিন্তু, তবু সত্য এ্যাবিসিনিয়ান বাহিনী জার্ম্মান সামরিক শক্তি। তাদের সংগ্রামটুকু বিশ্ববাসীকে দিয়েছে — ইতালী দুর্ব্বল।

জার্ম্মানী নিশ্চয় আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হবে সোভিয়েট দেশ নিজের সামরিক শক্তির বলাবল পাছে বুঝে জার্ম্মানীর প্রতি সামরিক পদক্ষেপের সঙ্গে নিজের পদক্ষেপের তাল রেখেছে। ইংলণ্ডে সাগরের মাঝখানটুকু মাত্র পেরিয়ে রয়েছে সমুদ্রের মেখলা। সেখানে ছোট ইংলণ্ড দেশ — রচনা করেছে, আধুনিক জগতে। বাণিজ্য ও উপনিবেশের ইতিহাস পৃথিবীর প্রান্ত হতে প্রান্তে, বানিয়েছে আধুনিক গণতন্ত্র নিজের দেশের মাটির উপর — শতাব্দের সংগ্রামের বিনিময়ে। তার বিরাট ও বিস্তৃত সাম্রাজ্য রক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে নিজের দেশের আত্মরক্ষার প্রশ্ন জড়িত। জার্ম্মান সামরিক শক্তির তুলনায় এখনও সে দুর্ব্বল, তাই দেশের গণতন্ত্রের সবর প্রতিবাদ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেনের তোষণ নীতির বিরুদ্ধে। অতলান্তিক পার হয়ে রয়েছে স্বাধীন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র।

সম্পদে, বৈভবে ও দক্ষতায় সে সবার শীর্ষে। গণতন্ত্রের পূজারী বলে পরিচিত জর্জ্জ ওয়াশিংটনের দেশে প্রতিক্রিয়াশীল অথবা এক নায়কত্বের কোনও দল তখনও আমেরিকানদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। আমেরিকার শক্তি ও সম্পদ হিটলারের ত্রাসের কারণ।

দূর প্রাচ্যে জাপান একক শক্তি। সাম্রাজ্যবাদীর ভূমিকায় চীনের ওপর দৌরাত্ম্য করে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে, অপেক্ষা করছে নতুন কোনও সুযোগের আশায়। মেঘ যত জমবে, জাপানের প্রাচ্যের ভূমিকা তত সহজ ও ত্বরান্বিত হবে—তাই সে সুচতুর ভাবে রাষ্ট্র গগনের প্রতি লক্ষ্য রাখ্ছে।

জার্ম্মাণ সামরিক শক্তির পুনরুভ্যুত্থানের সাথে সমগ্র দুনিয়ার শক্তি পরীক্ষা অনিবার্য্য ভাবে এগিয়ে এসেছে। পরাধীন দেশ সমূহের আন্তরিক কামনা, যেন শত্রুর হাতে তার শাসক শক্তির পরাজয় ঘটে। পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার জন্য শাসকের দুষমনের সাথে মনের মিল সহজেই এসে যায়—ইংরেজের দুষমন আমাদের বন্ধু, ইংরেজের বন্ধু আমাদের দুষমন। পরাধীন জাতির মনের ছক্ ইতিহাস এইভাবেই রচিত করেছে।

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ সাল হিটলার ঝাঁপিয়ে পড়লো ক্ষুদ্র পোলাণ্ডের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে রুশিয়া পূর্ব্ব-পোলাণ্ডে তার বাহিনী পাঠিয়ে দিল। পোলাণ্ড ভাগ হয়ে গেল।

এবার বিজয়ী জার্ম্মানী পশ্চিমে মুখ ফিরিয়ে ফরাসী দেশের দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো—বিদ্যুত আক্রমণে ফরাসী ও ব্রিটিশ বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। ফরাসী দেশ জার্ম্মানীর পদানত

হলো। ইংরেজ চরম বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হলো। তবুও তারা ভারতের সঙ্গে বোঝা পড়া করলো না। যুদ্ধের পর্ব্ব [illegible] চললো নূতন নূতন রাষ্ট্র এসে যুদ্ধের সঙ্গে [illegible] শামিল হলো। স্বার্থের প্রয়োজনে রক্ষণশীল চার্চ্চিল [illegible] ও আমেরিকার রাষ্ট্র সোভিয়েৎএর সাথে হাত মিলিয়েছে, আর [illegible] সঙ্গে হাত মিলিয়েছে জার্ম্মান, ইতালী ও জাপান। ছোট ছোট দেশ-গুলি কেউ এদিক কেউ বা ওদিক ভিড়ে দাঁড়ালো। কিন্তু বিচারের সঙ্গে জাতীয় স্বার্থের বোঝা পড়াও ভারতে শুরু হলো। পরাধীন ভারত ইংরেজ সাম্রাজ্যের হাত থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্খায় অক্ষ-শক্তির জয়কে নিজেদের জয়ের সম্ভাবনা বলে মনে করলো। সোভিয়েৎ দেশের প্রতি সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও মিত্রপক্ষায় লড়াইকে বিনা সর্ত্তে সাহায্যের কথা স্বাধীনতাকামী ও জাতীয়তাবাদী ভারতের মনে বিশেষ প্রশ্রয় পেলো না এবং জাতির মনে বৈরী ভাব সৃষ্টি হলো। ভারতে ইংরেজ [illegible] আবার একদফা আঘাত শুরু হলো। [illegible] জাতীয়তাবাদী নেতা ও কর্ম্মীরা গ্রেপ্তার হলো। [illegible], বৃটিশের যুদ্ধ সমর্থনকারী এক দল আর ইংরেজের মনোমত সমর্থকবৃন্দ যারা দীর্ঘকাল ধরে ইংরেজ শাসনের তলায় নিজেদের জীবন জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূলতায় গড়ে তুলেছে।

জেলের ভিতরও মাঝে মাঝে যুদ্ধের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। "সাইরেন্" বাজবার সাথে সাথে আমাদেরও ডিগ্রীর ভিতর প্রবেশ করতে হচ্ছে। অষ্ট্রেলিয়ান একজন সাংবাদিককে ভারতের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে ধরে নিয়ে এলো—সে নাকি উটের পিঠে চড়ে

“বাইরের গি[illegible] দিয়ে [illegible] দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে সংবাদ জোগাড় করতে যাচ্ছিল। কিন্তু [illegible] বাইরে যাবার আগে তাকে নিরাপত্তা সংস্থায় [illegible] সাবোতাজ বোর্ডের ভ্যাগাবন্ড [illegible] [illegible] [illegible] ফেরত পাঠানো হয়েছে। [illegible] [illegible] হারাবার জন্য [illegible] [illegible] কোনও সংবাদ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] করে।”

[illegible] সঙ্গে [illegible] খবর [illegible] হলাম। সে বাইরে [illegible] [illegible] সঙ্গে দেখা করতে পারে না। [illegible] [illegible] সাথে সম্পর্ক স্থাপন [illegible] কথা [illegible] [illegible], বিপ্লবী ও নিরপেক্ষ [illegible] [illegible] [illegible] Unsung, unhonoured- [illegible] [illegible] [illegible] দেশেরই [illegible] [illegible]।

বন্ধুবর সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর [illegible] শান্তিপ্রিয় হয়ে জেলে এসেছেন, পাশের [illegible] তিনি বন্দী। মাঝে মাঝে [illegible] মাদের কথাবার্তা চলে। সাম্যবাদে বিশ্বাসী হলেও তিনি স্বাধীনতার প্রশ্নে [illegible]। যুদ্ধকালীন গণতন্ত্রের [illegible] রক্ষা করতে রাজী ছিলেন না বা যুদ্ধের সুযোগে বেশ কিছুটা গোছানো লোকও ছিলেন না। তাই তিনি বন্দীশালায় “বেগার” খাটুনি খাটতে এসেছেন।

জাপান যুদ্ধে যোগ দেবার পর পঞ্চ সমুদ্র ব্যাপী সমরানল পৃথিবীকে যেন ঘিরে ফেলল। এই অনলের মাঝখানে অন্তরীণাবদ্ধ সুভাষচন্দ্র ভারতের মুক্তির স্বপ্নে বিভোর হয়ে দেশ ত্যাগ করতে সমর্থ হলেন। সুভাষ চন্দ্রের ভারত ত্যাগের আনন্দ সংবাদটুকু পরিবেশন করলেন, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। জেলখানার সমস্ত গ্লানিবোধ যেন আনন্দের উচ্ছ্বাসে ধুয়ে মুছে গেলো। সুভাষ চন্দ্র দীর্ঘ জীবি হয়ে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামকে সফল করুক, এই বাণী উত্থিত হলো বন্দীদের অন্তরতম প্রদেশ হতে— কোটি কোটি জনসাধারণের শুভেচ্ছার সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের বাণীও যেন মিলিত হয় সুভাষ চন্দ্রের জয়যাত্রার মঙ্গল পথে।

ইতিমধ্যে যুদ্ধে মিত্রপক্ষের অবনতির কথা বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ আলিপুর জেল থেকে আমাদের সবাইকে ঢাকা জেলে পাঠিয়ে দিল। কেন পাঠালো, তা জানতে না পারলেও অনুমানে মনে হলো যে কলকাতা সহরকে তারা শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ মনে করছে না। ওদের ভাবনা, যদি কলকাতা সহর শত্রুর আক্রমণের ফলে হাত ছাড়া হয়ে যায় তবে বিপ্লবী বন্দীরা তো জেল থেকে সদর রাস্তায় পড়ে শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওদেরই ঠেঙাতে সুরু করবে।

পূর্ব্বেই বলেছি, খাঁচায় বন্দী পাখীর মত আমাদের জীবন যাত্রা সুরু হয়েছে—বিনা বিচারে রাজবন্দীদের জীবন যাত্রার সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য আর নেই। অলস মন্থর দিনগুলি গল্প গুজবে, খেলাধূলায় বা পড়াশুনায় কেটে যেতো। যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করা ছিলো আমাদের অন্যতম প্রধান বিষয়। গান্ধীজির "ভারত

ছাড়ো" আন্দোলনের সাথে সুভাষ চন্দ্রের বর্ম্মার ভিতর দিয়ে ভারত আক্রমণের প্রচেষ্টা বাইরে প্রবল গণ-আন্দোলন ও উৎসাহের সৃষ্টি করেছে—আন্দোলনের উচ্ছ্বাস জেলের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ভিতরেও প্রবেশ করছে। সারা জেলময় প্রবল উত্তেজনা। মানশচক্ষে দেখতে পেলাম, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসের মত 'রাজার' সিংহাসন যেন তাদের খেলা ঘরের মত জনগণের দুর্জ্জয় অগ্রগতির সামনে ধূলিসাৎ হ'তে চলেছে। "Le Etat Moi"—I am the State—আমিই রাষ্ট্র, আমিই সব, এই স্বেচ্ছাচার তন্ত্রের বিরুদ্ধে আবার নূতন করে ভারতে শক্তির লড়াই চলেছে। জনগণের ক্রুদ্ধ গর্জ্জনের রোল কোথায়ও জেল ভেঙ্গে, কোথায়ও রেল উপড়িয়ে কোথায়ও সশস্ত্র বাহিনীকে আক্রমণ করে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘোষণা করছে। শত শত অজানা ও অচেনা শহীদের তাজা রক্তে ভারতের মাটি সিক্ত হচ্ছে। উন্মত্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান, তার সাঙ্গপাঙ্গ ও বুদ্ধিজীবী সহায়তাকারীর দল জনগণের এই প্রবল উচ্ছ্বাস ও সুভাষচন্দ্রের ভারত সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ রুখবার জন্য ঘৃন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। যুদ্ধের প্রয়োজনে যেমনি, যুদ্ধের অপ্রয়োজনেও তেমনি দেশের শস্যভাণ্ডার লুট করে, দেশ ও জাতির নৈতিক চরিত্র বিনাশ করে ভারত ভূমিকে বিশেষ করে বাঙলা দেশকে শ্মশানে পরিণত করছে—শ্মশানের প্রজ্বলিত বহ্নির লেলিহান শিখা উর্দ্ধ গগনে দেখা যাচ্ছে—ওপারে মাতার ক্রন্দন, পিতার শোক, পত্নীর বিচ্ছেদ শ্মশানকে ঘিরে যুদ্ধের আসল বাস্তব যুদ্ধের আসল প্রকৃতির পরিচয় দিচ্ছে।—এই মহাশ্মশানে সাম্রাজ্যবাদী কাপালিকের দল ভারতের নরমুণ্ডের ওপর সাম্রাজ্য সাধনায় রত, সঙ্গে রয়েছে শ্মশান শৃগাল ও কুকুরের দল।

বিপর্য্যয়ে উন্মত্ত ইংরেজ রাজপুরুষ শাসনের অস্ত্রগুলির নির্ব্বিচার ব্যবহারের ক্ষমতা দিয়েছে জেলার গুটিকয়েক ইংরেজ সাহেবদের ওপর তাদের হাতে শাসন [illegible] চালাবার জন্যে শিক্ষিত, অশিক্ষিত বা খুনেদের মধ্যে এখন আর পার্থক্য নেই। ঢাকা জেলে তখন সুপারিটেণ্ডেণ্ট ছিলো নোবল সাহেব। জেলের ভিতরকার কম্বল ফ্যাক্টরীর পুরাতন ম্যানেজার ও ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলে পরিচিত নোবল সাহেব খাস যোগ্য। ইংরেজের যুদ্ধজনিত অভাবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ অলঙ্কৃত করে আছে। ১৯৩০ সালের বক্সা ক্যাম্পের [illegible] গ্রাজুয়েট ও শিক্ষানবিশ আই, সি, এস, লিলুয়ান সাহেব তখন সেখানে নতুন জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট।

ঢাকা জেলে বন্দীদের [illegible] টি শ্রেণী [illegible] পারে। বিনা বিচারে রাজবন্দীরা [illegible] করেছি জেলের অন্য এক অংশ [illegible] ছড়িয়ে গেছে। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বন্দীরা [illegible] দল। যুদ্ধের গতিবেগ বাড়বার সাথে সাথে বিনা বিচারে রাজনৈতিক বন্দীদের সংখ্যা যেমন বাড়তে লাগলো, তেমনি স্বভাব-দুর্বৃত্ত বলে পরিচিতদেরও জেলের মধ্যে পুরে রাখা হলো। তাদের সংখ্যা কম ছিলোনা—ঢাকা জেলে [illegible] তারা চার-পাঁচশ'র মত হবে। রাজবন্দী বন্ধুদের সংলগ্ন একটি ব্যারাকে তাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিলো। আমাদের এখান থেকে তাদের ব্যারাকের দ্বিতল কামরাটি দেখা যেতো। বিনা বিচারে বন্দী করে রাখবার তাৎপর্য্য বা অর্থের সঙ্গে অপরিচিত এরা শুধু জানতো সীমাবদ্ধ জেলের মেয়াদ, আর

মেযাদ অন্তে খালাস হয়ে আবার কোনও অপরাধমূলক অনুষ্ঠানের জন্য জেলে আগমন। চির-অভ্যস্ত গা'র পথের পরিবর্ত্তন তারা পছন্দ করেনি। নূতন জীবন যাত্রায় অনভ্যস্ত এত সব সাধারণ কয়েদী দাবী উঠালো যেন বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীদের মত তাদেরও সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়— না হ'লে তারা "অঘটন" ঘটাবে। রাজশক্তির সঙ্গে অঘটন' ঘটাবার ক্ষমতা বা নিজেদের উচ্চারিত কথাগুলোর তাৎপর্য্য তাদের অশিক্ষিত মনে বোঝবার ক্ষমতা ছিলনা। একথা সত্যি, বাইরের জনতার সরোষ গর্জ্জন বা ইংরেজ রাজশক্তির বিলীয়মান চক্র তাদের অবুঝ দাবীকে উৎসাহ জুগিয়েছে কিন্তু "কম্বলী"-দের এর বুনো মনে এদের দাবীতে জাগালো জীঘাংসার মনোবৃত্তি তাদের সমুচিত শিক্ষা দেবার দুর্দ্দম অভিলাষ। গুটি কয়েক পদস্থ পাণ্ডার সম্মিলিত সভায় রাত্রির বৈঠকে কপালী স্থির হলো শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা, যেন তার প্রভাবে জেলের আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ চিরতরে বন্ধ হ'তে পারে।

পরের দিন অতি প্রত্যুষে বেড়াবার সময় মনে হলো যেন আমাদের প্রাচীর-ঘেরা আঙ্গিনার প্রহরীদের মধ্যে আজ সতর্ক ও সাবধানী ভাব--চঞ্চল পদক্ষেপে পায়চারি করবার সাথে তাদের দৃষ্টি রয়েছে আঙ্গিনার বাইরে। আঙ্গিনার বদ্ধ দরজার গায়ে সিপাহীদের দেখবার জন্য যে একটি সরু ছিদ্রপথ রয়েছে সেখান থেকে কি যেন সঙ্কেতের প্রতীক্ষায় মুহুর্মুহুঃ তারা বাইরে দৃষ্টিপাত করছে। তখনও দিনের আলো রাতের অন্ধকারকে সম্পূর্ণ দূর করে দেয়নি বড়প্রাচীরের ওপারে সিপাহীদের ব্যারাক

থেকে ভেসে আসছে, সিপাহী সমাবেশের পদক্ষেপ আর বহুসংখ্যক রাইফেল জমায়েৎ করবার 'ঝনাৎ-ঝনাৎ' শব্দ। অজানা আশঙ্কায় মনটা ভারী হয়ে উঠলো। জিজ্ঞাসা করলাম, প্রহরীকে সিপাহীদের ব্যারাকের চাঞ্চল্যের কারণ। অতি সংক্ষেপে তারা জবাব দিল—"আভিহি মালুম হো জায়গা"। বলবার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল জেলের ভিতরকার বড় গেট খোলবার আওয়াজ আর দলে দলে সিপাহীদের "মার্চ্চ" করে চলার শব্দ, তারপর সারিবদ্ধ ভাবে সামরিক কায়দায় দাঁড়াবার নির্দ্দেশ এবং সাথে সাথে সামরিক হুকুম "Fire," গুলি করো। গর্জ্জে উঠলো, রাইফেল গুলি স্বভাব-দুর্বৃত্ত বলে পরিচিত বন্দীদের ব্যারাকের দিকে। ভোরের শান্ত প্রকৃতি ঘুম থেকে আচমকা জেগে উঠলো। জাগলো, আতঙ্কিত সহরবাসী। আশঙ্কা—বন্দী ভারতের বন্ধন-মুক্তি কামনায় বন্দীদের নিশ্চিহ্ন হত্যা নয়তো!

বিরামহীন গুলি চলেছে, গুলির প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা প্রতিটি মানুষের জীবন গুণে গুণে নিচ্ছে, ব্যারাকের ইমারতগুলির ইট যেন খসে পড়ছে, লৌহ-গরাদের সঙ্গে গুলির প্রচণ্ড ঘর্ষণে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দিয়ে হত্যাকারীদের জানিয়ে দিচ্ছে—লক্ষ্য ঠিক হয়নি, আবার গুলি করো। গুলির বাক্সগুলির গুলি ফুরিয়ে গেছে—আবার বাক্স এলো—বিরামহীন অজস্র গুলি-বর্ষণ যেন যুদ্ধক্ষেত্রের মত। বারুদের ধোঁয়া ভরে দিল জেলের আকাশটুকু, বারুদের গন্ধ আচ্ছন্ন করে দিল আমাদের বাতাস। আমাদের অসহায় দর্শকের মত বেঁধে রেখে সরকারী দুর্বৃত্তকারীর দল তাদের অভিলাষ পূরণ করছে। গুলি বন্ধ

হলো। সিপাহীরা এগিয়ে চললো, স্বভাব দুর্বৃত্ত বন্দীদের ব্যারাকের দিকে [illegible] করবার জন্য। আবার গর্জ্জে উঠলো রাইফেল [illegible]। [illegible] তলায় যারা লুকিয়ে আত্মরক্ষা করছিলো এবার তাদের গুলি করছে তার যারা নর্দ্দমার ভিতর বা গাছে চড়ে আত্মরক্ষা করছিলো তাদেরও হত্যা করছে। তবুও রক্ত পিপাসা শেষ হলো না। বাঁশের শক্ত লাঠি মৃত ও অর্দ্ধমৃতের মাথা ফাটানো শুরু হলো। জেলের ডাক্তার এলো—[illegible] সিভিল সার্জ্জন, ফসার সাহেব। শোনা যায় তাকে দেখে দু'একজন [illegible] তলায় প্রাণ বাঁচাবার আকুল আবেদন নিয়ে [illegible], তাদেরও সেখানে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারা হয়েছে।

ধরণীর [illegible] জ্বলেছে বাঘ প্রতিহিংসার দাবানল! নিঃশব্দ শ্মশানের [illegible] বসে রইলাম। বেলা দশটার সময় জেলের [illegible] আমাদের [illegible] থেকে দু'জন [illegible]- গণেশচন্দ্র [illegible] ডেকে পাঠালো। অন্যান্য সকল বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা সেখানে গেলাম— নোবল সাহেব গুলি করবার কারণ জানাবার জন্যই আমাদের ডেকে নিয়ে গিয়েছে। তিন হাত লম্বা লোহার একটি ডাণ্ডা দেখিয়ে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করলো, যে ঐ লোহার ডাণ্ডার সাহায্যে নাকি স্বভাব দুর্বৃত্ত কয়েদীরা তাকে খুন করবার জন্য তেড়ে এসেছিলো। তাই আত্মরক্ষার্থে ও জেলের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তারা গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছে।

নোবল সাহেব বলবার সময় টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে

কাঁদতে শুরু করলো। কাঁদবার সময় সামনে দাঁড়ানো বাঙালী জেলারকে 'কাপুরুষ' বলে গালি দিল। জেলার নাকি ভয়ে দোড়ে পালিয়েছিলো। নোবল সাহেব কাঁদছে! এ বড় নতুন কথা। এতগুলি মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করবার পুরস্কার লাভ পাষণ্ডের মনের উপরও প্রভাব করবে না? যাক আমরা এখানে আর বেশী সময় না থেকে চলে এলাম। রাতের অন্ধকারে গাড়ী বোঝাই করে মৃতের দেহগুলি সহরের এক প্রান্তে নিয়ে গিয়ে পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দিল, আর যারা বেঁচে গেলো তাদের হাত পা কেটে ছেড়ে দিল।

শোনা যায় ঢাকা সহরবাসী সঠিক খবর তিন দিন পর্যন্ত পেতে পারেনি, আমার বৃদ্ধা মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুঃসংবাদের আশঙ্কায় তিন দিন অনাহারে কাটিয়েছিলেন।

ইংরেজদের রেওয়াজ রাজা ও রাণীর সম্মান হিসাবে প্রতি বৎসরই পদাধিকার সম্মান বিতরণ করে থাকেন। নোবল সাহেবের কর্মকীর্তির পরিচয়ের স্বীকৃতি হিসাবে বাৎসরিক সম্মান বিতরণীতে নোবলের নাম প্রকাশ পেলো। নোবল সাহেব উপাধি পেলো—ও, বি, ই (O. B. E order of the Britsh Empire)। সম্রাটের খিদমতগার বাংলা গভর্ণমেন্টও টাকার পুরস্কার নিয়ে এগিয়ে এলো। যে-সব সিপাহী হত্যা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পালন করেছে তাদের হত্যার জন্য মাথা পিছু এক টাকা করে বকশীশ দেবার বন্দোবস্তও তারা করলো- কোনও কোনও সিপাহী নাকি এককভাবে কুড়িটি হত্যার জন্য কুড়ি টাকা পর্যন্ত বকশীশ পেয়েছিল।

যুদ্ধের গতি ফিরতে সুরু করেছে। বর্ম্মা পার হয়ে ইম্ফলের উপকণ্ঠ। হংকং নেতাজী সুভাষ সৈন্য সহ ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। অক্ষশক্তির অনিবার্য পরাজয়ের মুখে মিত্র শক্তির আক্রমণ দুর্বার গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। মুসোলিনী পলাতক অবস্থায় জনগণের হাতে বন্দী হয়ে নিষ্ঠুর হত্যার দায়ে নিষ্ঠুরতম ভাবে প্রাণ হারালো। গোয়েবেলস্ স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাসহ আত্মহত্যা করেছে। হিটলার দুর্গের ভিতর নিজেকে নিঃশেষ করেছে কিভাবে তা সঠিক কেউ জানেনা। জাপান নবাবিস্কৃত এটম বোমার আক্রমণে প্রচণ্ডতম ধ্বংস-লীলার সম্মুখীন। মিত্রপক্ষের দাবী—হয় বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পন নতুবা এটম বোমার ধ্বংশ লীলায় সমগ্র জাতির পৃথিবী হতে বিলুপ্তি। দুটি সহরকে সমগ্র অধিবাসীসহ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েই তবে মিত্র শক্তি জাপানকে দিয়ে বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পনের দাবী জানিয়েছে। জাপানও নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছে।

ভারতের মানচিত্রে ইংরেজ রাজ-পুরুষদের বিভিন্ন পরিকল্পনা এসে দেখা দিতে লাগলো। ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভা যুদ্ধের চাপে একক রক্ষণশীলের মন্ত্রীসভা থেকে শ্রমিক দলের সঙ্গে মিলে জাতীয় মন্ত্রীসভায় পরিণত হয়েছে। শ্রমিক দল ও ব্রিটিশ জনসাধারণের চাপে নূতন শাসনতন্ত্র রচনার প্রয়াস চলেছে। কংগ্রেস ও মোস্‌লেম নেতৃবর্গের সাথে এ বিষয় দীর্ঘ আলোচনাও সুরু হয়েছে। মোস্লেম-লীগ পরিচালিত সাম্প্রদায়িক নেতৃবর্গ কৌশলী জিন্নার নেতৃত্বে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ। কংগ্রেস

নেতৃত্বের সঙ্গে বৃটিশের আপোষ আলোচনার সুযোগে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ওপর ভারতকে দ্বি-খণ্ডিত করে হিন্দু-ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র স্থাপন করতে প্রয়াসী—[illegible] বৃটিশ রক্ষণশীল স্বার্থের অনুকূল [illegible] নরমপন্থী কংগ্রেসীরা খণ্ডিত ভারতে নিজেদের অংশে প্রভুত্ব [illegible] আপোষ করতে রাজী। মুসলমান সম্প্রদায়ের [illegible] করে জিন্না জোর হয়ে আছে—বাংলা গভর্ণমেণ্ট লীগের হাতে সুচতুর ও কৌশলী সুরাবর্দি, প্রধান মন্ত্রী।

আমরা মুক্তির জন্য আবার অনশন শুরু করবো, ঠিক করেছি। ১৯৪৬ সালের ৩১শে আগষ্টের মধ্যে মুক্তি না পেলে অনশন করবো একথা সরকারকে চিঠি দিয়ে জানিয়েও দিয়েছি। কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি খবরে জানা গেলো মুস্লিম লীগের প্রাদেশিক কমিটির অধিকাংশ সভ্যই [illegible] দেবার পক্ষে। [illegible] জনকে কেউ কেউ মুক্ত দিতে চাচ্ছেন। [illegible] সীতানাথ দে নামে এ [illegible] যা হোক আমাদের অধিকাংশই অনশনের জন্য তৈরী হয়ে আছে।

ইতিমধ্যে জিন্না-পারিষদের [illegible] লোক ভাগ সব হয়ে গেলো—অখণ্ড ভারতের দুঃস্বপ্নের হাত থেকে বাঁচবার জন্য হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা অপরিহার্য বলে প্রয়োজন। এই হত্যাকাণ্ডে সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী নির্বিচারে জবাই হবার পর অখণ্ড ভারতে বিশ্বাসী শিক্ষিত হিন্দু নরনারী বিকল্প হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠলো। কলকাতার রাস্তাঘাট শবের স্তূপে

পূর্ণ হলো—অগ্নি, হত্যাকাণ্ড, লুট ও ধর্ষণের নারকীয় ব্যাভিচারের নিষ্ঠুরতম অভিনয়। পূর্ব্ব বাংলায় হিন্দুর জবাই যেমন নির্ব্বিচারে চললো, তেমনি ভারতের অন্যান্য জায়গায় মুসলমানদের ও জবাই চললো। পূর্ব্ব বাংলার জবাব দিল—বিহার বিহার শরীফে। ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়ার যেন শেষ নেই। সম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত জাতির মনের ভিতর সুহৎ ফাটল ধরলো। এক অখণ্ড ভারতীয় জাতিকে দুই জাতিতে পরিণত করা সহজ হলো—সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতারা জয়ী হলো।

কলকাতায় দাঙ্গার প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। জাতির বুকে গভীর ক্ষত চিহ্নগুলি সাম্প্রদায়িক ঈর্ষানল জ্বালিয়ে রেখেছে। শ্মশান প্রেতগুলি শানিত ছুরিকা হাতে অসহায় নর নারীর ওপর অশুভ দৃষ্টিপাত নিয়ে নতুন করে দোরাত্ম শুরু করবার জন্য দাঁড়িয়ে। সময় ও মনে। এই ধ্বংস-স্তূপের ওপর সুরাবর্দ্দি মন্ত্রীসভা আমাদের মুক্তির আদেশ দিয়েছে। আবেগহীন পদক্ষেপে আমরা বন্দীশালার বাইরে এসে দাড়ালাম। আমাদের সঙ্গে এলোনা, একমাত্র দিনাজপুরের নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ। সরকারী মুক্তিনামাগুলি লিখবার সময় নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের নাম উল্লেখ না থাকায় মুক্তি পেতে তার প্রায় দু'মাস দেরী হয়ে গিয়েছিল। বাইরের ধ্বংসলীলার মাঝে দু'চার জন বন্ধু আমাদের নেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন, দূরে স্তব্ধ জনতার জটলা। পিছনে রেখে এলাম—চিরতরে তাঁদের যারা ফাঁসীর মঞ্চে জাতির মুক্তি সাধনায় অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছেন বা যারা বন্দীশালায় রোগে বা পীড়নে প্রাণ দিতে বাধ্য হয়েছেন।

আর রয়ে গেল, আন্তঃপ্রাদেশিক মামলার তরুণ বিপ্লবী অমিয় পাল যাকে মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্য রাঁচিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল (আজও তাকে [illegible] দেবার জন্য কেউ আবেদন করেনি)। যারা মুক্তি পেলো, মামলাসহ তাদের নাম—

১। মেছুয়াবাজার বোমার মামলা—শচীন করগুপ্ত।

২। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা—লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, অম্বিকা চক্রবর্তী, লালমোহন সেন, সহায়রাম দাস, আনন্দ গুপ্ত, সুখেন্দুবিকাশ দস্তিদার, সুবোধ চৌধুরী।

৩। ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলা—ডাঃ ভূপাল বসু।

৪। পেডী হত্যা মামলা—বিমল দাশগুপ্ত।

৫। বার্জ হত্যা মামলা—নন্দদুলাল সিং, কামাখ্যা ঘোষ, সুকুমার সেনগুপ্ত।

৬। [illegible] শুটিং মামলা—[illegible] রায়।

৭। হিলি ডাকাতি মামলা—প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল [illegible], সরোজ বসু, [illegible], [illegible] চক্রবর্তী, [illegible] ব্যানার্জি।

৮। চরপাড়া ডাকাতি মামলা—সত্যরঞ্জন ঘোষ, নরেন্দ্র [illegible] ঘোষ।

৯। গ্র্যাসবি শুটিং মামলা—বিনয় রায়।

১০। আহসান উল্লা হত্যা মামলা - হরিপদ ভট্টাচার্য।

১১। চাঁদপুর ইন্সপেক্টর হত্যা মামলা—কালী চক্রবর্তী।

১২। কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট শুটিং মামলা—[illegible] মুখার্জি, নলিনী দাস।

১৩। সিঙ্গা ডাকাতি মামলা—[illegible] দাশগুপ্ত, ননী দাশগুপ্ত, ভবতোষ পতিতুণ্ডু।

১৪। বড়বাজার ডাকাতি ও হত্যা মামলা—সুরেশ চন্দ্র দাস।

১৫। ইটাখোলা ডাকাতি ও হত্যা মামলা—বিনয় দেব।

১৬। বিশ্বাসঘাতক পার্টি সভ্য ও প্রাক্তন চর হীরালাল চক্রবর্ত্তী হত্যা মামলা—অমূল্য রায় ও পরেশ সেন।

১৭। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অতিরিক্ত মামলা—বিনোদ দত্ত, হিমাংশু ভৌমিক।

১৮। গবর্নর শুটিং মামলা—(লেবং, দার্জ্জিলিং) মধু ব্যানার্জ্জি, মনোরঞ্জন ব্যানার্জ্জি, সুকুমার ঘোষ।

১৯। বার্জ্জ হত্যা অতিরিক্ত মামলা—শান্তি সেন।

২০। ওয়াটসন শুটিং মামলা—সুনীল চ্যাটার্জ্জি, প্রমোদ বসু।

২১। দিনাজপুর ডাকাতি ও অস্ত্র প্রাপ্তি মামলা - নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ।

২২। উত্তর-বঙ্গ ষড়যন্ত্র মামলা ও ডাকাতি—হেমচন্দ্র বক্সী, জ্ঞান গুপ্ত।

২৩। ফরিদপুর গোয়েন্দা হত্যা মামলা—অমূল্য চৌধুরী, আশু ভরদ্বাজ।

২৪। দাশপুর দারোগা হত্যা মামলা—কানন গোস্বামী, মৃগেন ভট্টাচার্য্য, বিনোদ বেরা, ভূতনাথ মান্না।

২৫। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা—প্রভাত চক্রবর্ত্তী, জিতেন গুপ্ত, নরেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, ধীরেন ভট্টাচার্য্য, যতীন চক্রবর্ত্তী, পরেশ গুহ, সত্যেন মজুমদার, দ্বিজেন তলাপাত্র, সুরেন ধর চৌধুরী, জ্যোতিষ মজুমদার, নিরঞ্জন ঘোষাল, হরিপদ দে, অমূল্য সেন, সীতানাথ দে, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, বিমল ভট্টাচার্য্য, মণীন্দ্র চৌধুরী।

২৬। টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা শ্রীনিবর্ত্তন পুরকায়স্থ, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, প্রফুল্ল সেন, নিরঞ্জন ঘোষাল, শ্যামবিনোদ পাল, ধীরেন্দ্র মুখার্জ্জি, জীবন ধুপী,।

২৭। কলকাতা ডিনামাইট প্রাপ্তি মামলা—যোগেন্দ্র ব্যানার্জি।

২৮। কলকাতা অস্ত্র প্রাপ্তি মামলা—রাধাবল্লভ গোপ।

২৯। চট্টগ্রাম বাথুয়া ডাকাতি মামলা—[illegible] চক্রবর্ত্তি, [illegible] চক্রবর্ত্তি।

৩০। বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলা—প্রাণগোপাল মুখার্জি, [illegible] দত্ত।

৩১। কুড়িগ্রাম অস্ত্রপ্রাপ্তি মামলা—পূর্ণেন্দু গুহ।

৩২। কুমিল্লা অস্ত্রপ্রাপ্তি মামলা—ধীরেন চক্রবর্ত্তী।

৩৩। হুগলী অস্ত্রপ্রাপ্তি মামলা—[illegible] চৌধুরী।

৩৪। বাকুঁড়া অস্ত্রপ্রাপ্তি মামলা—বিমল সরকার, সন্তোষ কর্ম্মকার।

৩৫। চরমুগুরিয়া ডাকাতি ও হত্যা মামলা—সুরেন কর।

৩৬। আঙ্গারিয়া ডাকাতি—মদন রায় চৌধুরী।

৩৭। কৃষ্ণনগর অস্ত্রপ্রাপ্তি মামলা—অমৃতেন্দু মুখার্জি।

৩৮। মাদারীপুর ডাকাতি মামলা—অতুল চ্যাটার্জি।

৩৯। কুড়িগ্রাম ডাকাতি মামলা—কুমুদ মুখার্জি, রাধামোহন করঞ্জাই, নরেন দাস।

যারা কারাগারে রোগ বা পীড়ণের ফলে প্রাণ দিলো –

যক্ষ্মারোগে—

১। ফণীভূষণ নন্দী - চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা।

২। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা।

৩। মোহিত অধিকারী—অস্ত্রপ্রাপ্তি মামলা (বিহার)।

৪। রামকৃষ্ণ দে—সূর্য্য সেনকে আশ্রয় দেবার মামলা।

যারা অনশনে প্রাণ দিলো –

১। হরেন্দ্র মুন্সী—ঢাকা জেল।

২। মহাবীর সিং—আন্দামান জেল।

৩। মোহিত মৈত্র - আন্দামান জেল।

৪। মোহন দাস—আন্দামান জেল।

যার মৃত্যুর কারণ আজও জানা যায় নি -

১। দীনেশ ভট্টাচার্য।

যে পুলিশের অত্যাচারে প্রাণ হারালো—

১। আনন্দ দাস (ঢাকা জেল, ১৭ই জুন ১৯৩২)।

জাতির মুক্তি সাধনায় যারা ফাঁসীর মঞ্চে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিলো—

১। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা—সূর্য্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার।

২। কলকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট শুটিং মামলা—দীনেশ মজুমদার।

৩। ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস হত্যা মামলা (মেদিনীপুর)—প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য।

৪। ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ হত্যা মামলা (মেদিনীপুর)—ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নির্মল জীবন ঘোষ।

৫। কারাধ্যক্ষ সিম্পসন হত্যা মামলা (রাইটার্স বিল্ডিং, কলকাতা)
—বিনয় বসু, সুধীর গুপ্ত (বাদল), দীনেশ গুপ্ত

৬। গবর্নর শুটিং মামলা (লেবং, দার্জিলিং)—ভবানী ভট্টাচার্য।

৭। ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কামাখ্যা সেন হত্যা মামলা—কালীপদ মুখার্জি।

৮। ফরিদপুর চরমুগুরিয়া ডাকাতি ও হত্যা মামলা—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য।

৯। চাঁদপুর ইন্সপেক্টর হত্যা মামলা—রামকৃষ্ণ বিশ্বাস।

১০। ঢাকা গ্রাম রক্ষীদের গুলি ও হত্যা মামলা - মতিলাল মল্লিক।

১১। দারোগা হত্যা মামলা—রোহিনী বড়ুয়া।

১২। টাঁটাখোলা ডাকাতি ও হত্যা মামলা—অনন্ত ভট্টাচার্য।

শুদ্ধিপত্র

৪৮ পৃষ্ঠা—৭ লাইনে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের স্থলে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট।

৫১ পৃষ্ঠা —১৬ লাইনে শ্রীপরেশ গুহের স্থলে শ্রী[illegible] দাশগুপ্ত।

৫১ পৃষ্ঠা—১৪ লাইনে দলের নির্দেশ মত তিনির জায়গায় তিনি এবং পরেশ চন্দ্র গুহ।

৬২ পৃষ্ঠা—৯ লাইনে কোটাস স্থলে কোটাম।

৬৫ পৃষ্ঠা—৩ লাইনে হেলান দেওয়া স্থলে হেলান দেওয়া।

৭৩ পৃষ্ঠা—১২ লাইনে শাস্থি স্থলে শাস্তি।

৭৯ পৃষ্ঠা—১০ লাইনে কত্তন স্থলে কর্ত্তন।

৮১ পৃষ্ঠা—১২ লাইনে ভোলা বাবু ও শশী দে স্থলে ভোলা বাবু ও চরপাড়া মামলায় দণ্ডিত শশীভূষণ ভট্টাচার্য্য।

৮১ পৃষ্ঠা—১৪ লাইনে সাতের স্থলে পাঁচ।

৮৭ পৃষ্ঠা—৯ লাইনে সাত বছরের স্থলে পাঁচ বছরের।

১০৯ পৃষ্ঠা—১২ লাইনে শেখর বসু, (এখন স্বর্গত) স্থলে শেখর বসু এখন স্বর্গত),।

১৪৬ পৃষ্ঠা—৯ লাইনে সাত বৎসর স্থলে দশ বৎসর।

১৭১ পৃষ্ঠা—৭ লাইনে অজিত বসুর নাম তিন হতে পাঁচ বৎসরের দণ্ড তালিকার মধ্যে থাকবে। সে অনেক পরে হাইকোর্টের বিচারে মুক্তি পেয়েছিলো।

২০০ পৃষ্ঠা ১ম লাইনে টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা স্থলে টিটাগড় ষড়যন্ত্র।

২৪৩ পৃষ্ঠা—১৬ লাইনে “কে, সি” স্থলে “কে সি” (Cassey)।